

জুন, ২০১৪

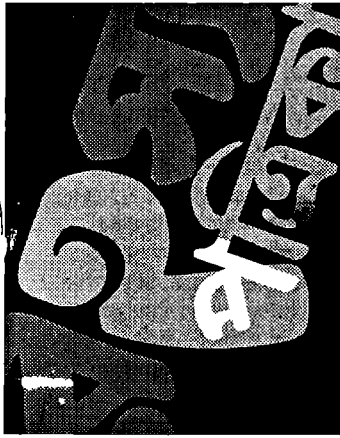
বহুস্য পত্রিকা

রহস্য বড় গল্প
গোস্ট রাইটার
ওয়েস্টার্ন গল্প
হান্টার

রহস্য উপন্যাসিকা
মৃত্যুঘণ্টা
অতিপ্রাকৃত উপন্যাসিকা
পিশাচবাড়ি
মনস্তাত্ত্বিক বড় গল্প
মৃত হরিণ



বিশেষ রচনা
সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী



৩০ ফেব্রুয়ারী ৮ সংখ্যা জুন, ২০১৪
বাহিনী
এই সংখ্যায়

সম্পাদক
কাজী আনোয়ার হোসেন

সহকারী সম্পাদক
কাজী শাহনূর হোসেন
কাজী মায়মুর হোসেন

শিল্প সম্পাদক
শ্রবণ এম

প্রকাশনা ও মুদ্রণ
কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

সেগুনবাগান প্রেস

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগ

রহস্যপত্রিকা

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

জি.পি.ও বক্স নং ৮৫০

টেলিফোন: ৮৩১৪১৮৪

মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩

mail: alochonabibhag@gmail.com

শো-রুম

সেবা প্রকাশনী

৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩০২৭

প্রজ্ঞাপতি প্রকাশন

৩৮/২৮ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

মূল্য। আটত্রিশ টাকা

বিশেষ রচনা

সেবা বই প্রিয় বই

অবসরের সঙ্গী ৭

ডিউক জন

পিতার পত্র, পুত্রকে ৩৬

আসমার গুসমান

মনস্তাত্ত্বিক বড় গল্প

মৃত হরিণ ১৯

ইমরান খান

ফিচার

ফিওদর মিখাইলভিচ দস্তয়ভস্কি ৩২

কামরুন নাহার দিল্লী

ম্যাম্পস অর্কাইটিস ৪২

ডা. মোঃ ফজলুল কবীর পাঙ্গে

নেশায় দাঁত ও মুখের ক্ষতি হয় ৪৬

ডা. মোঃ ফারুক হোসেন

প্রশ্ন-উত্তর ৫০

ফরিদা ইয়াসমিন

মোবাইল ফোন ও ক্ষতিকর

প্রভাব ৬৪

সাফায়েত আহমেদ চৌধুরী

টিপিং পয়েন্ট ১২৭

আনোয়ার সাদাত শিমুল

জানা-অজানা ১৩৪

শাহরীন সোনিয়া

বিচিত্র খবর ১৩৯

এস. এম. নাজমুল হক ইমন

অলৌকিক গল্প

নিয়তি ৪৪

সঞ্জয় দেবনাথ

আরও রয়েছে

খোলা চিঠি ৪ আপনার স্বাস্থ্য ১৬ বিজ্ঞান বার্তা ৩০ শব্দ-স্বাদ ৪৩

ভৌতিক অভিজ্ঞতা ৫৩ ভাগ্যচক্র ৮৪ হরেক রকম

ঘর-সংসার ১১৮ জীবনচিত্র ১৩২ বই-পরিচিতি ১

অতিপ্রাকৃত গল্প

সেই মেয়েটি ৪৭

সোহানা রহমান

মিনি গল্প

শিক্ষণীয় ৫২

সামদাদ হোসেন সোহাগ

ওয়েস্টার্ন গল্প

হাল্টার ৫৫

তৌফিক হাসান উর রাফিক

আত্মউন্ময়ন

বয়স ৬৫

মোঃ শাহবুদ্দিন নাহিদ

প্রজেক্ট: লেখালেখি ১৩৫

মিলন গান্ধী

রহস্য উপন্যাসিকা

মৃত্যুঘণ্টা ৬৬

ইসমায়েল আরমান

অতিপ্রাকৃত উপন্যাসিকা

পিশাচবাড়ি ৮৭

আফজাল হোসেন

রহস্য বড় গল্প

গোস্ট রাইটার ১০৬

অদীশ দাস অণু

রহস্য গল্প

পাতকিনী ১২৩

ভরক রায়

অণু গল্প

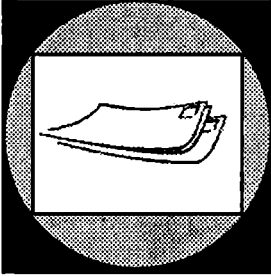
পরশ্রয়ী ১৪০

চন্দ্রিকা দাস

রসলাপ

নাম নিয়ে বিভ্রম ১৪১

সালাম সরকার



মতামতের জন্য
সম্পাদক দায়ী নন

আকরাম খান

চাষাঢ়া, নারায়ণগঞ্জ।

রহস্যপত্রিকা মে ২০১৪,
আক্ষরিক অর্থেই অসাধারণ
একটি সংখ্যা হয়েছে। বেশ
আগে আগে হাতে পেয়ে
যাওয়া এবং নিজের ব্যক্তিগত
ব্যস্ততা কম থাকায়, হাতে
পাওয়া মাত্রই পড়ে ফেলেছি
পুরোটুকু।

মুহম্মদ আলমগীর তৈমুর
সাহেবের “বজ্রযোগীর
প্রত্যাবর্তন” একটি চমৎকার
উপন্যাস। ভদ্রলোক বিভিন্ন
অতিপ্রাকৃত বিষয় নিয়ে এত
চমৎকার লেখেন, মুগ্ধ না হয়ে
পারা যায় না। ভদ্রলোকের
কাছ থেকে আরও বেশি বেশি
লেখা চাই। বহুদিন পর
রহস্যপত্রিকায় অনুবাদ নিয়ে
হাজির হলেন ইসমাইল
আরমান। শার্লক হোমস-এর
“স্বর্ণস্মৃতি” দুর্দান্ত একটি
উপন্যাসিকা। চমৎকার
সাবলীল এবং প্রাঞ্জল অনুবাদ।
সুখপাঠ্য। ইসমাইল আরমান
এমনিভেই আমার পছন্দের
অনুবাদকদের একজন। তার

কাছ থেকে আরও বেশি বেশি
অনুবাদ চাই।
গুচ্ছ হরর গল্প, “ভয়াল চার”
অসাধারণ লেগেছে পড়তে।
টোফির হাসান উর রাকিব-এর
লেখা সায়েন্স ফিকশন এবং
ওয়েস্টার্ন গল্প আমাকে
ইতিপূর্বে মুগ্ধ করেছিল। কিন্তু
সেগুলোকেও ছাড়িয়ে গেছে
ভদ্রলোকের হরর পাঠ করার
মুগ্ধতা। তার কাছ থেকে
আরও বেশি বেশি এধরনের
লেখা চাই।

আফজাল হোসেন-এর হরর
উপন্যাসিকা, “অভিশপ্ত রক্ত”
ভাল লেগেছে। তবে তার কাছ
থেকে রোমান্টিক লেখা পাচ্ছি
না বহুদিন। রোমান্টিক লেখা
চাই।

এ ছাড়াও ভাল লেগেছে
আসমার ওসমানের বিশেষ
রচনা, চার্লস ডিকেন্স এবং
টিপিং পয়েন্ট বিষয়ক ফিচার
এবং আরও অনেক কিছু...
সম্পাদকদের ধন্যবাদ এমন

চমৎকার একটি সংখ্যা
আমাদের উপহার দেয়ার
জন্য। ভবিষ্যতেও এমন
জমজমট সংখ্যার প্রত্যাশায়
রইলাম।

তবে ইতিবাচক কথার
পাশাপাশি কিছু নেতিবাচক
কথাও বলতে চাই প্রিয়
পত্রিকাটির সমীপে। পাঠক
হিসেবে দায়বদ্ধতা থেকেই
কথাগুলো বলতে হচ্ছে। যে
সংখ্যার খোলাচিঠি বিভাগে,
মিলন গাসুলীর করা
ন্যাকারজনক কাজটি দেখে
অবাক হইনি। অনলাইনে
প্রায়ই দেখি সেবার বিভিন্ন

লেখককে তিনি অকথ্য ভাষায়
গালমন্দ করেন। মিজানুর
রহমান কল্লোল, মাসুদ
আনোয়ারের মত বর্ষীয়ান
লেখকরাও তার গালি থেকে
মুক্তি পান না। কাজীদার জবাব
থেকে জানতে পারলাম,
সার্টিফিকেটটা বিদেশে কাজ
করার সুবিধার জন্য তিনি
নিজেই চেয়ে নিয়েছিলেন!
অথচ অনলাইনে এটাকে উনি
কী হিসেবে ব্যবহার করেছেন!!
চাকরির জন্য চেয়ে নেয়া
সার্টিফিকেটের যথেষ্ট ব্যবহার
তার ঘরা খুবই সম্ভব। তিনি
নিজেই যেখানে অন্যের
হোটেলে বাবুচিগিরি করেছেন
স্বল্পকালীন প্রবাস জীবনে,
সেখানে প্রায়ই তাকে দেখা
যায় অন্য লেখকদেরকে তার
হোটেলে থালা-বাটি মাজার
কথা বলেন! বস্তুত তার
কোথাও কোনও হোটেল নেই,
তিনি নিজেই বিদেশে অন্যের
হোটেলে কাজ করতেন।
বর্তমানে দেশেই, আমাদের
নারায়ণগঞ্জে, বেকার অবস্থায়
আছেন বহুদিন ধরে। কিছুদিন
আগে মেয়েদেরকে অশ্লীল প্রস্তাব
দেয়ার অভিযোগও চোখে
পড়েছিল তার বিরুদ্ধে ফেসবুক
ফ্রুপে। একটি মেয়েকে
পাঠানো মিলন গাসুলীর অশ্লীল
মেসেজ ছবি সহ পোস্টও
করেছিল। খুব দুঃখ হয় এসব
দেখলে। একজন লেখক শুধু
পাঠকের কাছে একজন
লেখকই নন, একজন স্বপ্নের
জগতের মানুষও বটে। তবে
মিলন গাসুলীর মত লেখকদের
ক্ষেত্রে শব্দটা “দুঃস্বপ্ন” ছাড়া

আর কিছু নয়। সেবা পরিবারে এমন নিচু মনের নোংরা লেখক এর আগে চোখে পড়েনি। আর কখনও যেন চোখে না পড়ে। তার কৃতকর্মের জন্য নারায়ণগঞ্জবাসীর পক্ষ থেকে সেবা পরিবারের কাছে ক্ষমা চাই। আমরা লজ্জিত। রহস্যপত্রিকা এবং সেবা পরিবারের সবার সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি। কাজীদাকে ঈশ্বর শতায়ু দান করুক।

ব্যর্থতার ব্যাখ্যা

রুনা সিদ্দিক

ব্যর্থ আমি, একটা দেশ চালাতে, ব্যর্থ আমি, একটা ঘর চালাতে, ব্যর্থ আমি, একটা মন চালাতে, একটা মন, যা আমার নিজস্ব। সেটাও নিজের করে রাখা যায় না।

সবার মন রাখতে গিয়ে চারিপাশে, হাঁপিয়ে ওঠা এই আমি নিজস্বতা হারাই। কী করে আমি ঘর চালাই, দেশ চালাই, ব্যর্থ আমি, প্রতি পদক্ষেপে। কড়ায় গণ্ডায় হিসেব করে সব, তবু কেন বুট-ঝামেলায় কাটে সময়?

কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা হাত বদল হয়, তবু একবিন্দু সুখ পাই না বুজে ঘরের কোণে।

কাছের মানুষগুলো আজ অনেক দূরে

হাত বাড়ালেই যায় না তাদের পাওয়া।

নিপাট বিছানায় শুয়ে ছাদের দিকে তাকিয়ে ভাবি

শূন্য আমি, নিঃশ্বাস আমি, ব্যর্থ আমি।

আ.খ.ম.খায়রুল আলম শিববাটী, বগুড়া।

রহস্যপত্রিকার নিয়মিত পাঠক হিসাবে একটি ব্যাপার লক্ষ করে বেশ হতাশ হয়েছি বলা যায়। তা হলে, দীর্ঘদিন রহস্যপত্রিকায় কোন ওয়েস্টার্ন গল্প নেই! এর কারণ কী? রহস্যপত্রিকায় ওয়েস্টার্ন গল্প আশা করি।

‘আজিমের বউ’ নামে একখানা গল্পের পর কাজীদা কোথায় যে হারিয়ে গেলেন, তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। প্রতি মাসে অন্তত একপৃষ্ঠার সম্পাদকীয়ও কি আমরা আপনার কাছ থেকে আশা করতে পারি না, কাজীদা? বিষয়টি ভেবে দেখার জন্য আপনার কাছে আন্তরিক অনুরোধ রইল, কাজীদা। সবাইকে ধন্যবাদ।

ইসমাইল হোসেন তোহা বরিশাল।

প্রিয় রহস্যপত্রিকাকে শুভেচ্ছা। শুভেচ্ছা শুদ্ধে কাজীদাকে এবং পত্রিকাটির সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে। রহস্যপত্রিকায় কিছু একটা লিখতে পারাটা আনন্দের; এর লেখাগুলো পড়া আরও বেশি আনন্দের। এর প্রতিটি সংখ্যাই পাঠকসংখ্যা, একারণেই হয়তো। আমার কাছে পত্রিকার কাগজের আগটাও ভাল লাগে। তবুও মন ভরে না। তাই আবারও চাইতে বসেছি। জমজমাট শিকার কাহিনির মধ্যে হারাতে চাই। কাজীদার লেখা চাই, সেটা ছোট গল্প কিংবা অভিজ্ঞতার শৈল্পিক

বর্ণনা যাই হোক না কেন। ছড়া কিংবা কবিতা খোলা চিঠি বিভাগে না ছাপিয়ে আলাদা করে ছাপালেই বোধহয় ভাল হত। আর সুন্দর সুন্দর লেখাগুলোর জন্য লেখকদের প্রতি রইল শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা। তারা আরও ভাল লিখুন, আর রহস্যপত্রিকা যুগের পথ ধরে এগিয়ে যাক আলো ছড়াবার বার্তা নিয়ে, সেই প্রত্যাশায় এখানেই ধামলাম। শুভকামনা সবার প্রতি।

আহমেদ সংগ্রাম

রসুলপুর, সাতক্ষীরা।

সেবা প্রকাশনীর সাথে আমার পরিচয়

দীর্ঘদিনের হলেও রহস্যপত্রিকার সাথে পরিচয় খুব বেশি দিনের নয়। প্রায় দেড় বছরের। এত অল্প সময়ের মধ্যে রহস্যপত্রিকা আমার মনের গহীনে স্থান করে নিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আমি রহস্যপত্রিকার একজন অন্ধ ভক্ত। আমার এক বন্ধুর মাধ্যমে রহস্যপত্রিকার সাথে আমার পরিচয় ঘটে। এরপর রহস্যপত্রিকাকে আমি আমার আরেক বন্ধু হিসেবে বেছে নিয়ে ক্রমাগত সামনের দিকে এগিয়ে চলেছি। এখন প্রত্যেক মাসে রহস্যপত্রিকা আমার সামনে উপস্থিত হয় নতুন আকর্ষণ নিয়ে। তাই পত্রিকাটি পড়তে ভীষণ ভাল লাগে। তা ছাড়া মিলন গান্ধুলী, আফজাল হোসেন-দের মত নামি দামি লেখকদের লেখাও আমাকে চমৎকৃত করে। তাই আমার মত যারা বইয়ের পোকা তাদের জন্য রহস্যপত্রিকা যেন

আশীর্বাদ। সবশেষে সেবা ও রহস্যপত্রিকার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ও শ্রদ্ধেয় কাজী আনোয়ার হোসেনকে ধন্যবাদ জানিয়ে এখানেই শেষ করছি।

আকাশ আহমেদ (জারসা)

কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

ইংরেজীতে একটি কথা আছে, Necessity Knows no laws অর্থাৎ প্রয়োজন কোন আইন মানে না। এটা মূলত শব্দগত অর্থ। হঠাৎ একদিন বাজারে কেনাকাটার উদ্দেশ্যে গিয়েছিলাম। একজন ক্রেতা রহস্যপত্রিকা আছে কিনা জিজ্ঞেস করছিল। ‘আপনার লাইব্রেরীতে কি রহস্যপত্রিকা আছে?’ ‘হ্যাঁ, আছে,’ লাইব্রেরিয়ান বলল। তখন থেকেই সংকল্প করলাম এ পত্রিকা আমাকে পড়তে হবে। পরবর্তীতে সমস্ত অংশ পড়ে ফেললাম। বাহ! কী চমৎকার। এটা আসলে ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ কত কিছুই না করে আর আমি এ পত্রিকা পড়ব না তা কী হয়! পাঠক, না পড়লেন তো অনেক কিছু মিস করলেন।

আবু মোহাম্মাদ ইশতিয়াক

মোঁচাক, ঢাকা।

শ্রদ্ধেয় কাজীদা, আশা করি ভালই আছেন, আমি ‘রহস্যপত্রিকা’র একজন নিয়মিত পাঠক। বাবার হাত ধরেই আমার এই পত্রিকাটি পড়তে শেখা। বাবার সংগ্রহের যে সংখ্যাটি সবচেয়ে পুরানো সেটি ১৯৮৬ সালের এপ্রিল

মাসের। এর আগে তিনি এই পত্রিকা কিনেছিলেন কিনা তা আমি জানি না। আর আজ এখানে দাঁড়িয়ে তা জানা সম্ভবও না। যাই হোক, সে কথা আর না বলি।

২০১২ সালে ‘মাহিয়া সারিন’ রহস্যপত্রিকাকে একটি চিঠি লেখে। সে চিঠির মাধ্যমে জানানয় তার খুবই কাছে একজন বন্ধু ‘মিতু’ মারা গিয়েছে। সেই সুবাদে আমার ও মাহিয়ার মধ্যে খুবই ভাল বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয়। কিন্তু আমার মোবাইল ফোনটি হারিয়ে যাওয়ায় বেশ কিছু মাস মাহিয়ার সাথে কোন যোগাযোগ নেই। আমার নতুন নম্বর ০১৭৫৯৭৪০৬৭১। Please, মাহি, একবার ফোন দিয়ে। কাজীদা, আজ আর নয়, চিঠিটি আপনাদের রহস্যপত্রিকায় ছাপালে খুবই উপকৃত হব।

শাহা রায়

ধানমণ্ডি, ঢাকা।

রহস্যপত্রিকা যে সংখ্যাটি অতি চমৎকার

ইচ্ছে হয় সব কাজ ফেলে পড়ি বারংবার!

যেমন সুন্দর কাভার ফটো তেমনই ইলাস্ট্রেশন সব বিভাগই লেগেছে ভাল চরম পরিবেশন।

তৈমুর স্যরের রহস্য উপন্যাস লাগল ভাল বেশ

ইসমাইল আরমান অনুবাদে দিলেন

আনন্দ অশেষ।

তৌফিক হাসানের গুচ্ছ গল্পের হয়ে গেলাম ভক্ত

ভাল লাগল আফজাল হোসেনের

অভিশপ্ত রক্ত।

তারক রায়ের রহস্য গল্প খুনটা চমৎকার লাগল ভাল কামরুন নাহারের চার্লস ডিকেন্সের ফিচার। কটার কথা বলব রে, ভাই, সব লেখাই তো দারুণ সম্পাদক সাহেব, এমন সংখ্যা বারে বারেই আনুন!

জয় আহমেদ

মালিবাগ, ঢাকা।

কে সাজু সেকান্দার বন্ধু? আমি লেখক মিলন গান্ধুলীকে ব্যক্তিগতভাবে চিনিও না, কখনও দেখাও হয়নি কিংবা কথাও হয়নি। এবং নেই ওনার সাথে আমার কোনও ব্যক্তিগত সম্পর্ক। শুধু রহস্যপত্রিকাতে তাঁর নিয়মিত লেখা থাকত যা আমার ভাল লাগত। রহস্যপত্রিকার মে ২০১৪-এর চিঠিপত্র বিভাগে প্রকাশিত জিন শটে লেখা দেখা যাচ্ছে লেখক মিলন গান্ধুলী নিজেকে রহস্যপত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক বলে দাবি করেছেন। আর সার্টিফিকেটটা যে কোনও দায়িত্ব হস্তান্তর সূত্রান্ত নয়, তা যে কেউই বুঝবে। যতটুকু জানতে পেরেছি মিলন গান্ধুলী দীর্ঘদিন ধরে রহস্যপত্রিকার একজন নিয়মিত লেখক, যা সার্টিফিকেটে কাজীদাও উল্লেখ করেছেন। আর সার্টিফিকেট দেখিয়ে নিজেকে সম্পাদক দাবি করা, তা-ও আবার ফেইসবুকে প্রকাশের মাধ্যমে? এহেন বন্ধ উন্মাদের মত গোঁজাখুরি কাজ মিলন গান্ধুলীর মত একজন লেখকের পক্ষে করা কতটুকু সমীচীন হয়েছে তা আপনাদেরই বলবেন। ■

সেবা বই প্রিয় বই, অবসরের সঙ্গী ডিউক জন

“ধ্বংস-পাহাড়”-এর মাধ্যমে সেই যে বাংলাদেশের প্রকাশনা-জগতে এই দুর্ধর্ষ, চিরনবীন যুবকটির পদার্পণ, স্মরণকালের সমস্ত রেকর্ড ভঙ্গ করে আজও অব্যাহত সেই পদচারণা।
ইতোমধ্যে ৪৩০ ছুঁয়েছে বইয়ের সিরিয়াল নাম্বার।

আজি হতে কত বর্ষ আগে?

বইয়ের তাকের দিকে তাকাই। মুহূর্তের ব্যবধানে হাতে উঠে আসে “কুয়াশা”।
ভলিউ-১। পাতা ওল্টাই। প্রথম পর্বের প্রকাশকাল খুঁজে নেয় চোখ। জুন, ১৯৬৪।
কুয়াশা ১ দিয়ে শুরু। ৭৮টি কাহিনি বেরিয়েছে এই সিরিজে। আমাদের নানা-দাদারা যে সমস্ত গল্পে বৃন্দ হয়ে থাকতেন, সেগুলো পড়ে আমরাও মজা পেয়েছি। উপভোগ করেছি রহস্য, রোমাঞ্চ ও বিপদের স্বাদ।

“হলুদ মৃত্যু”র পর হিমঘরে চলে যায় কুয়াশা, শহীদ ও কামাল।

কেবল প্রথম সিরিজের কুশীলব বলে নয়; অন্যায়-অবিচারকে দমন করে সত্য ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠা করা যাদের জীবনের ব্রত, গ্রন্থিকগণের মানসপটে তারা তো নিজ মহিমায় ভাস্বর। দীর্ঘ বিরতির পর মহানায়কের প্রত্যাবর্তনে পাঠককুলের চেতনায় স্বাভাবিকভাবেই দাবানল ছড়িয়ে পড়ে। “সেই কুয়াশা” কিনবার জন্য ছুড়োহুড়ি লেগে যায়।

গ্রন্থপ্রেমীদের কুয়াশা কতখানি আন্দোলিত করে, তার জলজ্যাত দৃষ্টান্ত মো. আরিফুল ইসলাম কুয়াশা। ডাই-হার্ড এই ফ্যান একদা একখানা পত্র দিয়েছিলেন সিরিজটির স্রষ্টা কাজী আনোয়ার হোসেনকে।

‘...আমি কুয়াশার ভক্ত হয়ে গেছি। আমার প্রশ্ন, আমিও কি কোনওদিন তার মত হতে পারব না? মানুষের সেবা করতে পারব না? তার মত হতে এখন থেকে আমায় কীভাবে সময়কে কাজে লাগিয়ে সাফল্যের দিকে যেতে হবে? পড়ালেখায় তো অনেকগুলো সেকশন আছে। আমি এখন সায়েন্স নিয়ে মাধ্যমিকে আছি। পরবর্তীতে কী-কী বিভাগ নেব, এবং আরও মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে কী করে হুবহু তার মত হব?’

কাজী দার সল্লেহ প্রত্যুত্তর: ‘তুমি কুয়াশা সিরিজ পড়ে আনন্দ পাও, কুয়াশার মত মহৎ চরিত্রের বিজ্ঞানী হওয়ার অনুপ্রেরণা লাভ করো— এসব জেনে খুব ভাল লাগল। বিজ্ঞানের যে শাখা তোমার মনকে টানে, আমার মনে হয় সেদিকেই লেখাপড়া করা ভাল। তুমি মস্ত বড় একজন বিজ্ঞানী হয়ে দেশ ও দশের মঙ্গল সাধন করবে— এই দোয়া করি। তবে, একটা কথা: হুবহু কুয়াশা হতে যেয়ো না। গল্প গল্পই। পড়তে হয়তো ভাল লাগে, কিন্তু নায়কের সঙ্গে একাত্ম হতে গেলেই বিপদ। তার মত বড় একজন বিজ্ঞানী হওয়ার সংকল্প নিয়ে যদি এগিয়ে যাই, মানুষ আমাদের প্রশংসা করবে, আমাদের দ্বারা উপকৃত হবে। কিন্তু কিছুতেই আমরা তার সবকিছু অনুকরণ করব না। একজন প্রতিভাবান বিজ্ঞানী তার বিশেষ পারিপার্শ্বিক অবস্থায় পড়ে একদিকে মানবদরদী অন্যদিকে লুটেরা ও দস্যু হয়ে যেতে তো পারেই, কিন্তু আমরাও যদি তার মত বে-আইনী কর্মকাণ্ডে

লিগু হই, পুলিশে ধরে জেলখানায় ভরে দেবে।’

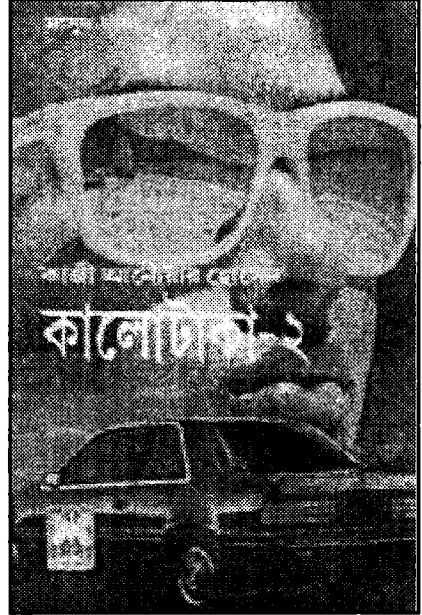
১৯৬৬ সালের মে মাসে আবির্ভাব আরেক লেজেণ্ডে। মাসুদ রানা। বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী স্পাই। গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে। তারও আগমন কাজী দা’র হাত ধরে।

বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি। কোমলে-কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর সুন্দর এক অন্তর। একা। টানে সবাইকে, কিন্তু বাধনে জড়ায় না। কোথাও অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার দেখলে রুখে দাঁড়ায়। পদে পদে তার বিপদ-শিহরণ-ভয় আর মৃত্যুর হাতছানি।

“ধ্বংস-পাহাড়”-এর মাধ্যমে সেই যে বাংলাদেশের প্রকাশনা-জগতে এই দুর্ধর্ষ, চিরনবীন যুবকটির পদার্পণ, স্মরণকালের সমস্ত রেকর্ড ভঙ্গ করে আজও অব্যাহত সেই পদচারণা। ইতোমধ্যে ৪৩০ ছুঁয়েছে বইয়ের সিরিয়াল নাম্বার।

মাসুদ রানার জাদু কোথায়?

বরিশালের রাসিন্দা মো. সাইফুল ইসলাম



(পাবেল) লিখেছেন: ‘ “আই লাভ ইউ, ম্যান” পড়তে গিয়ে বারবার চোখ ভিজে উঠেছে। যখন দেখলাম, রডরিক মৃত্যুর শেষ সীমাতে পৌঁছে বলছে, “বলব বলব করে যে কথাটা কক্ষনও কোনওদিন বলা হয়নি, সেই কথাটা আজ তোমাকে বলতে যাচ্ছি আমি। ইউ আর এ গুড বয়, মাসুদ। আই লাভ ইউ, ম্যান। আপন ভাইয়ের চেয়েও বেশি ভালবাসি আমি তোমাকে।” - তখন আর থাকতে পারিনি। কেঁদে ফেলেছি নিজের অজান্তেই। নিছক প্রশংসা নয়, হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কোনও মানুষ এমন চমৎকার বাজায় ভাষায় মানুষের আবেগকে প্রস্ফুটিত করতে পারে, তা আমার ধারণা ছিল না।’

ওধু কি আই লাভ ইউ, ম্যান? অগ্নিপুরুষ। বিদায়, রানা। সেই উ সেন। হ্যালা, সোহানা। বেনামী বন্দর। চারিদিকে শত্রু। চাই সাম্রাজ্য। জাপানি ফ্যানাটিক। সাউদিয়া ১০৩। সবাই চলে গেছে। কালো ফাইল। দেশপ্রেম। স্বর্ণখনি। সহযোগী। হ্যাকার। ...সব লিখতে

গেলে ফিচারের কলেবরই বাড়বে শুধু।

কত-শত মুখ! এল। গেল। অগণন নক্ষত্রের হাটে শুকতারার মত জুলজুল করে ক'টি নাম। সুলতা। মিত্রা। অনীতা। লুবনা। স্বাভী। রেবেকা। রাফেলা। এষা। পড়ে যেন মনে হয় চিনি উহাদের।

পরবাসে পা রাখবার পর মাহবুবুল হক সোহেলের অনুভূতি কেমন ছিল? শুনুন।

‘নিউ ইয়র্কে এসে মনে হলো যে, এই শহরটিকে আমি যুগ যুগ ধরে চিনি। আপনার লেখার নিখুঁত বর্ণনায় আগেই এই শহরটি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকায় আমার এখানে রাস্তাঘাট চিনতে কোনও অসুবিধাই হয়নি।’

এজন্যই মাসুদ রানা এত অসাধারণ।

সেবা প্রকাশনীর সঙ্গে ভোক্তার সম্পর্ক স্রেফ লেখক-ক্ষেত্র-প্রকাশকের বাণিজ্যিক মিথস্ক্রিয়া নয়। উইটের নুন আর হিউমারের গুণে রিলেশনটা তার চাইতে গভীর। যেমন?

‘রানা আমার স্বপ্নপুরুষ। আমি সব সময় রানাকে অনুকরণ করি, তাই রানা এজেন্সি খুলেছি। কথা হলো, আপনি মনে হয় জানেন, কাজী দা’, চারদিকে ভয়াবহ এইডস রোগের আতঙ্ক চলছে। তাই বলছি, রানাকে মেয়েদের কাছ থেকে দূরে রাখুন। রানাকে আমি হারাতে চাই না,’ লক্ষ্মীপুর থেকে একজন লিখেছিলেন। ভদ্রলোকের নামও মাসুদ রানা।

কাজী দা’র সরস জবাব: ‘খুবই দুশ্চিন্তায় ছিলাম, আপনি বাঁচালেন আমাকে। রানার ভাল-মন্দ কিছু একটা ঘটে গেলে আরেকটা তৈরি রানা পেয়ে যাচ্ছি আপনাকে। আপনি এখন থেকেই মেয়েদের ব্যাপারে সাবধান থাকুন।’

এমনকী কোনও বিরূপ মন্তব্যও পাল্টা তিক্ততা বর্ষণ নেই। বদলে শাণিত, সুন্দর, নমনীয় উত্তর— যা নিঃসন্দেহে অনুকরণীয়।

১৯৮৩ সালে প্রকাশিত হয় “আলোয়ার পিছে”। বাংলা ভাষায় প্রথম ওয়েস্টার্ন নভেল। কাজী মাহবুব হোসেনের প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণ নতুন ধাঁচের সাহিত্যধারার উন্মোচন ঘটল। তাঁর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সিরিজটাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন রওশন জামিল, শওকত হোসেনের মত আরও দুই দিক্‌পাল। তাঁদের নিপুণ গদ্যে এরফান,

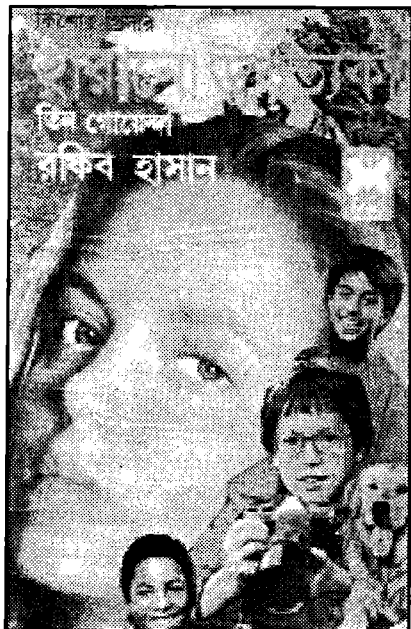


ওসমান, সাবাডিয়ারা কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছে। পরবর্তী কালে কাজী শাহনূর হোসেন, কাজী মায়মুর হোসেন, গোলাম মাওলা নঈমসহ বিভিন্ন জনের মুনশিয়ানায় খ্যাতির চূড়া স্পর্শ করে ওয়েস্টার্ন। এখনও পর্যন্ত সে অবস্থানের একচুল নড়চড় হয়নি।

স্কুল-লাইফের মধ্যাহ্ন পার করছি তখন। বন্ধু রিফাত একটা বই দিল। “জিনার সেই দ্বীপ”। বলল, ‘বইটা পড়। ভাল না লাগলে কান কেটে ফেলব।’

শুনে আমার আক্কেল গুড়ুম। বলে কী শালা! সামান্য বইয়ের জন্য কান খোঁয়াব নাকি? ফেরত দিতে চাইলাম। আমার ভাবনা কোন খাতে প্রবাহিত হচ্ছে, আঁচ করতে পেরে হই-হই করে উঠল সে, ‘আরে, ব্যাটা, তোর কান না! আমার কান!’

আশ্চর্য হয়ে পুস্তকখানি নিয়ে এলুম। দুপুরের ভাতঘুমকে একপাশে রেখে পড়তে আরম্ভ করলুম। হাসতে হাসতে চোখে এল পানি, পেটে হলো ব্যথা। এমন স্বাদু বই আমি এর আগে পড়িনি। এমন মধুর অপরূহ আমার



জিন্দেগিতে আর আসেনি।

সেবার সাথে সে-ই প্রথম মোলাকাত। মুগ্ধতা ক্রমে ভালবাসায় রূপ নিল।

বলতে ভুলে গেছি... সিরিজটার নাম “তিন গোয়েন্দা”।

’৮৫-র আগস্টে আমেরিকার রকি বিচ নিবাসী তিন কিশোরের সাথে রহস্যপ্রেমীদের সাক্ষাৎ ঘটিয়ে দিলেন রকিব হাসান। বাঙালি ছেলে কিশোর পাশা, কালো মানিক মুসা আমান আর আইরিশ রক্তবাহী রবিন মিলফোর্ড এল, দেখল, জয় করল। কাহিনি-সংখ্যা সাড়ে চারশ’ পরিয়ে গেছে। সময়ের দাবিতে সিরিজে যুক্ত হয়েছেন সুলেখক শামসুদ্দীন নওয়াব। অভিনু ক্যারেকটার নিয়ে “তিন বন্ধু” নামে আলাদা সিরিজ করা হয়েছিল। শুধু কিশোরকে নিয়ে সিরিজের কথাও ভাবা হয়েছিল “কিশোর পাশা” নামে।

অগুনতি কিশোর পাঠকের মত আমরা মাঝেও অনিবার্য প্রভাব ফেলে তিন গোয়েন্দা। গোয়েন্দাদল বানানো, ভিজিটিং কার্ড ছাপানো,

মিছেমিছি কেস তৈরি করে অনুসন্ধান... কী সব দিনই না গেছে একসময়! রিফাত “কিশোর” হয়েছিল। মোটা-কালো বলে অর্ধ্যকে ডাকা হত “মুসা”। শ্বেচ্ছায় গবেষকের দায়িত্ব নিই আমি। বইয়ের পোকা ছিলাম কি না! মাঝে মাঝে মনে হত: আহা, আমার যদি মেরি চাচীর মত একজন চাচী থাকত! রাশেদ পাশার মত চাচা!

এ ছাড়াও হাজারও গ্রন্থ প্রকাশ করেছে সেবা। নানান ধরনের। কিশোর ক্লাসিক। অনুবাদ। কিশোর থ্রিলার। গোয়েন্দা রাজু। রোমহর্ষক। অ্যাডভেঞ্চার। অয়ন-জিমি। নীল-ছোটমামা। কিশোর সাহিত্য। সায়েন্স ফিকশন। শিকার কাহিনি। পিশাচ কাহিনি। হরর। আজব। ভয়াল। গল্প-উপন্যাস। রোমাণ্টিক। টিনেজ। মেজর রাহাত। সঙ্কলন। নন-ফিকশন। আত্মোন্ময়ন। ইসলামী। রূপকথা। ছড়া-কবিতা। রম্য। রাজনৈতিক। স্মৃতিকথা। জ্ঞান। খেলা। ইত্যাদি। ইত্যাদি।

জানেন কি, “শিশু ক্লাসিক” নামে একটা সিরিজ বের হত সেবা থেকে?

১৯৯২-এর জানুয়ারিতে আত্মপ্রকাশ করে সেবার অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান প্রজাপতি প্রকাশন। এখান থেকেও বের হয়েছে রকমারি বই। ভিন্ন ব্যানারে নয়, বর্তমানে সেবাই পেপারব্যাকের পাশাপাশি হার্ড বাউণ্ডে বই প্রকাশ করছে।

লম্বা সফরে দুয়েকটা হার্টবিট মিস যে নেই, তা নয়। কিশোরপত্রিকার কথাই ধরা যাক।

১৯৯৯-এর জুলাই মাসে যবনিকা পড়বার আগপর্যন্ত প্রায় এক দশক অতিক্রম করে পত্রিকাটি। গুটিয়ে যাবার পর পাঠক স্বভাবতই জানতে চেয়েছে, কেন।

‘লোকসানের ঘানি টানতে টানতে অবস্থা এমন দাঁড়াল, শেষে পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া ছাড়া আমাদের আর কোনও উপায় থাকল না,’ বলেছেন টিপু কিবরিয়া, কিশোরপত্রিকার সহকারী সম্পাদক। ‘তবু পত্রিকাটা টিকিয়ে রাখার জন্য বিভিন্ন ভাবে আমরা চেষ্টা করেছি, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে আমাদের সব চেষ্টা।’

আমাদের দেশে ছোটদের পত্রিকা চালানো যে কত কঠিন, তা কেবল সংশ্লিষ্টরাই



জানেন। ভাল-ভাল অনেক পত্রিকার মত কিশোরপত্রিকেও অনাকাঙ্ক্ষিত ভাগ্য বরণ করে নিতে হয়েছে।

কিশোরপত্রিকা নেই। রহস্যপত্রিকা রয়েছে। বর্ণাঢ্য অতীত তার পেছনে। ১৯৭০ সালের নভেম্বরে পৃথিবীর আলো দেখে রহস্যপত্রিকা। সেই হিসেবে আজ এর বয়স হবার কথা ৪৩ বছরের বেশি। কয়েক সংখ্যা প্রকাশের পর মুক্তিযুদ্ধের কারণে ছেদ পড়ে যাওয়ায় দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রকাশনাকাল, অর্থাৎ ১৯৮৪ সালের নভেম্বরকেই এ পত্রিকার জন্মদিন ধরা হচ্ছে।

সেবার জন্য কে লেখেননি? শাহাদত চৌধুরী, শাহরিয়ার কবির, আবু কায়সার, মুনতাসীর মামুন, হাসান হাফিজ, নির্মলেন্দু গুণ, রফিক আজাদ, আমীরুল ইসলাম, আবদুল গাফফার চৌধুরী, ইমদাদুল হক মিলন, আহসান হাবীব, কাইজার চৌধুরী, আনোয়ারা সৈয়দ হক... বলে শেষ করা যাবে না। হুমায়ূন আহমেদের “অমানুষ” উপন্যাসটি রহস্যপত্রিকাতেই প্রথম প্রকাশিত হয়।

রহস্যপত্রিকার কথা বাদ দিলাম। হুমায়ূন

আহমেদ অনুদিত “দি একসরসিস্ট”, মুহম্মদ জাফর ইকবালের “প্রেত” সেবা থেকেই প্রকাশিত হয়েছিল প্রথমে। তারকালোক-কিশোর তারকালোক সম্পাদক আরেফিন বাদল- লিখেছেন “ঐতিহাসিক প্রেমপত্র”। স্বনামধন্য ঔপন্যাসিক রাহাত খান “দিলুর গল্প” ছাড়াও ছদ্মনামে লিখেছেন। প্রচুর।

অসংখ্য গ্রন্থকারের অভিষেক হয়েছে সেবার নার্সিং-এ। অজস্র কথাসিল্পী নির্মাণ করেছে সেবা প্রকাশনী। আসাদুজ্জামান। জাহিদ হাসান। সেলিম হোসেন টিপু। রোকসানা নাজনীন। সুরাইয়া আখতার জাহান। শেখ আবদুল হাকিম। হেলেন নওশীন। প্রিম রিজভী তোহিদ। খন্দকার আলী আশরাফ। আলীমুজ্জামান। আলীম আজিজ। হাসান খুরশীদ রুমী। শরিফুল ইসলাম ভুঁইয়া। অনীশ দাস অপু। ইফতেখার আমিন। হিফজুর রহমান। বজলুর রহমান। খসরু চৌধুরী। আদনান শরীফ। এ.টি.এম. শামসুদ্দীন ওরফে তাহের শামসুদ্দীন। এহসান চৌধুরী। উর্মি রহমান। আবদুল হাই মিনার। ইউসুফ ফারুক। সুধাময় কর। আতোয়ার রহমান। বিত্ত চৌধুরী। হাসান উৎপল। মামুন শফিক। নিয়াজ মোরশেদ। মোস্তাফিজুর রহমান। আলী মাহমেদ। খন্দকার মজহারুল করিম। মিলা মাহফুজা। ফাকিহা হক। কাজী সারওয়ার হোসেন। বাবুল আলম। মোনা চৌধুরী। শাহরিয়ার শামস। শায়লা মমতাজ। ইসমাইল আরমান। মাসুদ মাহমুদ। রেজোয়ান সিদ্দিকী। বুলবুল সরওয়ার। আসজাদুল কিবরিয়া। আহমেদ নূর আলম। টিপু কিবরিয়া। মো. মুমিনুর রহমান। খন্দকার রেয়াউদ্দিন আহমদ। ম. মাওলা চৌধুরী। জি.এইচ. হাবীব। দ্বিজেন বর্মণ। সাদেকুল আজিজ। নাসির আহমেদ বেনু। সেলিম আনোয়ার। আবুল হাসেম। মাহমুদুল হোসেন। শায়ের খান। মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ। মাসুদ আনোয়ার। আবু মাহদী। আ. ন. ম. হানিফ। সরওয়ার পাঠান। শরীফ খান। সুস্ময় আচার্য। নাসিম রেজা। ইমতিয়াজ মাহমুদ। মিজানুর

রহমান কল্লোল। নাজনীন রহমান। প্রিন্স আশরাফ। রুমানা বৈশাখী। তাহমিনা সানি। রেশমা রেজিনা উর্মি। আসমার ওসমান। তারক রায়। সায়েম সোলায়মান। ইশতিয়াক হাসান। মুহম্মদ আলমগীর তৈমূর। সাইফুল আরেফিন অপু। মিলন গাঙ্গুলী। আফজাল হোসেন। তৌফির হাসান উর রাকিব। প্রমুখ।

সেবার স্বর্ণালী কিছু প্রডাকশন এখনও রোমহুনে বিভোর করে তোলে বইপ্রেমীদের। রক্ত পুতুল। মরণনেশা। হ্যাণ্ডস আপ। হত্যারহস্য। ব্ল্যাকমেইল। কলঙ্কিনী। দুঃগ্রহ। আমি কি হত্যাকারী?। বিপদ সংকেত। মায়াডাক। মায়াকন্যা। মৃতনগরী। মৃত্যুর ফাঁদ। রক্তের ডাক। সুমেরুর হাতছানি। ডাইনীর কবলে। প্রভাত রহস্য। নীল উল্কা। জঙ্গল। শিকার...

সেবার অধিকাংশ বই বিদেশি কাহিনির ছায়ায় রচিত— জনৈক পাঠিকার অনুযোগে কাজী দা' বলেছিলেন: “ছায়া অবলম্বন” দেখে কিন্তু তোমার মোটেও কষ্ট পাওয়া উচিত নয়। এই ছোট দেশের অল্প কয়েকজন পাঠক-পাঠিকার জন্যে নিয়মিত লিখতে হলে বিদেশি কাহিনি অবলম্বন না করে কোনও উপায় নেই। আমাদের প্রত্যেক লেখক নিজে বানিয়ে চমৎকার কাহিনি রচনার যোগ্যতা রাখেন, তবে তাতে সময় লাগবে মেলা। একটা বই লেখা হবে এক বছরে। পারবে তুমি ধৈর্য ধরে থাকতে? যদি পারোও, বছরে মাত্র একটা বই লিখে যে টাকা পাওয়া যাবে, তাতে তো লেখকের খাওয়া-পরা চলবে না। পেট চালাবার জন্যে যদি লেখককে অধ্যাপনা বা সাংবাদিকতা বা অন্য কোনও চাকরি করতে হয়— লিখবেন কখন?’

সেবার বইয়ের প্রচ্ছদ নিয়ে দু'-চার কথা না বললেই নয়। ফটোশপ-ইলাস্ট্রেটর ভূমিষ্ঠ হবার ঢের আগে কী অপরিণীম মমতায় এক-একটা কভার প্রস্তুত করতেন শিল্পী, ভাবলে শ্রদ্ধা নয় আসে মাথা। সফটওয়্যার নেই। ফন্ট নেই। কম্পিউটারই তো ছিল না। সেই হরেক “নেই”—এর মাঝে হাতে ঐকে, কাগজ



কেটে, একটার সাথে আরেকটা জোড়া দিয়ে তাঁরা যে জিনিসটা বিনির্মাণ করতেন, তা এক কথায়— বুল'স আই। সীমিত গণিবন্ধ জীবনের একঘেষেয়ি থেকে একটানে তুলে নিয়ে যেত স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী দুনিয়ায়। কোথেকে যে শিল্পী প্রচ্ছদের মালমশলা জোগাড় করতেন, তিনিই মালুম! আজ হাত বাড়ালে গুগল ইমেজের অনিশ্চেষ্ট ভাণ্ডার। সেই ভাঁড়ারে উঁকি দিয়েও আমি সেইসব অনবদ্য প্রচ্ছদের উৎসমূলের হৃদিস বের করতে পারিনি।

কারা ছিলেন আজকের রনবীর আহমেদ বিপ্লব কিংবা ইসমাইল আরমানের পূর্বসূরি?

আলীম আজিজ। টিপু কিবরিয়া। হাসান খুরশীদ রুমী। ফ্রব এষ। আসাদুজ্জামান। শরাফত খান। সিরাজুল হক। বরণ্য শিল্পী হাশেম খান।

সাঙাঠিক বিচিত্রা ও ২০০০-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক প্রয়াত শাহাদত চৌধুরী “গ্রাসনস্ত” ট্রেণ্ড চালু করেন সেবায়। রূপ শব্দ গ্রাসনস্ত মানে “খোলা হাওয়া”। রক্ষণশীল

সমাজের রক্তচক্ষুকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নিজ অ্যাটিচুডে অবিচল থেকেছেন সেবা-অন্তঃপ্রাণ চৌধুরী সাহেব। তাঁর করা সেই সমস্ত কভার এখনও কী স্মার্ট!

বিশ্বের যে-কোনও প্রান্তের সাহিত্যকর্ম সংগ্রহ আজকাল জলের মত সোজা। অন্তর্জালে দুর্লভ নয় প্রায় কিছুই। ফ্রিতেও মেলে। ষাট-সত্তর-আশির দশকের চিত্রটি কি এরকম ছিল? না। ভাষান্তর বলুন, বা অ্যাডাপ্টেশন-দুস্ত্রাপ্যতার সেই কালে বিশ্বসাহিত্যের অপার সমুদ্র মছুন করে জগদ্বিখ্যাত বইগুলো পড়বার সুযোগ করে দেয়া চ্যাম্পিয়ানি কথা নয়। ব্লক প্রিন্টিং-এর জমানা। অক্ষরের পর অক্ষরের দস্তর পারাবার। এইসব হ্যাপা সামলে সহজ, সাবলীল বাংলায় মুদ্রণ প্রমাদমুক্ত বই-উপহার দেয়াটা রীতিমত চ্যালেঞ্জের বিষয় ছিল। এখনও সেবার বইয়ে বানানভুল খুঁজতে গেলে গলদঘর্ম হতে হয়। হবে না-ই বা কেন? সুসম্পাদিত এসব বইয়ের নেপথ্যের ব্যক্তিটি যে 'স্বয়ং কাজী দা'। নিজস্ব বানানরীতি সৃষ্টিতেও সফলতার পরিচয় দিয়েছে সেবা।

কম্পিউটার-কম্পোজ সেবাতে এসেছে অনেক পরে। '৯০-এর আগে নয়। তা-ও শুরুতে বাইরে থেকে টাইপ করিয়ে আনতে হত। সেজন্য প্রথমদিকে বইয়ের ক্রেডিট-লাইনে রূপসা কম্পিউটার্স, ব্রাদার্স কম্পিউটার সেন্টারের নাম দেখা যেত।

সেবার তুমুল পাঠকপ্রিয়তার ম্যাজিক কী? সততা। নিষ্ঠা। আন্তরিকতা।

"প্রিয় পাঠক, এই বইটিতে, অথবা সেবা প্রকাশনীর অন্য যে-কোনও বইয়ে বাঁধাইয়ের ভুলে যদি কোনও ফর্ম্যা বাদ পড়ে, কিংবা উল্টো-পাল্টা হয়, তা হলে দয়া করে সেটি সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০- এই ঠিকানায় পোস্ট করুন। আমরা নিজ খরচে একটি ভাল বই আপনার ঠিকানায় রেজিস্টার্ড বুকপোস্টে পাঠিয়ে দেব। ঢাকার পাঠক হাতে হাতে বদলে নিতে পারবেন। বইয়ের ভেতর আপনার নাম লিখে থাকলেও ক্ষতি নেই, বরং নামের নীচে ঠিকানাটাও স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লিখুন, এবং নির্দিষ্ট পাঠিয়ে দিন।"

রহস্যপত্রিকা

মনে পড়ে?

রূপান্তরের ক্ষেত্রে সর্বদা কপিরাইট আইন অনুসরণ করে সেবা।

বইয়ের মূল্য নির্ধারণের বেলাতেও তাঁরা অনন্য। বাড়তি মুনাফার চিন্তা নয়; কত কম দামে খরিদারের হাতে বই তুলে দেয়া যায়, সেটাই তাঁদের লক্ষ্য। কোনও বইয়ের দাম ৫৬ টাকা রাখা গেলে সেবা কখনওই সেটির গায়ে ৬০ টাকা লেখে না। এ কারণে সেবার স্টলের সামনে এত ভিড় বইমেলাতে। মার্কেটে বই আসতে-না-আসতে ফুরিয়েও যায়।

কেবল বইমেলাকেন্দ্রিক প্রকাশনা সংস্থা নয় সেবা। সারা বছরই বই প্রকাশ করে থাকেন তাঁরা। প্রতি মাসেই। এক নয়, একাধিক। টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত তাঁদের বাজার।

আরেকটা কথা। বই যতবার রিপ্রিন্ট হোক, প্রিন্টার'স লাইনে সাধারণত প্রথম প্রকাশের তথ্যটুকু থাকে। লোকদেখানো আড়ম্বর সেখানে অনুপস্থিত।

প্রকাশিত লেখার সম্মানী এবং রয়্যালটি প্রদানের ক্ষেত্রেও সেবার জুড়ি নেই।

তারপরও কারও-কারও সন্দেহ যায় না। ৯ ফর্মার রহস্যপত্রিকা ৩৮ টাকা, একই সাইজের বইয়ের দাম বেশি কেন?

কারণ, রহস্যপত্রিকা অত্যন্ত হলেও অ্যাড পাচ্ছে। অপরদিকে বই তুলনামূলকভাবে কম ছাপা হয়। ফলে ব্যয় বেশি পড়ে। তার ওপর বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে পুষিয়ে নেবার কোনও সুবিধা নেই। সেজন্য মূল্য কিছুটা বেশি রাখতেই হয়।

'যদি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল হত,' পাঠকের মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে কাজী দা' বলেন, 'এই দাম তোমাদের গায়েই লাগত না। "রিডার'স ডাইজেস্ট" ৯ ফর্মার পত্রিকা, দাম সত্তর টাকা- তবু তো কিনছে লোকে। বিদেশে তিন গোয়েন্দার সমান একটা বইয়ের দাম একশ' ত্রিশ টাকা। ষা-ই হোক, এটুকু বিশ্বাস রেখো, দাম যথাসাধ্য কম ধরছে সেবা প্রকাশনী। চোখের সামনে অন্যান্য অনেক তো বই রয়েছে, একই সময় প্রকাশিত দুটি বইয়ের

একটু তুলনা করে দেখো না কেন? আমাদের বইয়ের দামও কম, মানও ভাল— তুমিই স্বীকার করবে।’

অভিযোগ তবুও। সেবার কোনও ওয়েবসাইট নেই। ই-মেইলে লেখা দেয়া যায় না। ফেসবুকে অফিসিয়াল পেজ নেই। রাইটাররা জনসমক্ষে আসতে চান না। বর্ধিত আকারে ঈদসংখ্যা নেই রহস্যপত্রিকায়। পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন নেই। নেই গ্রন্থমেলায় মোড়ক উন্মোচনের ঘটনা। ৫০ বছর পূর্তির নেই কোনও আয়োজন। কেন?

‘আমাদের তো, ভাই, হাতে সময় নেই,’ সবিনয় স্বীকারোক্তি। ‘ফেসবুকে অংশগ্রহণ করা বা একুশে মেলায় বিজ্ঞাপন দেয়া বা মোড়ক উন্মোচন— এসবের জন্য সময়ের প্রয়োজন। কবি জসীম উদ্দীনের গয়া বাইদ্যা যেমন গানের সুরে বলেন: “মোরা পঞ্জি মারি, পঞ্জি ধরি, পঞ্জি বেইচা খাই/মোদের সুখের সীমা নাই!” — আমাদের অবস্থাও অনেকটা সেই রকমই। আমরা বই লিখি, বই ছাপি, বই বেইচা খাই। এর বেশি আরও কিছু করবার ক্ষমতা নেই আমাদের। আর... ওসব করলে পরিচিতি, গ্রহণযোগ্যতা বা জনপ্রিয়তা কতটা বাড়ে? তার চেয়ে সাধ্যমত যত্নের সঙ্গে আমাদের পছন্দের কাজ করে যাওয়াই ভাল নয়?’

সেবাদানের এই কাজটিই গত পঞ্চাশ বছর ধরে করে আসছেন তাঁরা। সুদীর্ঘ পথপরিক্রমায় ঝড়-ঝাপটা এসেছে। চলবার বিরাম নেই তবু। এ দেশের পাঠবিমুখ যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে পাঠাভ্যাস গড়ে তুলতে সেবার উদ্যোগ বিরাট অবদান রেখেছে— এ কথা আজ বিদ্বজ্জনের মুখে মুখে।

এক বালক। পড়াশোনায় তুখোড়। খেলাধুলায়ও দশে দশ। তার সাফল্যের ভাগীদার হতে চায় সবাই। ছেলেটা কিন্তু সবটুকু কৃতিত্ব দেয় তার মাকে। মা দেন হরলিকসকে। এক বিজ্ঞাপনে এমনটাই দেখা যায়। আমার ভেতরে যদি সুরুটির অস্তিত্ব থেকে থাকে, তার জন্য আমি সেবার কাছে ঋণী। আমি জানি, আমার সুরে সুর মেলাবেন অযুত কণ্ঠ।

হ্যাট’স অফ, বস।

১৬/০৬/১৪ তারিখে প্রকাশিত হচ্ছে
মাসুদ রানা

পার্শিয়ান ট্রেজার

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

মেলিখানের পাতা ফাঁদে ধরা পড়ল না
রানা-সোহানা। বরং কোডবুকটা নিয়ে
চলে এল নিরাপদে। এবার রহস্যভেদের
পালা। কিন্তু একটা বোতল সিদোরভের
কাছে। কোডটাও। রানা-সোহানা সিদ্ধান্ত

নিল, হানা দেবে সিংহের গুহায়।

কৃষ্ণসাগরের তীরে সুরক্ষিত তার
ম্যানসন-ঝুঁকিটা বোধহয় বেশিই হয়ে
গেল। ট্রেজারম্যাপটা কোথেকে কোথায়
নিয়ে যাচ্ছে ওদেরকে?

শেষপর্যন্ত পরিস্থিতি রানার নিয়ন্ত্রণে
থাকল না। পাচার হয়ে গেল গোপন
খবর। কে জানত, রানাকে একহাত দেখে
নিতে অবশেষে স্বয়ং হাজির হয়ে যাবে
মাফিয়াসদার?



সেবা প্রকাশনী

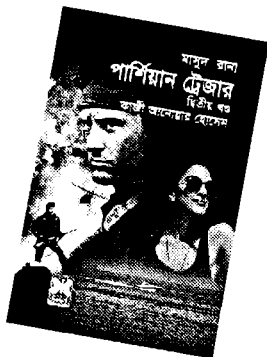
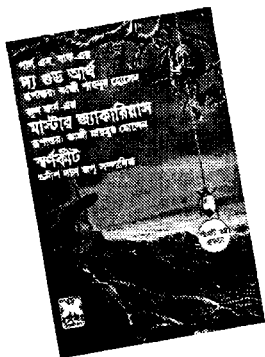
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

mail: alochonabibhag@gmail.com

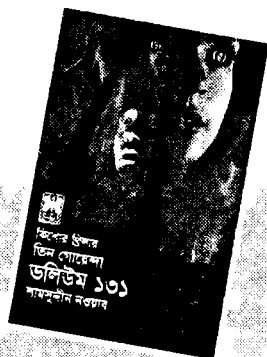
শো-রুম

৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

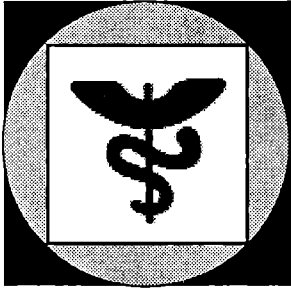
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০



সেবা প্রকাশনীর কয়েকটি বই
 সেবা প্রকাশনীর কয়েকটি বই
 সেবা প্রকাশনীর কয়েকটি বই
 সেবা প্রকাশনীর কয়েকটি বই
 সেবা প্রকাশনীর কয়েকটি বই



সেবা প্রকাশনী
 ২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
 সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
 প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০



আপনার স্বাস্থ্য

ডা. মিজানুর রহমান কল্লোল

E-mail: parijat2006@yahoo.com

প্রসব ব্যথা ১২ ঘণ্টার বেশি

দীর্ঘস্থায়ী হলে বুঝতে হবে

সন্তান প্রসবে কোনো জটিলতা

কোনো দিলেছে।

জেনে নিন গর্ভকালীন বিপজ্জনক উপসর্গ

বাংলাদেশে মাতৃমৃত্যুর হার উদ্বেগজনকভাবে বেশি। প্রতি ঘণ্টায় বাংলাদেশে তিনজন করে মা মারা যান। বিভিন্ন রকম জরিপের ফলাফলে দেখা গেছে, সময়মত চিকিৎসা না পাওয়ার কারণে অনেক মহিলা মারা যাচ্ছেন। সময়মত চিকিৎসা না পাওয়ার বেশ কিছু কারণ রয়েছে। যেগুলোর মধ্যে সামাজিক-পারিবারিক অসচেতনতা উল্লেখযোগ্য। বেশির ভাগ মানুষই জানেন না যে, মাতৃমৃত্যুর বিপজ্জনক উপসর্গগুলো কী কী। তাই নিরাপদ মাতৃত্বের জন্য গর্ভকালীন বিপজ্জনক উপসর্গগুলো সবার জানা প্রয়োজন, যদি এই বিপজ্জনক উপসর্গগুলো সম্বন্ধে গর্ভবতীসহ পরিবারের সদস্যরা সচেতন হন, তা হলে অনেক বিপদ সময়মত কাটিয়ে ওঠা যায় এবং মাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানো যায় এবং সেই সাথে বেঁচে যায় কাক্ষিত শিশুটি।

গর্ভাবস্থায় পা ফুলে যাওয়া, ঘনঘন মাথাধরা ও ঝিচুনি ওঠা একলাম্পশিয়ার কারণে এটা হয়ে থাকে। একলাম্পশিয়া এক ধরনের মারাত্মক ঝিচুনি রোগ, যা গর্ভকালীন ও সন্তান হওয়ার পরপরই হয়ে থাকে। একলাম্পশিয়া রোগটি সাধারণত যারা প্রথমবারের মত গর্ভবতী হন, তাদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। গর্ভাবস্থায় পাঁচ মাস পর থেকে শরীরের ওজন অস্বাভাবিকভাবে বাড়তে থাকে এবং হাতে-পায়ে পানি এসে যায়। এরপর ঘনঘন মাথাব্যথা হতে থাকে। রোগীর ব্লাডপ্রেসার বেড়ে যেতে থাকে এবং প্রস্রাবে অ্যালবুমিন বা প্রোটিন যেতে থাকে। এগুলো সবই প্রি-একলাম্পশিয়া বা একলাম্পশিয়া হওয়ার পূর্বলক্ষণ। এরপর থেকে যদি পরিমিত বিশ্রাম ও ব্লাডপ্রেসার কমানোর ওষুধ না খাওয়া হয়, তখন অবস্থার অবনতি হতে থাকে। কখনও কখনও রোগী চোখে ঝাপসা দেখে, পেটের ওপরের দিকে বেশি ব্যথা হয়, সেই সাথে মাথাব্যথা তো আছেই। এই লক্ষণগুলো দেখা দিলে বুঝতে হবে, একলাম্পশিয়া আসন্ন। এক্ষেত্রে হঠাৎ করেই রোগীর ঝিচুনি ওঠে এবং গর্ভবতী মা ও শিশুটির জীবন মারাত্মক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। এ সময়ে যদি সাথে সাথে চিকিৎসা না করা হয়, তা হলে মৃত্যু প্রায় অবশ্যজ্ঞাবী হয়ে পড়ে। সে জন্য যখনই পূর্বাভাসীয় বিপজ্জনক উপসর্গ দেখা দেয়, তখন দেরি না করে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেন।

গর্ভাবস্থায় রক্তক্ষরণ

গর্ভাবস্থায় রক্তক্ষরণ হওয়া মোটেও স্বাভাবিক ঘটনা নয়। প্রথমত, পাঁচ মাসের মধ্যে রক্তক্ষরণ হওয়ার অর্থ হলো, গর্ভস্থ ভ্রূণটি নষ্ট হয়ে যাওয়ার অবস্থা বা গর্ভপাত হওয়ার আশঙ্কা। রক্তক্ষরণ হওয়ার পরপরই যদি ব্যথা শুরু হয়, তা হলে বুঝতে

হবে, জ্রণটি আর গর্ভে স্বাভাবিক অবস্থায় থাকবে না, জরায়ু থেকে বেরিয়ে যাবে। বিপত্তি ঘটে জ্রণের সামান্য অংশ বের হয়ে যাওয়ার পর বাকি অংশটুকু থেকে যাওয়ায়, তখন অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হতে পারে এবং অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে মৃত্যুর ঝুঁকি বেড়ে যায়। এ সময়ে রোগীর জীবন বাঁচাতে রক্তের প্রয়োজন হয়। সেই সাথে জ্রণের বাকি অংশটুকু বের করে ফেলার জন্য ডিঅ্যাণ্ডলি করতে হয়। কাজেই এ অবস্থায় চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া প্রয়োজন।

গর্ভাবস্থায় পাঁচ মাসের পরও যদি রক্তক্ষরণ হয়, তা হলেও সন্তান নষ্ট হয়ে গর্ভপাত হতে পারে অথবা সময়ের আগেই সন্তানের জন্ম হতে পারে। এই কচি শিশু বাঁচানো খুবই কঠিন এবং মায়ের জীবনেও ঝুঁকি নেমে আসতে পারে।

গর্ভাবস্থায় গর্ভফুলের ভুল অবস্থানের কারণেও রক্তক্ষরণ হতে পারে। গর্ভফুল যদি জরায়ুর ওপরের দিকে না থেকে জরায়ুর নীচের দিকে অবস্থান করে, তখন সমস্যা আরও জটিল হয়ে যায়। জরায়ুর নীচের দিকে যদি গর্ভফুল থাকে, তা হলে প্রসব ব্যথা উঠলে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ অবশ্যম্ভাবী। এই রক্তক্ষরণ বন্ধ করার জন্য উপায় হলো তাড়াতাড়ি সিজারিয়ান অপারেশন করে শিশু ও গর্ভফুলটি বের করা। এ ধরনের অবস্থায় রোগীকে রক্ত না দিলে বাঁচানো কঠিন। কাজেই গর্ভাবস্থায় রক্তক্ষরণকে সব সময়ই ওরুডুর সাথে দেখতে হবে।

সন্তান ভ্রূমিষ্ট হওয়ার পর অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ

সন্তান ভ্রূমিষ্ট হওয়ার পর কিছুটা রক্তক্ষরণ স্বাভাবিক। যদি দেখা যায়, সন্তান প্রসবের পরপরই বেশ রক্তক্ষরণ হচ্ছে, মোটামুটি এক গ্লাসের (এক পোয়া) চেয়ে বেশি যাচ্ছে তখনই সতর্ক হতে হবে। সাথে সাথে তলপেটে মালিশ করতে হবে এবং চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ইনজেকশন মেথারজিন বা আরগমেট্রিন ম্যাংসপেশিতে দিতে হবে। রক্তক্ষরণ বন্ধ না

হলে হাসপাতালে দ্রুত পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে। সেই সাথে পরিবারের দু-তিনজন সদস্য যারা রক্ত দিতে সক্ষম তাদেরকেও পাঠাতে হবে, কারণ রোগীর জীবন বাঁচাতে পারিবারিক রক্ত বিশেষ সাহায্য করবে। মনে রাখতে হবে, মানুষের শরীরে মানুষেরই রক্ত দিতে হয় এবং পারিবারিক রক্ত বেশি নিরাপদ। বাইরের কেনা রক্ত থেকে রোগজীবাণু সংক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

বাধ্যস্ত প্রসব

প্রসব ব্যথা ১২ ঘণ্টার বেশি দীর্ঘস্থায়ী হলে বুঝতে হবে সন্তান প্রসবে কোনো জটিলতা দেখা দিয়েছে। বেশির ভাগ সময় প্রসব ব্যথা ওঠার ১২ ঘণ্টার মধ্যে সন্তান ভ্রূমিষ্ট হয়। যদি এই সময়সীমার মধ্যে না হয়, তখন চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। প্রসব ব্যথা এভাবে বিলম্বিত হলে সন্তানের মাথার ওপর খুব চাপ পড়ে। গর্ভাবস্থায় জরায়ুর ভেতর যে পানির থলি আছে, যেখানে সন্তান ভেসে বেড়ায়-সেই থলিটি ভেঙে গিয়ে যদি সব পানি বের হয়ে যায়, তখন জরায়ুটা গিয়ে সরাসরি শিশুর শরীর ও মাথার ওপর চাপ দিতে থাকে। এভাবে চলতে চলতে শিশুর শরীরে অক্সিজেনের ঘাটতি দেখা যায়। শ্বাসরুদ্ধ হয়ে শিশু পেটের ভেতরেই মরে যেতে পারে। এদিকে বারবার প্রসব ব্যথার যন্ত্রণায় মা অত্যন্ত ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে। কখনও কখনও জরায়ু ফেটে যায় এবং মা মারা যায়। জরায়ু যদি নাও ফাটে, সে ক্ষেত্রে নানা ধরনের জটিলতা দেখা যায়, যা সারা জীবনের জন্য মাকে রুগ্ন অথবা পঙ্গু করে দেয়। তাই জোর প্রসব ব্যথা ১২ ঘণ্টার বেশি হলে হাসপাতালে বা চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যেতে হবে।

জ্বর ও দুর্গন্ধযুক্ত শ্রাব

সন্তান প্রসবের পর মায়ের শরীর স্বাভাবিকভাবেই একটু দুর্বল থাকে। যদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে প্রসব করানো না হয় বা পরিচ্ছন্নতার

চট্টগ্রামে সেবা প্রকাশনী ও প্রজ্ঞাপতি প্রকাশনের যে কোনও বইয়ের জন্য আধুনিক লাইব্রেরীতে আসুন—

আধুনিক লাইব্রেরী এণ্ড গিফ্ট হাউস

১৯/বি, জামাল খান রোড, চট্টগ্রাম। খাস্তগীর স্কুলের উত্তর পাশে।

দৈনিক কর্ণফুলী সংলগ্ন, আইডিয়াল স্কুলের সামনে। মহসিন কলেজের দক্ষিণ গেইটের দক্ষিণ পাশে।

এখানে সেবা প্রকাশনীর আউট অব প্রিন্ট বই পাওয়া যায়।

মোব: ০১১-৯৫-১১১১৪০, ০১৮২২-৮৩৭৪৩০, ০১৭৪৪-০২১২৯৬

নিয়মকানুন না মানা হয়, তা হলে জরায়ুর ভেতর ইনফেকশন বা প্রদাহ হয়। এ ছাড়াও প্রসব ব্যথা ১২ ঘণ্টার বেশি স্থায়ী হলে অথবা পানির থলে আগেই ভেঙে গেলে ইনফেকশন হওয়ার প্রবণতা বেড়ে যায়। এই ইনফেকশন সামান্য থেকে শুরু করে বেশ মারাত্মক হতে পারে। মারাত্মক হলেই জীবনের ঝুঁকি বেড়ে যায়। যে কারণে সন্তান প্রসবের পর জ্বর যদি পরপর দু'দিন থাকে তা হলে অবশ্যই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে এবং ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। অনেকেই এই জ্বরকে সময়ের সাধারণ জ্বর মনে করে থাকে। কিন্তু আসলে এ সময়ে তা না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। সন্তান জন্মের তিন দিনের মধ্যে বুকে দুধ নামে, যে জন্য সামান্য জ্বর হয়, আবার শিশু দুধ টানলেই তড়াতাড়ি জ্বর ভাল হয়ে যায়। জ্বরের সাথে যদি তলাপেটে ব্যথা অনুভব বা চাপ দিলে ব্যথা হয় এবং সেই সাথে যদি দুর্গন্ধযুক্ত শ্রাব যায়, তা হলে বুঝবেন ইনফেকশন মারাত্মক আকারে রূপ নিয়েছে এবং সেপটিক হয়ে গেছে। এক্ষেত্রে অবশ্যই হাসপাতালে যাবেন অথবা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেন।

গর্ভাবস্থায় নির্ঘাতন

আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলের এক জরিপে দেখা গেছে, গর্ভাবস্থায় প্রায় শতকরা ৩০.৬ ভাগ মহিলা শারীরিক নির্ঘাতনের শিকার হয়। গবেষণার ফলে দেখা গেছে, গর্ভাবস্থায় নির্ঘাতন করলে গর্ভবতী ও গর্ভস্থ শিশু দু'জনের জীবনেই ঝুঁকি নেমে আসতে পারে। মাতৃমৃত্যুর কিছু কারণের মধ্যে শতকরা ১৪ ভাগ মৃত্যুর কারণ হিসেবে নারী নির্ঘাতনকে চিহ্নিত করা হয়েছে। শুধু শারীরিক নির্ঘাতন নয়, মানসিক নির্ঘাতনও গর্ভস্থ শিশুর ওপর প্রভাব ফেলে। কাজেই গর্ভাবস্থা মহিলাদের জীবনের একটি বিশেষ সময়। এ সময় গর্ভবতীকে শারীরিক ও মানসিক শান্তি দিতে পরিবারকেই এগিয়ে আসতে হবে।

লেখক: আবাসিক সার্জন, ঢাকা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল।

চেমার: পপুলার ডায়গনস্টিক সেন্টার লিঃ, ২ ইংলিশ রোড, ঢাকা।
ল্যাব সাইন্স ডায়গনস্টিক লিঃ, ১৫৩/১ গ্রিন রোড (পাশপথের কাছে), ঢাকা।
মোবাইল: ০১৫৫২৩৪৫৭৫৪

চিঠিপত্রের

জবাব



সমস্যা-১: আমার বয়স ২০। ওজন ৪৫ কেজি। উচ্চতা ৫ ফুট। বিজ্ঞানের এই উৎকর্ষতার যুগে উচ্চতা বাড়ানোর কোনও ওষুধ আবিষ্কার হয়েছে কি? বা কী উপায়ে আমি আমার উচ্চতা আরও ৬ ইঞ্চি বাড়াতে পারি? বংশগতভাবে আমাদের পরিবারের সবার উচ্চতা কম। আমি যে করেই হোক উচ্চতা বাড়াতে চাই।

সমস্যা-২: আমার প্রায় সারা মুখেই ব্রণের কালো দাগ মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। কী ওষুধ বা ক্রীমের মাধ্যমে মুখের কালো দাগ দূর করা যাবে?

সমস্যা-৩: আমার মাথায় প্রচুর চুল ও চুলগুলো মোটাগুলো। কিন্তু সমস্যা হলো কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করছি ১/২টি করে অনেকগুলো চুল পেকে গেছে। এর প্রতিকার কী?

উপরোক্ত তিনটি সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান জানালে চির কৃতজ্ঞ থাকব।

মোঃ সোহেল রানা

যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

সমাধান: আপনার চিঠি পড়লাম। আপনি তিনটি সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন।

আপনার প্রথম সমস্যার উত্তরে বলতে চাই যে উচ্চতা বাড়ানোর কোনো ওষুধ এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। তবে গ্রোথ হরমোনের ঘাটতি থাকলে সেটা পূরণ করা যেতে পারে। অপারেশনের মাধ্যমেও কিছুটা লম্বা হওয়া সম্ভব।

আপনার দ্বিতীয় সমস্যা হলো মুখ জুড়ে ব্রণের কালো দাগ। এজন্য আপনি মুখে কোলাজেন ইসস্টিন ক্রিম ব্যবহার করতে পারেন। ক্রিমে কাজ না হলে আপনি লেজার চিকিৎসা নিতে পারেন।

তৃতীয় সমস্যার উত্তরে বলছি, চুল পাকা রোধ করার জন্য আপনি একজন চুল বিশেষজ্ঞকে দেখাতে পারেন। এব্যাপারে আপনি এলিফ্যান্ট রোডে অবস্থিত স্ট্যাগার্ড মেডিক্যাল সার্ভিসে যোগাযোগ করতে পারেন।

মৃত হরিণ

ইমরান খান

তুলুতুলুর
উপর
চরম
বিরঙ
হলাম।
কেন
ওসব
দিকে
দৃষ্টি
আকর্ষণ করা?
বেশ তো
প্রেমের
নাটক
দেখছিলাম।



সম্পাদকের বক্তব্য: সপ্তাহখানেক আগে আমাদের পত্রিকার ঠিকানায় নিম্নরূপ একটি পত্র আসে:

'দুই নাকি পাঁচ বছর মনে করতে পারছি না, আমার বন্ধু এবং সহকর্মী নিজামুদ্দিন মারা গেছে। মৃত্যুর মাস ছয়েক পর আমি তার বাসায় ভাবির খোজ-খবর নিতে যাই। ভাবি আমাকে তাঁর স্বামীর কাগজপত্র এবং শেলফ ভর্তি বইগুলো নিয়ে যেতে অনুরোধ করেন। তিনি ছেলের কাছে আমেরিকা চলে যাচ্ছেন। এসব নেয়াটা ঝামেলা হবে, আর তাঁর কোনও কাজেই আসে না এসব। মৃত স্বামীর ফেলে যাওয়া প্রিয় কিছু আজ তাঁর কাছে বোঝা। নিজামুদ্দিন আমার সহকর্মী কম আর বন্ধু বেশি ছিল। কাজেই বইগুলো আমি নিজের বাসায় এনে সযত্নে সংরক্ষণ করি। বুকশেলফ পরিষ্কার করতে গিয়েই হঠাৎ একদিন তার ডায়েরিটি আমার হাতে চলে আসে। অল্প কিছুদিনের জন্য ডায়েরি লেখা শুরু করেছিল সে। একসময় তার সাহিত্যিক হবার বাসনা ছিল। সেই বাসনাই বোধ করি কিছুটা পূর্ণ করার চেষ্টা করেছিল ডায়েরি লিখে। কারণ, তার ডায়েরিতে কিছু ডায়লগের ব্যবহার আছে। ডায়েরিতে সাধারণত ডায়লগ লেখা হয় না। কৌতূহল সত্ত্বেও ডায়েরিটি আমি বহুদিন খুলিনি। কৌতূহলের প্রধান কারণ, নিজামুদ্দিন যথেষ্ট আত্মকেন্দ্রিক মানুষ ছিল। হঠাৎ হঠাৎ রহস্যময় আচরণ করত সে। তিরিশ বছর একসাথে চাকরি করেছি আমরা। অবসর নেবার কিছুদিন আগে একদিন সে আমাকে চিনতে পারেনি। মাঝে মাঝে তার এরকম অস্থায়ী স্মৃতিপ্রংশ হত। মাস

দেড়েক সে মৃত্যুশয্যায় ছিল, সে সময়টাতে সে কাউকে চিনতে পারত না। যাকেই দেখত, 'তুলুতুলু' বলে ডাকত। সম্ভবত সে সময় তার ডেলিরিয়াম হচ্ছিল। সে তার ব্যক্তিগত জীবন কারও সাথে শেয়ার করত না। তার সমস্যা কেউ নাকি বুঝবে না, সমাধানও করতে পারবে না। কারণ, তার সমস্যা নাকি এ পৃথিবীর মানুষের সমস্যা নয়। যা হোক, কৌতূহল দমন করতে না পেরে অবশেষে তার ডায়েরিটি পড়লাম। এক বছরের ডায়েরির মধ্যে দু'মাস ব্যতিত লক্ষণীয় কিছু নেই। প্রতিদিন একই লেখা-ঘুম ভেঙে অফিসে যাওয়া, অফিস থেকে বাসায় ফেরা, টিভি দেখা, বই পড়া আর ঘুম। কিন্তু দুটি মাস লক্ষণীয়। মনে হলো, এটা পত্রিকায় প্রকাশ করা যেতে পারে। আপনাদের স্বনামধন্য পত্রিকায় এটি পাঠালাম। ছাপার উপযুক্ত মনে করলে ছাপবেন। জীবিত অবস্থায় তার সাহিত্যিক হবার অকালমৃত শব্দকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করার এটা একটা ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র।'

শওকত।

কোনরকম সম্পাদনা ছাড়া অবিকৃত ভাবে তার ডায়েরির সেই বিশেষ অংশটুকু ছাপানো হলো।

১৫ এপ্রিল

আজ সকালে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছে। ঘুম ভেঙেই দেখি এক অপরিচিত যুবক আমার বিছানায় বসে আছে। সেই তুলুতুলু আয়ত চোখ, ঢালু কপাল, অযত্ন লালিত ঈষৎ কুঞ্চিত এলোমেলো চুল, ঠোঁটের কোনায় ঝুলে থাকা সেই হাসি, হাসির উপরে নাকের ডান ছিদ্রের নীচে সেই কালো তিল, সেই খন্ডরের পাঞ্জাবি, সেই খোঁচা-খোঁচা দাড়ি।

আচ্ছা, ঘুরে ফিরে 'সেই' কথাটা বারবার মনে ভাসছে কেন আমার? তার মানে কী এই চেহারা আমি আগেও দেখেছি? কই, মনে তো পড়ে না। অথচ মুখখানা বেশ চেনা। নিত্যপরিচিত আপনজনদের কান আমরা সচরাচর লক্ষ্য করি না। মুখের দিকেই তাকাই বরাবর। কানসহ যখন আমরা তার দিকে তাকাই, তার চেহারা বদলে যায়। আমার মনে হলো, অতি পরিচিত কারও কান আমি এই

প্রথম নজরে আনলাম।

আজ সকালটা অন্যরকম। ঘুম ভাঙা, লুঙ্গির গেরো ঠিক করা, পাশেই শুয়ে থাকা শ্রোতা স্ত্রীর পরনে অসংলগ্ন শাড়ি এবং বিছানায় বসে থাকা ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের এই নির্লজ্জ যুবক-সবকিছু মিলিয়ে এক নিদারুণ অবসাদের জন্ম হলো আমার মনে, যে অবসাদের উৎস আমার অজানা। ছেলেটিকে আমি দেখেছি কোথাও না কোথাও, কিন্তু চিনি বলে মনে হচ্ছে না।

মাহমুদা ঘুম থেকে উঠে টালমাটাল পায়ে তাঁর বিগতযৌবনা চর্বিবহুল ডাঁজ পড়া কুৎসিত থকথকে দেহটা শাড়ি দিয়ে নিতান্ত অবহেলায় আড়াল করার চেষ্টা করতে করতে নির্বিকার মুখে বাথরুমে ঢুকে গেল। সেখানে তার এইমাত্র সযত্নে ঢেকে নেয়া শরীরের সবচেয়ে কুৎসিত অঙ্গটিকে উন্মুক্ত করবে সে। আমি ছেলেটির দিকে তাকালাম। সে একই ভাবে বসে আছে নির্বিকার মুখে। মাহমুদার চির পরিচিত গতিবিধি দেখে মনে হলো না ঘরে কোনও বহিরাগতের অস্তিত্ব আছে। বাথরুম থেকে বেরিয়ে সে আবার শুয়ে পড়ল। আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে সেই একই জায়গায় ঢুকে গেলাম। স্মরণকালের মধ্যে প্রথমবার নিজের মলের দিকে গভীর মনোযোগের সাথে তাকালাম। নিতান্ত আমাশয় না হলে নিজের মলের দিকে এত সযত্নে তাকিয়েছি বলে মনে পড়ে না আমার। পথে-ঘাটে কতবার মল দেখে নাকে রুমাল চাপা দিয়েছি। অত্যন্ত সন্তর্পণে সতর্ক পায়ে এড়িয়ে গেছি একে। কখনও তো মনে হয়নি যে আমার নিজের পেটেই একগাদা গু! অত্যন্ত তৃপ্তি সহকারে যে খাবার আমি খাই, তা থেকেই এর জন্ম! শরীরের ভেতরে যার স্থায়ী নিবাস, তাকে শরীরের বাইরে মাখাতে এত আপত্তি কেন?

বেড়রুমে ফিরে ছেলেটিকে আর দেখতে পেলাম না। তবে উপলব্ধি করলাম-আছে, সে আশপাশেই আছে। বাতাসে তার অস্তিত্ব টের পেলাম। কিছুই হয়নি ভঙ্গিতে নাশতা সারলাম। অফিসের জন্য তৈরি হলাম। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে দেখলাম নিজেকে। কাকের শরীরের মত কলপ দেয়া কালো চুল, মাথার সামনে সুখ

টাকের আভাস, নাকের নীচে রাশভারি গোঁফ, কড়া মাড় দেয়া শার্ট-প্যান্ট। যৌবনের খন্দরের পাঞ্জাবিশুলো সব দান করে দিয়েছি। কর্পোরেট জবে ও বস্ত্র অচল। যৌবনে শখ করে একবার দাড়ি রেখেছিলাম। চাকরিতে ঢোকার পরেও অনেকদিন ছিল সেগুলো। পরবর্তীতে যখন দু'চারটে দাড়ি পাকতে শুরু করল, তখন থেকে আমি ক্লিন শেভড্। আজও নিজের পাকা দাড়ির মুখোমুখি হবার ভয়ে প্রতিদিন গাল চাঁহতে ভুল হয় না।

মাহমুদা ঋতুনের শাড়ি আবারও আলগা হয়ে গেছে। তার আদুল দেহে গাভীর ওলানের মত কুর্খসিত স্তনদুটির অনেকটাই দেখা যাচ্ছে। কাঁথাটা তার গায়ে ছুঁড়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। এ ছাড়া আজ আর নতুন কিছু ঘটেনি।

১৬ এপ্রিল

নিজের ছায়া ঝুঁজছিলাম। এই কাজটি মাঝে মাঝেই করি। আর এটা তখনই করি যখন চারপাশের আলো মাটিতে ছায়া ফেলবার জন্য যথেষ্ট নয়। বাস স্টপেজে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আকাশ মেঘলা, মাটিতে ছায়া পড়ার কোনও কারণ নেই। ছায়া ঝুঁজতে গিয়ে ছেলেটিকে দ্বিতীয়বারের মত চোখে পড়ল। বাসযাত্রীদের দীর্ঘ সারিতে আমার ঠিক পেছনেই ঝুঁজ ভঙ্গিতে দু'হাত পেছনে দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ছেলেটি। ঢুলুঢুলু দু'চোখে সুদূরের পিয়াস। ঠোঁটের কোণে ঝুলে থাকা হাসিতে নিষ্পাপ স্পর্ধা। মৃদু বাতাসে স্বাধীন দেশের পতাকার মত কাঁপছে পাঞ্জাবির কোনা। বন্ধনজ্ঞানহীন হরিণশিশুর মত দু'একটি চুলের গোছা কপাল পেরিয়ে ভুরুন সীমানা লঙ্ঘন করতে উদ্যত। আমি তাকে না দেখার ভান করে বিরস মুখে দাঁড়িয়ে রইলাম। একে বেশি পাতা দেয়া যাবে না। ব্যাটা কী মতলবে ঘোরাঘুরি করছে কে জানে। বর্তমান জামানায় ধান্দাবাজের তো অভাব নেই।

বাস আসা মাত্রই দৈনন্দিন কসরৎ শুরু হলো আমার। দু'জনকে টপকে, একজনকে কনুইয়ের গুঁতোয় পথ থেকে সরিয়ে, এবং আরও কয়েকজনকে পাশ কাটিয়ে অবশেষে সফলতার সাথেই বাসদেবতার আরশে আশ্রয় গ্রহণ করলাম। সৌভাগ্যক্রমে মহিলা

সিটগুলোর একটিতে বসে পড়ার বিরল সৌভাগ্যও লাভ করলাম। বাস ছাড়তেই আমার পাশে ছেলেটিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। উদাস চোখে জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে আছে। আমার দিকে তার কোনও মনোযোগ আছে বলে মনে হচ্ছে না। হারামজাদার মতলব কী? আমার সাথে সাথে ঘুরছে অথচ আমাকে পাতাই দিচ্ছে না। মোটামুটি বিভ্রান্ত হতে শুরু করলাম।

অফিসের লিফটে চড়ে চকিত দৃষ্টিতে একবার আশপাশে দেখে নিলাম। লিফটম্যান ছাড়া কাউকে চোখে পড়ল না। কিন্তু লিফটম্যানের ঠোঁটেও যে মৃদু হাসি। আনমনেই নিজের ঠোঁটে একবার হাত বুলিয়ে নিলাম।

হঠাৎ কে যেন বলল, 'কী খবর নিজাম ভাই?'

আমি দাড়িওয়ালা এই লোকটিকে চিনতে পারলাম না। পরনে সুট, হাতে অফিসের ফাইলপত্র। কাজেই অফিসের কেউই হবেন। আমি ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে নাকের ডান ছিদ্রের নীচে হাত বোলাতে লাগলাম।

'ঘটনা কী নিজাম ভাই? কোনও সমস্যা?'

'না, ঠিক তা না, আপনি ভাল?'

'নিজাম ভাই, আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন না?'

'না, আমি ঠিক...'

'আমি শওকত। আপনার কলিগ।

আপনার চশমার পাওয়ার ঠিক আছে তো?'

'ওহ, শওকত, আমি দুর্গমিত।'

'আপনার শরীর খারাপ? কয়েকদিন ধরেই আপনাকে অন্যরকম লাগছে।'

'না, বোধহয় একটু অনামনস্ক ছিলাম।'

শিমাছের মত পিছলে বেরিয়ে এলাম আমি। অফিসের ডেস্কে এসে বসলাম। তখন একজন কলিগ এসে (একেও চিনলাম না, গতকাল হয়তো চিনতাম) বলল, 'নিজাম সাহেব, আপনার বোধহয় ভুল হয়েছ, আপনি আমার ডেস্কে বসে পড়েছেন।'

আমি দুর্গমিত বলে উঠে পড়লাম। কিন্তু সেই কলিগ বলল, 'এসব কী বলছেন? অসুস্থ নাকি আপনি, নিজাম সাহেব?'

আমি বললাম, 'কী আবার বললাম?'

দুগ্ধিত বলেছি। সুস্থ মানুষ কি দুগ্ধিত বলতে পারে না?’

‘না, আপনি বলেছেন, “যে ডেস্কই বসি, কী আসে যায়? সব ডেস্কই এক। সেই ফাইলপত্র নাড়াচাড়া আর কম্পিউটার ঘাঁটা। একটাতে বসলেই হলো।” এরপর আপনি দুগ্ধিত বলেছেন।’

আমি আবারও দুগ্ধিত বলে পিছলে উঠে এলাম। যদিও এ ধরনের কোনও কথা বলেছি বলে মনে করতে পারলাম না। খানিক পরেই বড় সাহেবের সালাম এল। কলিগদের সামনে বড় সাহেবের চোদ্দগুটি উদ্ধার করে তাঁর পিণ্ডি চটকে সালামের যথার্থ উত্তরে অদৃশ্য করজোড়ে হিমশীতল ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের বেবি ফুড প্রোগ্রাম ফাইলের ফাইনাল ড্রাফটে আমি কেন গতকাল সই না করেই চলে গেছি। জনাসূত্রে প্রাপ্ত হাতের রেখা মুছে ফেলবার আশ্রয় চেষ্টা করতে করতে মিনমিনিয়ে বললাম, ‘দুগ্ধিত, স্যার, ভুলে গেছি। আর এমন হবে না।’

‘ফাজলামি পাইছেন?’ বৃষ্টি বহনকারী মেঘের গুরুগুরু নিনাদের মত একটি কঠোর বন্ধ ঘরের শীতল স্থির বাতাসে একগাদা উষ্ণতা স্প্রে করে দিল, ‘পুরো ফাইলই তো ভুয়া। অভিটে গিয়ে দেখছি বেবি ফুডের নামে বেবি পয়জন তৈরি হচ্ছে। এই জিনিস আপনারা মার্কেটে ছাড়বেন, আর সই না করার জন্য আমাকে কৈফিয়তও তলব করবেন।’

সর্বনাশ! ঢুলুঢুলু এখানে এসে উপস্থিত! এ তো আমার চাকরি খাওয়ার ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছে দেখছি। আমি প্রাণপণে তাকে ইশারা করতে লাগলাম, চোখ টিপলাম। কিন্তু বার্থ হলাম। সে আবার চোঁচিয়ে উঠল, ‘ওই চেয়ারে বসলে কারোরই মাথা ঠিক থাকে না। তোরও নেই। কাজেই তোকে এক লাথি দিয়ে চেয়ার সুদ্ধ মাটিতে ফেলে দেয়া উচিত।’ বলেই এক লাথি কষাল সে। যদিও সে লাথি কোনও কাজে এল না। সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার, বড় সাহেবের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হলো না যে, ঘরে সে আর আমি ছাড়া অন্য কারও অস্তিত্ব আছে। কিন্তু ঢুলুঢুলু ব্যাটা অত্যন্ত করুণ চোখে

আমার দিকে তাকিয়ে রইল। ‘আমি এক্ষুণি ফাইলে সই করে নিয়ে আসছি স্যার,’ বলে বড় সাহেবের রুম থেকেও পিছলে বেরিয়ে এলাম। রুমের বাইরে এসে ঘাপটি মেয়ে রইলাম। ঢুলুঢুলু ব্যাটা বেরোলেই ক্যাক করে চেপে ধরতে হবে। সিআইডির লোক নাকি ব্যাটা? দশ মিনিট পর নিজের ডেস্কে ফিরলাম। কারণ, বড় সাহেবের রুম থেকে কেউ বেরিয়ে আসেনি। ছুটির পর অফিস থেকে বেরোবার সময় সিকিউরিটি গার্ডকে পাকড়াও করলাম। জিজ্ঞেস করলাম আজবাজে লোক অফিসে ঢোকে কী করে। হারামজাদা কিছুই বুঝতে পারছি না ভাব করে বোকচৈতনের মত তাকিয়ে রইল। ব্যাটা ফাঁকিবাজ।

১৭ এপ্রিল

নতুন কিছু ঘটেনি।

১৮ এপ্রিল

একই।

১৯ এপ্রিল

আজ কী মনে করে গৌফ কামিয়ে ফেললাম। প্রায় বিশ বছর পর নতুন করে আবিষ্কার করলাম, আমার নাকের নীচে এককালে একটা কালো তিল ছিল (নাকি এখনও আছে?)। অফিস থেকে ফেরার পথে একটা সেলুন ফাঁকা দেখে ঢুকে পড়তে খুব ইচ্ছে হলো। ঢুকলামও। কাজ সেরে নাপিত ব্যাটা বলল, গৌফ ছাড়া আমাকে নাকি দেখতে অনিল কাপুরের মত লাগছে। ইচ্ছে হচ্ছিল কানপট্টির নীচে এক খাবড়া দিয়ে ব্যাটাকে বৃন্দাবন দেখিয়ে দিই। যা হোক, আমি তাকে পাঁচ টাকা বখশিশ দিলাম। হাজার হোক প্রশংসা তো করেছে! মাহমুদা অবশ্য গৌফহীন আমাকে দেখে তেমন আহ্লাদিত হলো না। বলল, নাকের নীচে তিল আমাকে একদম মানায় না। আমি অবশ্য তাকে বলতে পারলাম না, গাভীর ওলানের মত স্তনদুটো ব্লাউজে ঢেকে রাখা তাকেও মানায় না। হঠাৎ মনে হলো, এই মহিলা আমার সাথে কেন? সে তো অন্য কোথাও থাকতে পারত। আমিই বা কেন তার সাথে। আমরা কি মেড ফর ইচ আদার? নাকি তার জন্য যাকে তৈরি

করা হয়েছে সে অন্য কারও সাথে বসবাস করছে? আমিও তাই? মাহমুদাও? সবাই তাই? মাহমুদার সাথে ভার্টিসিটে ক্লাসমেট হিসেবে পরিচয়, তারপর বিয়ে। এটা কি অলঙ্ঘনীয় ছিল? মাহমুদার ১৯৫২'র বদলে ১৯৫৩-তে জন্ম নেয়াটা অসম্ভব ছিল না। তা হলে তার সাথে আমার দেখাই হত না, ক্লাসমেট হতাম না আমরা। তা হলে কী করে আমরা মেড ফর ইচ আদার? হয়তো যে কোনও এক বছর জন্ম নেয়া কোনও এক লতিফা আমার সন্তানের মা হত। অন্য এক মহিলার শরীরে প্রবেশ করে বংশবৃদ্ধি করতাম। তখন আমি কি মাহমুদাকে মিস করতাম? যাকে চিনি না তাকে হারানোর প্রশ্নই আসে না। কেউ যদি প্রশ্ন করে মাহমুদাকে ভালবাসি কি না, বলব- হ্যাঁ। তখন যদি লতিফার সম্পর্কে প্রশ্ন করা হত, তখনও কি আমি বলতাম- না, আমি মাহমুদাকে চাই?

তা হলে কে কার জন্য তৈরি হয়েছে?

৩০ এপ্রিল

যথার্থি।

২ মে

বিরক্তি।

৩ মে

আজকের দিনটা অন্যরকম। অন্যরকম এই অর্থে যে ছুটির দিনে সাধারণত আমি বাইরে যাই না। আজ কেন যেন সকাল থেকেই প্রচণ্ড অস্থির লাগছিল। তার উপর মাহমুদার ক্রমাগত ঘ্যানঘ্যানানি-এটা নাই, ওটা নাই, সংসারের দিকে আমার কোনও মনোযোগ নাই। চিংকারের সাথে সাথে তার গাভীর ওলানের মত বুলন্ত স্তনদুটি কেঁপে কেঁপে ওঠে। কুৎসিত দৃশ্য। শেষে গায়ে শার্ট গলিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। বিশেষ কিছু না ভেবেই সামনে মানিকগঞ্জের বাস পেয়ে চড়ে বসলাম। সিলেটের বাস পড়ে হয়তো তাতেই চড়তাম। কিছু একটাতে চড়া নিয়ে কথা। ছুটির দিনের ফাঁকা রাস্তায় বিশ্রামোন্মুখ মানুষের আলসেমির সুযোগ নিয়ে হু-হু করে সামনের দিকে ছুটে চললাম এবং বেশ ভালই অনুভব করতে

লাগলাম। এই চলা একসময় থেমে যাবে ভেবে খারাপ লাগল। আরও খারাপ লাগল যখন ভাবলাম ফিরতি বাস বলে একটা ব্যাপার আছে। যতদূরেই যাই না কেন, ফিরে আসতেই হবে। অনন্ত যাত্রা বলতে কিছু বোধহয় নেই। সবই সীমিত। মৃত্যুর পরও আমাদের যাত্রা কবর পর্যন্ত, যদি ঈশ্বর থেকে থাকেন, তবে খুব বেশি হলে হাশরের ময়দান পর্যন্ত। মানবজীবনের সীমাবদ্ধতা ছেড়ে আনন্দময় অসীম যাত্রা করতে বাধা কোথায়? যা হোক, এসব চিন্তা আপাতত দূর করে দেবার ধান্দায় হাইওয়ের পাশে অপসূয়মান প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে লাগলাম। পাকা রাস্তার পাশ দিয়ে একটু পরপর কাঁচা-অর্ধকাঁচা রাস্তা গ্রামের দিকে মিলিয়ে গেছে। বহুদিন পর কাঁচা রাস্তা দেখলাম। পথগুলো বিভিন্ন রকম। কোনোটা মসৃণ, কোনোটা মিহি ধুলোমাখা, কোনোটা এবড়োখেবড়ো, আবার কোনোটা ইট বিছানো। শৈশবে এ ধরনের রাস্তা ধরে দৌড়ে যেতাম বহুদূর। ফেব্রার কথা মাথায়ই আসত না। অপরিপক্ক পায়ে ছুটে গিয়ে হাঁচট খেয়ে পড়ে যেতাম। হয়তো একটু কাঁদতাম। উঠে আবার দৌড়াইতাম। এখন বোধহয় পড়লে আর উঠতে পারব না। যৌবনেও এ ধরনের পথ আমাকে খুব আকর্ষণ করত। মনে হত এই পথ কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে দেখে আসি। কল্পনা করতাম এই পথের শেষে একটা গ্রাম আছে, সেই গ্রামে কাঁচা রাস্তা আছে, মাঠ আছে, ক্ষেত আছে, খড়ের চালের কাঁচা বাড়ি আছে, বারান্দায় খালি গায়ে বসে থাকা হক্কা হাতে বৃদ্ধ আছে, উঠোনে শুকোতে দেয়া ধান ঝাবার সুযোগ সন্ধানী দাঁড়াকাক আছে।

আজও অনুভব করলাম সেই ইচ্ছে মরেনি।

আজও আমার এই পথ বেয়ে মসৃণ যাত্রা করতে বড় সাধ হলো। কিন্তু এক ধরনের দ্বিধা অনুভব করলাম, যা আগে কখনও করিনি। এমন পথে হেঁটে যাওয়া খুব কঠিন নয়। বাস থামিয়ে নেমে পড়লেই হলো। প্রশ্ন হলো, পথ তো অসংখ্য। একটার পর একটা, একসঙ্গে অনেক। কোনটা ধরে যাব? লটারির মত যে কোনও একটা ধরে হাঁটা শুরু করব? সেই পথের শেষে গিয়ে যদি দেখি আমার কাক্ষিত

গর্ভব্য সেখানে নেই? অথবা সেই পথের যদি আদৌ কোনও শেষ না থাকে? প্রত্যেকটি পথে হেঁটেই কী তা হলে দেখে আসব শেষে কী আছে? যদি একটি পথের শেষ দেখতে গেলেই নির্ধারিত সময় ফুরিয়ে যায়? তবে কী লটারি করেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে? নাকি আমি নিজেই কোনও লটারির ফল? যে পথে এখন আছি এ পথ কী আমার বেছে নেয়া? নাকি লটারি করে আমাকে এখানে নামিয়ে দেয়া হয়েছে? শেষে মনে হলো—নাহ, হাইওয়ে ধরে চলছি, এই আমার জন্য ঠিক আছে। আজ এখানেই থামতে হবে। আজকের জন্য নির্ধারিত পাতাটা ফুরিয়ে এসেছে। ডায়েরিতে একদিনের জন্য কেবল একটিই পাতা বরাদ্দ থাকে। এর মধ্যেই আজকের দিনটিকে বন্দি করতে হবে। প্রায়ই মনে হয়, বাস্তব জীবনেও বোধহয় আমি একটা ডায়েরির পাতায় বন্দি। বলতে ভুলে গেছি, হাইওয়ের পাশ দিয়ে বিলীয়মান প্রত্যেকটি পথে আমি ঢুলুঢুলুকে ফিনফিনে বাতাসে পাঞ্জাবির কোনো উড়িয়ে উদ্ধত ভঙ্গিতে হেঁটে যেতে দেখেছি।

৪ মে

জামি ফোন করেছিল। ফ্লোরিডায় বদলি হয়েছে। জমি কিনেছে সেখানে। ভালই আছে।

৫ মে

ছুটি। বই পড়ে আর ঘুমিয়ে কাটালাম।

৬ মে

তিনদিন পর আজ আবার ঢুলুঢুলুর সাথে দেখা। অফিস থেকে ফিরে চায়ে চুমুক দিয়ে ঠ্যাং নাচাতে নাচাতে টিভি দেখছিলাম। একটা প্রেমের নাটক হচ্ছিল। নায়ক নায়িকাকে ভাবালুতাপূর্ণ ভালবাসার ডায়ালগ দিচ্ছিল।

আমি কিছুটা আবেগাপ্ত হয়ে মাহমুদার সাথে আমার পরিচয়ের প্রথম দিনগুলোর কথা ভাবছিলাম, (বর্তমান দিনগুলোর কথা ভেবে কি কখনও এই আবেগ আসবে?) তবনি হঠাৎ দেখলাম ঢুলুঢুলু আমার তিন হাত দূরে সোফায় বসে আছে। সে-ও টিভির দিকে তাকিয়ে আছে, তবে উপরে নয়, নীচে। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে পর্দার নীচে ক্রমশ অপসূর্যমান হেডলাইনের দিকে তাকালাম। আফগানিস্তানে গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে তিনজন নিহত, আহত শতাধিক; ইরাকে আত্মঘাতী বোমা হামলায় তেরো শিশুসহ আঠাশ জনের মৃত্যু; মুক্তিপণ না পেয়ে এক সাংবাদিককে জবাই করে হত্যার ভিডিও চিত্র প্রকাশ করেছে এক জঙ্গী গোষ্ঠী; ধর্মিতা গৃহবধূকে ১০১ দোররা মেরেছে ফতোয়াবাজরা; বিরোধীদলের ডাকা হরতালে লাঠিচার্জের প্রতিবাদে আগামীকাল আবার হরতাল; নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম আকাশছোঁয়া, নাজেহাল জনগণ, বাজার পরিদর্শন করেছেন বাণিজ্যমন্ত্রী; চোরাই পথে মালয়েশিয়া যাবার পথে ট্রলারে পঁচিশ বাংলাদেশি উদ্ধার; পুত্রের হাতে পিতার মৃত্যু, পুলিশ অনুমান করছে কারণ সম্পত্তিই; বিয়ের পিড়িতে বসলেন জনপ্রিয় চিত্রনায়িকা মধুরিমা; যৌতুকের দাবিতে এক গৃহবধূ কেরোসিনে দগ্ধ; সন্তানকে হত্যা করে মায়ের আত্মহত্যা, পিতা পলাতক; রাজধানী হুমকির মুখে, হেলে পড়েছে কয়েক শো বহুতল ভবন, তদন্ত কমিটি গঠিত; রাজধানীর আশপাশে এবং ভেতরে ইটের ভাটা এবং মেয়াদোত্তীর্ণ গাড়ির কারণে দূষণ চরমে; বিশ্ব পরিবেশ রক্ষা বিষয়ক এক সেমিনারে যোগ দিতে আজ যুক্তরাষ্ট্র রওনা হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী; যানজট নিরসনে রাজধানীতে প্রাইভেট কার কমিয়ে যাত্রীবাহী বাস চালু করা হবে; এমপিরা নিজেদের জন্য

ময়মনসিংহে সেবা প্রকাশনী ও প্রজাপতি প্রকাশনের বই বিক্রোতা

মতি লাইব্রেরি

৯০ সি কে ঘোষ রোড, ময়মনসিংহ

মোবাইল: ০১৭১১২৪৩৩০০

০৯১-৬৭৭৪৫

জিণ দাবি করেছেন... তুলুতুলুর উপর চরম বিরক্ত হলাম। কেন ওসব দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা? বেশ তো প্রেমের নাটক দেখছিলাম। আবার চোখ ফেরালাম নাটকে। কিন্তু ততক্ষণে দৃশ্যপট পাল্টে গেছে। ডিশ লাইনে সমস্যা দেখা দিল কি না কে জানে—ছবি বিকৃত হয়ে গেল, বিকৃত হলো ডায়লগ। নায়কের চেহারা একেবের্কে পপাইয়ের মত হয়ে খানিকটা লম্বা হয়ে নীচের দিকে বেকে গেল। নায়িকার ডান চোখ আর বাম কান অস্বাভাবিক বড় হয়ে কোনও বিখ্যাত চিত্রকরের আঁকা দুর্বোধ্য শিল্পকর্মের মত মনে হতে লাগল। ডিশের কেবলটা নাড়াচাড়া দেব কিনা ভাবছি, তখনি নায়ক ডায়লগ দিল, 'আমি তোমাকে ভালবাসি'। কিন্তু সেটা হয়ে গেল 'আমি তোমাকে ভ্যা-অ্যা-লো-স্বা-সি।' রাগে আমার কান গরম হয়ে গেল। তুলুতুলুর দিকে তাকিয়ে চোঁচিয়ে উঠলাম, 'হারামজাদা, তুই চাস কী? আমার পেছনে লাগছিস ক্যান?' তুলুতুলু নিভাস্ত করুণ চোখে আমার দিকে চেয়ে রইল। তার চোখ থেকে পানি গড়িয়ে ঠিক নাকের নীচে তিলটোর উপর এসে স্থির হলো। আমার কী যে হলো, নিজের উপর সব নিয়ন্ত্রণ হারালাম। প্রচণ্ড ক্রোধে (আসলেই কী ক্রোধ?) রান্নাঘর থেকে ম্যাচ এনে একের পর এক কাঠি জ্বেলে গুয়ারের বাচ্চার গায়ে ছুঁড়ে দিলাম। সোফায় আঙুন ধরে গেল। বানচোতটাকে কোথাও দেখতে পেলাম না। কী হলো জানি না, আমি ছুটে গেলাম সেই আঙুনের দিকে। কিন্তু ঝাঁপিয়ে পড়ার আগেই নামায ফেলে মাহমুদা ছুটে এল। পানির জগ এনে ঢেলে দিল পুরোটাই। বিছানা থেকে কাঁথা এনে আঙুন চাপা দিল। তারপর গুরু করল শব্দ বর্ষণ। আমি অবশ্য নির্বিকার বসে ছিলাম।

শেষে মাহমুদা যখন বলল, 'থাক, হয়েছে। সিগারেট ধরাতে গিয়ে খুব কৃতিত্বের কাজ করেছে। এতে নাকের নীচে হাত বোলানোর মত কিছু হয়নি।'

তখন আমার নিজেকে জারজ বলেই মনে হচ্ছিল।

৭ মে

বাস, অফিস, বাসা।

রহস্যপত্রিকা

৮ মে

বাসা, বাস, অফিস, বাস, বাসা।

কিন্তু কেন? সবকিছু মিলে আসলে ঠিক মানেরটা কী দাঁড়ায়?

৯ মে

গত রাতে বহুদিন পর মাহমুদার শরীরে প্রবেশ করার চেষ্টা করে পারিনি। খোলা দরজার আশপাশে ঘুরঘুর করেছি। এ কী বয়সের দোষ, নাকি অন্যকিছু? নাকি বন্ধ দরজাই আমার কাছে খোলা বলে মনে হয়েছে? যতবারই ঢুকতে চেয়েছি, ততবারই মনে হয়েছে আমি যেন বেরিয়ে যাচ্ছি। বেরিয়ে যাবার ভয়েই কি ঢুকতে পারিনি? কিংবা বেরোবার কোনও পথ কি আদৌ আছে? স্বর্গে (যদি যাই) হ্রপরীর দেহে প্রবেশ করতে পারব কি? আচ্ছা, ওখানে গেলে হ্রপরী পাওয়া যাবে জেনেও জ্বীরা কেন চায় যে তাদের স্বামীরা বেহেশতে যাক? ইহকালে অন্য নারীর প্রেমে পড়লে মহিলারা সেটা মেনে নিতে পারে না। পরকালে হ্রপরী ধরিয়ে দিতে এত অগ্রহ কেন? হঠাৎ ভেবে দেখলাম, এই জীবন-ইহকাল ও পরকাল কেবল ঢোকাটুকিরই কারবার। তুচ্ছতাইতুচ্ছ থেকে শুরু করে বড় বড় কাজে আমরা কেবল ঢুকছি। সকালে বাসা থেকে বেরিয়েই বাসে ঢোকো, বাস থেকে নেমে অফিসে ঢোকো, অফিস থেকে আবার বাসায় ঢোকো, তালা খুলতে হলে তাতে চাবি ঢোকো, লজ্জা ঢাকতে হলে পোশাকের ভেতরে ঢোকো, ক্ষুধা লাগলে পেটে খাবার ঢোকো, সন্তান চাইলে নারীর শরীরে ঢোকো, নারীর প্রসব বেদনা উঠলে সন্তানকে পৃথিবীতে ঢোকো, সন্তানের ক্ষুধা লাগলে তার মুখে স্তন ঢোকো (একই স্তন পুরুষের মুখেও ঢোকানো হয়, এবং সেটাও ক্ষুধা মেটাতেই), মানুষ করতে হলে তাকে স্কুলে ঢোকো, মৃত্যুর পর কবরে ঢোকো। এই পৃথিবীতে প্রবেশ করার পর কেবল প্রবেশই করে যাচ্ছি। প্রবেশ করতে করতে কত স্তর নীচে চলে এসেছি জানি না। বেরোবার পথ রুদ্ধ বলেই মনে হচ্ছে। এ মহাবিশ্ব বোধহয় ওয়ান ওয়ে। আজ তুলুতুলুকে দেখিনি।

১৯ মে

প্রায় এগারো দিন পর আবার লিখতে

বসলাম।

গতকাল ঢুলুঢুলুকে নিয়ে এক হাস্যামা হয়ে গেছে।

অফিসে সাতদিন ব্যাপী ‘জনগণের সুস্বাস্থ্য: আমাদের করণীয়’ শিরোনামে একটি সেমিনার শুরু হয়েছে। সেমিনারে সূটেড-বুটেড হয়ে গিয়ে বসলাম এবং চা বিরতির সময় হঠাৎ লক্ষ করলাম, দর্শক সারির মাঝখানে হারামজাদা বসে আছে। ঢুলুঢুলু চোখে চেয়ে আছে আমারই দিকে। এই দৃষ্টি সে কোথায় পেয়েছে জানি না। ওই চোখে তাকালেই এক চরম বিতৃষ্ণা চলে আসে সবকিছুর প্রতি। যে চা এতক্ষণ গরম শরবত বলে মনে হচ্ছিল, এখন কাকরোলের রস মেশানো গরম পথ্য হয়ে গেল। সেমিনার শুরু হবার পর সে-ও অন্য সবার মত গভীর মনোযোগের সাথে বক্তৃতা শুনতে লাগল। ঘটনা ঘটল যখন ডিজিএম সাহেব মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে গাড়ির কালো ধোঁয়ার বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বলছিলেন। দূর থেকেও স্পষ্ট দেখলাম, ঢুলুঢুলুর ষোঁচা-ষোঁচা দাড়িতে ছাওয়া গালের হনু ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে। চোয়ালের হাড় হাপরের মত ওঠানামা করছে। ঠোঁটদুটো পরস্পরকে পিষে ধরেছে আজনাশ্রুতর মত। হঠাৎ স্প্রিং-এর মত লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। পা থেকে চটি খুলে ‘ওরে শালা’ বলে সজোরে ছুঁড়ে মারল ডিজিএম-এর মুখ বরাবর। আতঙ্কে নীল হয়ে গেলাম আমি। হারামজাদা আমাকে বোধহয় পথে বসিয়েই ছাড়ল। চিৎকার করার জন্য মুখ হাঁ করে হ্যাং হয়ে রইলাম। চটিজুতোটা ডিজিএম-এর মাথার উপর দিয়ে পেছনে দেয়ালে বাড়ি ঝেঁয়ে পড়ে গেল। দু’হাত মুষ্টিবদ্ধ করে হনহন করে বেরিয়ে গেল ঢুলুঢুলু। ডিজিএম কিছু টের পেলেন বলে মনে হলো না। তাঁরা বোধহয় যে কোনও মূল্যে নিজের অবস্থানে অনড় থাকতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। মুখে জুতোর বাড়ি ঝেঁয়ে যার কোনও প্রতিক্রিয়া হয় না, তার গ্যাজানি শোনার ইচ্ছে আমার আর রইল না। তবু যেহেতু আমি তার চাকরি করি, শেষ পর্যন্ত বসে রইলাম। অনুষ্ঠান শেষে সবার সাথে করমর্দন করে আমাদের ‘কিপটে ডিজু’ খ্যাত ডিজিএম তাঁর মাস্কাতা আমলের গাড়িতে একরশা কালো ধোঁয়া ছড়িয়ে বিদায়

নিলেন। বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি, তখন দেখি একটু দূরে ঢুলুঢুলুও দাঁড়িয়ে আছে। আমি উল্টোদিকে হাঁটা শুরু করলাম এবং হারামজাদাকেও পেছন পেছন আসতে দেখলাম। তার মধ্যে আগের সেই উদ্ধত ভাবটা নেই আর। খানিকটা কঁজো হয়ে গেছে। বোকারাম এক পায়ে চটি নিয়েই ঝুঁড়িয়ে হাঁটছে। একলাফে একটা লোকাল বাসের হাতল ধরে খুলে পড়লাম। এরপর আর তাকে দেখিনি। আজও নির্ধারিত পাতা শেষ। অথচ গত এগারো দিনের পাতা খালিই পড়ে রইল।

২০ মে

ব্যর্থ সঙ্গম চেষ্টা।

২১ মে

সারাদিন ঘুমোলাম। এত ঘুমোলাম কী কারণে! অবশ্য না ঘুমানোরও কোনও কারণ নেই।

২৩ মে

হঠাৎ উপলব্ধি করলাম, অনেক কিছু থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি। উল্টোটাও হতে পারে, অনেক কিছুই হয়তো আমার কাছ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে। সন্ধ্যার পর হাই তুলতে তুলতে টিভির চ্যানেল ঘোরাছিলাম। আধপোড়া সোফাটা মেরামত করা হয়নি আজও। কী ভেবে যেন তাতেই বসেছি। টেন স্পোর্টসে হঠাৎ ফুটবল খেলা দেখে চ্যানেল ভ্রমণ আপাতত স্থগিত করলাম। কোন দলের খেলা, কোন খেলোয়াড় খেলছে কিছুই জানি না। শুধু চিনলাম জার্সি। একদল সাদা অন্যদল কালো। যৌবনে খেলার খবর মুখস্থ থাকত। কোন দলের কী রঙের জার্সি, ক্যাপ্টেন কে, কে ক’টা গোলের মালিক, এমন কী কার জার্সি নাশ্বার কত সবই ঠোঁটস্থ ছিল। খবরের কাগজে খেলার পাতাটা আগে পড়তাম। এখন যদি আমাকে জিজ্ঞেস করা হয় বাংলাদেশ দলের ক্যাপ্টেন কে, বলতে পারব না। বর্তমান সিনেমার খবরাখবরও জানি না। জানি না কোন নায়ক নায়িকা বর্তমান তরুণ সমাজকে মাত করে রেখেছে। ভার্সিটিতে পড়ার সময় মধুমিতায় হেলেন অফ ট্রয় দেখেছিলাম। তাই নিয়ে পড়ে আছি আজও। যা হোক, খেলা

দেখতে লাগলাম। শৈশবে বাবা মাঝে-মাঝে কোলে করে গ্রামের মাঠে খেলা দেখতে নিয়ে যেতেন। তখন কয়েকটা গ্রাম মিলে টুর্নামেন্ট হত। তখনও খেলোয়াড় চিনতাম না। চিনতাম শুধু জার্সি। নিরপেক্ষ থাকতে না পারাটা মানুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য, কোনও না কোনও দল সে সাপোর্ট করবেই। যেহেতু খেলোয়াড় চিনতাম না, কাজেই রং সাপোর্ট করতাম আর সেটা ছিল সাদা। কালো ছিল চোখের বিষ। হতভম্ব হয়ে উপলব্ধি করলাম, আনমনেই আমি আজ কালো জার্সিকে সাপোর্ট দিচ্ছি। তারা আক্রমণে গেলেই হাততালি দিয়ে চিৎকার করে উঠছি। হঠাৎ পেনাল্টি পেয়ে একটা গোলও দিয়ে ফেলল তারা। পেনাল্টির গোলকে ঠিক অর্জন বলা যায় না। তবুও গোল তো! আনন্দে এত জোরে হাততালি দিয়ে উঠলাম যে, মাহমুদা একবার ভুরু কঁচকে উঁকি দিয়ে গেল। ভালই খেলছিল কালো। বাগড়া দিল ঢুলুঢুলু হারামজাদা। স্পষ্ট দেখলাম ১০ নম্বর সাদা জার্সি পরে সে মাঠে বলের পেছনে দৌড়ছে। দুর্বীর তার গতি। কালো দলের দশজন খেলোয়াড়ই তাকে ঘিরে আছে। তারই ফাঁক-ফোকর দিয়ে বল নিয়ে সে ছুটছে। কারও বগলের তলা দিয়ে, কারও পায়ের নীচ দিয়ে কঁচকি মেরে অবশেষে সে গোল দিয়েই ছাড়ল। পুরো মাঠ আনন্দে ভাসছে। ঢুলুঢুলু ফুর্টিতে তার সাদা জার্সি খুলে মাথার উপর ঘোরাতে লাগল। আমি টিভি বন্ধ করে দিলাম। যত্নসব গাঁজাখুরি। দশজনকে কাটিয়ে কেউ গোল দিতে পারে? সবাই কি ম্যারাডোনা নাকি?

২৪ মে

আরও একবার মাহমুদাতে প্রবেশের ব্যর্থ চেষ্টা।

২৫ মে

আজ সকালে উঠেই মনে হলো, অফিসে যাব না। কারণ জানি না। শুধু জানি যাওয়ারও কোনও কারণ নেই। যেতে ইচ্ছে করছে না—এর চেয়ে বড় কারণ আর কী হতে পারে? শো-কজ করা হবে? বেতন কাটা হবে? সেটা কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত। তারা তাদের জায়গায়

স্বাধীন, আমি আমার।

২৬ মে

আজ ছিল সেমিনারের দ্বিতীয় সেশন এবং ঢুলুঢুলু যথারীতি ঘোঁট পাকিয়েছে। জিএম সাহেব এইডস বিষয়ে সতর্কতামূলক বক্তব্য রাখছিলেন। অবৈধ শারীরিক সম্পর্ক থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানাতেই ‘ওরে ওয়ের’ বলে হংকার দিয়ে পায়ের দ্বিতীয় চটিও ছুঁড়ে মারে সে। নিশ্চয় নিশানা। জিএম সাহেবের কপালে সজোরে আঘাত করে মাটিতে পড়ে গেল সেটা। জিএম কিছুই টের পেলেন না। পাবার কথাও না অবশ্য। প্রতিদিনই আমরা সব কলিগ অসংখ্যবার তাঁর মুখে অদৃশ্য জুতো মারি। সেটা তিনি জানেনও। কী আসে যায়? বক্তৃতা শেষে জিএমের পার্সোনাল (ভেরি পার্সোনাল) সেক্রেটারি অর্পা তাঁকে ফুলের মালা দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। মিটিং শেষে জিএম অর্পাকে ন্যাড়ি পৌছে দেবার কথা বলে গাড়িতে তুলে নিলেন। ছুটির পর বাসের জন্য অপেক্ষারত অবস্থায় আবার ঢুলুঢুলুকে দেখলাম। সুরক্ষণ চোখে আমার দিকে চেয়ে আছে। একটু দুর্বল হয়ে গেছে বলে মনে হলো। তার নাকের নীচের তিলটা আরও ছোট হয়ে যেন কিছুটা অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। শরীরের টানটান ভাবটা নেই আর। খানিকটা কুঁজো হয়ে গেছে আর জড়িস রোগীর মত হলুদ চোখদুটো। এবারও আমি তাকে পথে রেখেই বাসে উঠে পড়লাম।

২৭ মে

অবসাদ। হতাশা। নিরুপায়। দুর্বলতা।

২৯ মে

আজ পুলিশ কমিশনার সেমিনারে নিমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন। যে কোনও সমস্যা ডিএমপি জনগণের পাশে আছে বলে দাবি করলেন তিনি। চুরি, ছিনতাই, চাঁদাবাজি যাই হোক না কেন, তৎক্ষণাৎ নিকটস্থ থানায় অভিযোগ করতে অনুরোধ জানিয়ে তিনি বললেন, গণমানবের মুক্তি নিশ্চিত করার ব্যাপারে দৃঢ় অঙ্গীকারবদ্ধ পুলিশ। ‘মুক্তি’ কথটা উচ্চারণ করা মাত্র একলাফে উঠে দাঁড়াল ঢুলুঢুলু।

আশপাশে তড়িৎ ভঙ্গিতে তাকিয়ে অস্ত্রই খুঁজল বোধহয়। না পেয়ে দুই টানে পাঞ্জাবিটা খুলে দলা পাকিয়ে ‘ওরে ...পুত’ বলে সজোরে ছুঁড়ে মারল। নিশানা হয়তো এবারও নিখুঁত ছিল। কিন্তু পাঞ্জাবি যেহেতু চটি নয়, কাজেই শিকার পর্যন্ত গেল না সেটা। মাঝপথেই মুখ থুবড়ে পড়ল। অর্ধনগ্ন অবস্থায় দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে বেরিয়ে গেল সে।

বাস স্টপে আবারও দেখা তার সাথে। খালি গায়ে দাঁড়িয়ে আছে জবুথবু হয়ে। বিস্মিত হয়ে দেখলাম, একদিনের মধ্যেই তার বয়স প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। ৫০% চুল-দাড়ি পেকে গেছে, আগের মসৃণ কপালে এখন সিঁড়ির অবয়ব, বুকের পাজর দাঁত বের করে হাসছে। শালার হাঁপানি হয়েছে বলেও মনে হলো। টেনে টেনে শ্বাস নিচ্ছে। নগ্ন দু’পা রক্তাক্ত। পাথরের উপর হেঁটেছে নাকি হারামজাদা? দু’পা এগিয়ে এসে কী যেন বলতে চাইল। আমি অবশ্য সুযোগ দিলাম না। বাসে উঠে পড়লাম। এ-ও বোধহয় কোনও কাকতালীয় যোগাযোগ। যখন সে আমাকে কিছু বলতে চায়, আমি বাস পেয়ে যাই।

৩০ মে

নষ্ট রাত।

৩১ মে

বার্থতা। অবসাদ। নষ্ট রাত।

১ জুন

নতুন কিছু না।

২ জুন

আজ সেমিনারে বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের একজন অধ্যাপক। দর্শন নিয়ে একসময় কিছু পড়াশোনা করেছি। কাজেই আগ্রহ বোধ করলাম। নিরাপত্তা বলতে শুধুমাত্র শারীরিক নয়, মানসিক নিরাপত্তাও বোঝায়, এ কারণেই তাঁকে ডাকা। দর্শনের উদ্দেশ্য মানুষকে জীবনের প্রতি ইতিবাচক করে তোলা, সঠিক জ্ঞানের সন্ধান দেয়া এবং মানব জীবনের সঠিক উদ্দেশ্য নিরূপণ করা—এসব

তার মূল বক্তব্য। এগুলোর পেছনে যুক্তি দেখাতে গিয়ে তিনি সফ্রেটিস, প্লেটো, ডেকার্টস, হিউম—এদের কথা বললেন। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, সাম্প্রতিক দর্শন নিয়ে কোনও কথাই বললেন না তিনি। নিটশে কিংবা সার্বের নামই উল্লেখ করলেন না। ঢুলুঢুলু যথারীতি উঠে দাঁড়াল, তবে এবার আর লাফিয়ে নয়, ধুঁকে ধুঁকে। নিজের প্যান্টটা খুলে ফেলল সে। দুর্বল হাতে সেটা ছুঁড়ে মারতে চেষ্টা করল। হাতঝানেক গিয়েই পড়ে গেল সেটা। জাসিয়া পরে ধুঁকতে ধুঁকতে বেরিয়ে গেল সে। বাস স্টপে যথারীতি বান্দা হাজির। গৌফ-দাড়ি আরও ঘন হয়ে উঠেছে। নাকের নীচে তিলটাকে ঢেকে ফেলেছে তারা। চুল-দাড়ি একটাও কাঁচা নেই আর। বুকের লোম এমন কী ডুরুও পেকে গেছে। আজও বাস পেলাম যথাসময়ে।

৩ জুন

আজ এক বীভৎস ব্যাপার ঘটেছে। লিখতে হাত কাঁপছে আমার। সেমিনারের শেষ দিন ছিল আজ। সমাপনী বক্তৃতা দেবার জন্য আমাকে অনুরোধ করা হয়েছে। সবার ধারণা আমার কষ্ট এবং বাচন ভঙ্গি ভাল। যা হোক, ডায়াসে গিয়ে উঠলাম। স্পষ্ট দেখলাম সেমিনার রুমের শেষমাথায় জাসিয়া পরে সে দাঁড়িয়ে আছে পক্ষাঘাতগ্রস্ত, রোগীর মত কাঁপছে সে। দাঁড়িয়ে থাকতে প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে। কপট গাষ্ট্রীর্ঘ ধারণ করে সামনের সারিগুলোতে হোমরা-চোমরারা বসে আছে। আমি কী বলব তারা জানে। আমি না হয়ে অন্য কেউ হলেও একই কথা বলত। আমিও জানি কী বলতে যাচ্ছি। তবু বলতে হবে। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে এই সেমিনারের উপকারিতা এবং আগত অতিথিদের মহামূল্যবান বক্তৃতার অকুণ্ঠ প্রশংসা সবে শুরু করেছি, তখনই একটি ছাইরঙা জাসিয়া মিসাইলের মত এসে আমার মুখে পড়ল। বহুদিনের অধোয়া, মলমূত্র, আর বীর্যের গন্ধ মাখা জাসিয়াটা যেন ডাক্তারদের

জীবাণুরোধক মাস্কের মতই আমার মুখে চেপে বসল। বহু কষ্টে সেটা মুখ থেকে সরিয়ে দেখলাম ঢুলুঢুলু নগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে ব্যর্থ আক্রোশে ফুঁসছে। ওই দুর্বল শরীরে এত আক্রোশ কোথেকে এল কে জানে। বজ্রতায় বলতে চাওয়া কথাগুলো বমি হয়ে বেরিয়ে এল হড়হড়িয়ে। কয়েকজন কলিগ এসে আমাকে ধরে সোফায় শুইয়ে ফেলল এবং হাওয়া দিতে লাগল।

বাস স্টপেজে এসে উলঙ্গ ঢুলুঢুলুর মুখোমুখি। ন্যাংটা পাগল ছাড়া আর কোনও নামেই তাকে এখন ডাকা যাবে না। দাঁত বের করা পাঁজরের ওপাশে হৃৎপিণ্ডের অনিয়মিত স্পন্দন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। ঠিকমত দাঁড়াতে পারছিল না সে। পা কাঁপছিল। চোখদুটোতে সেই ঢুলুঢুলু ভাব নেই আর। যক্ষ্মারোগীর মত উজ্জ্বল দুটি চোখ যেন কাতর মিনতি জানাচ্ছে। টালমাটাল পায়ে আমার দিকে এগোতে শুরু করল সে। আজ আর আমার কাক্ষিত বাস যথাসময়ে এল না। আতঙ্কে অস্থির হয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। কোনওদিকে আর তাকালাম না, কারণ ইতোমধ্যে বুঝতে পেরেছি ঢুলুঢুলুর অস্তিত্ব শুধু আমাকে ঘিরে, পৃথিবীর আর কোথাও সে নেই। পেছনে তাকিয়ে দেখলাম ধুঁকে ধুঁকে প্রাণপণে আমাকে অনুসরণ করছে সে। হনহনিয়ে হাঁটছি আমি। ধ্বংসস্মৃতির মত শরীর নিয়ে হোঁচট খেতে খেতে হাঁটবার তাল সামলাতে না পেরে তার পুরুষাঙ্গটা অগ্ৰকোষ সহ খসে পড়েছে উগুগু পিচের রাস্তায়। ক্রস্কেপ না করে আবারও হাঁটা শুরু করলাম। আবারও থ্যাপ। তবে এবারের থ্যাপটা আরও জোরাল। ডায়েরির আজকের দিনের পাতা আবারও শেষ। তবে আজ আর থামব না। পরের পাতায় যাচ্ছি। সে পাতার

তারিখটা কেটে দিচ্ছি। কারণ আজ যা হয়েছে তাকে কোনও সীমা দিয়ে বাঁধা যাবে না। তাকিয়ে দেখলাম শরীর থেকে চামড়া খসে পড়েছে তার। অস্থিমজ্জা-মাংস আর নাড়ি-ভুঁড়ি সহ দাঁড়িয়ে আছে এক জীবন্ত ফসিল। চামড়া ছাড়া মাংস কতক্ষণ? কাজেই প্রচণ্ড এক উচ্চারণ অযোগ্য শব্দ সহকারে মাংস আর অস্থি নাড়িভুঁড়ি সহ পড়ে গেল রাস্তায়। তবে মাংসের আড়ালে কোনও কংকাল দেখলাম না। কোনও কাঠামো নেই এই শরীরের। কীসের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল তা হলে সে? আশপাশে মানুষ চলাচল করছে যথারীতি, গাড়ির হর্ন বাজছে, কাক ডাকছে, সূর্য বীরবিক্রমে জ্বলজ্বল করছে আর এরই মাঝখানে পড়ে রইল এক ফসিলের ধ্বংসাবশেষ। দেখে বোঝার উপায় নেই এখন আর স্মৃতিপাকারে পড়ে থাকা ওটা কী বস্তু। হতে পারে মাংসপিণ্ডের স্মৃতি, হতে পারে হাতির শু, হতে পারে মরে পচে ফুলে ওঠা কোনও জন্তু। আর ক্রস্কেপ করলাম না। একটা খালি রিকশায় লাফিয়ে উঠে পড়লাম এবং তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নিলাম, এ পথে আর অফিসে যাওয়া যাবে না। ওই নাড়িভুঁড়ি কদ্দিন পথে পড়ে থাকবে কে জানে! ওসব ডিঙিয়ে পথ চলা সম্ভব নয় আমার। বিকল্প পথ ধরতে হবে। যদিও সেটা বেশ খানিকটা ঘুরপথ।

৯ জুন

আজ বহুদিন পর মাহমুদার শরীরে স্বচ্ছন্দে প্রবেশ করলাম।

আহ! কী সুখ!

পোড়া সোফাটাও বদলে ফেলেছি। গৌফ আবারও রেখে দেব ভেবেছি। নাকের নীচের কালো তিলটা চাঁদের কলঙ্কের মত মুখে লেগে আছে। কুণ্ঠসিত। গৌফ ছাড়া একেবারেই মানায় না আমাকে।

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

দিনাজপুরে সেবা প্রকাশনীর যে কোন বই-এর জন্য আসুন

বন্ধু পত্রিকা এজেন্সি

স্টেশন রোড, দিনাজপুর।

মোবাইল: ০১৯১৮-৫১০২৭৬

আগামী দিনগুলোতে টেলিভিশনেও ভাইরাসের হামলার আশংকা রয়েছে বলে
ইশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে।



‘পথিক আর পথ হারাইবে না’
“পথিক, তুমি পথ
হারাইয়াছ?” বঙ্কিম
চন্দ্রের নায়িকার মত এমন
প্রশ্ন করার অবকাশ হয়তো
আর পাবেন না ভবিষ্যতের
কোনও তরুণী। নির্জন
সাগরতীরই হোক বা
জনাকীর্ণ নগরই হোক না
কেন পথ হারানোর বিপদ
আর কখনোই দেখা দেবে
না। পথ হারানো তো
দূরের কথা ভুল পথে পা
বাড়ালেই সতর্ক করে
দেবে। ইয়া সতর্ক করার এ
ব্যবস্থা বসানো থাকবে
জুতোতে বা সুকতলাতে।
আর এর সঙ্গে ব্রুটুথের
মাধ্যমে যোগাযোগ থাকবে
স্মার্ট ফোনের ম্যাপের
সঙ্গে। গন্তব্যের দিকে ঠিক
করে না হাঁটলে, ভুল পথে
গেলে কিংবা ভুল দিকে
মোড় দিলে কম্পনের

মাধ্যমে ব্যবহারকারীকে
সতর্ক করে দেবে এ
জুতো। শুধু তাই না,
যাত্রাপথের আশপাশে
দর্শনীয় কিছু থাকলে তাও
মনে করিয়ে দেবে এই
জুতো বা সুকতলা। আর
এ জুতা তৈরি করেছেন
ক্রিসপিয়ান লরেন্স এবং
অনিরুদ্ধ শর্মা। এই জুতা
বা সুকতলা যাই কিনুন না
কেন সে জন্য দিতে হবে
১০০ ডলার।

টেলিভিশনে ভাইরাসের
হামলার আশংকা বাড়ছে।

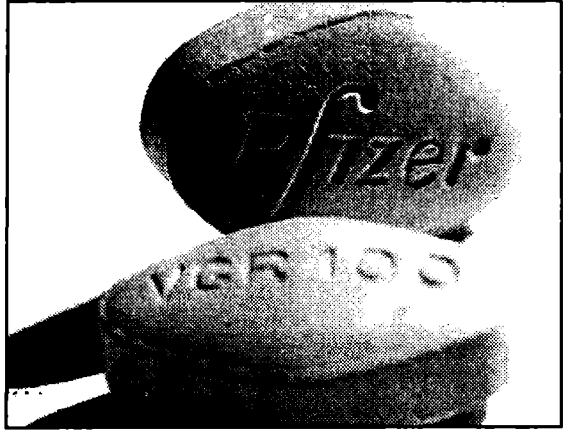
কম্পিউটার ব্যবহার
করেন কিন্তু
ভাইরাসের নাম শোনেননি
এমন ব্যক্তি বোধহয়
একজনও খুঁজে পাওয়া
যাবে না। কিন্তু আগামী
দিনগুলোতে টেলিভিশনেও
ভাইরাসের হামলার
আশংকা রয়েছে বলে
ইশিয়ারি উচ্চারণ করা
হয়েছে। আর এ ইশিয়ারি
উচ্চারণ করেছেন, বিশ্বের
চতুর্থ বৃহত্তম অ্যাষ্টি
ভাইরাস কোম্পানির সহ-
প্রতিষ্ঠাতা ইউজিন
ক্যাস্পারস্কি।
টেলিভিশনের সঙ্গে
ইন্টারনেটের সংযোগ
দেয়ার প্রবণতা ক্রমেই



বাড়ছে এবং এ কারণে
বাড়ছে ভাইরাসের হামলার
আশংকাও। তিনি আরও
বলেন, ক্যাস্পারাস্কির
মক্কো সদর দফতরে
প্রতিদিন সন্দেহভাজন
তৎপরতার ৩,১৫,০০০
প্রতিবেদন পেয়ে থাকে।
গত বছর থেকে এ সংখ্যা
দ্বিগুণ হয়েছে।
অবশ্য এ পর্যন্ত
টেলিভিশনের বিরুদ্ধে
কোনও ভাইরাস সফল
ভাবে হামলা করতে
পেরেছে বলে জানা নেই এ
কথা স্বীকার করেছেন
ইউজিন ক্যাস্পারাস্কি।
তিনি বলেন, ভবিষ্যতে
এ জাতীয় সফল হামলা
হবে।

**ভায়াগ্রা সেবনে প্রাণঘাতী
ত্বক ক্যান্সারের আশংকা
৮৪ শতাংশ বাড়়ে!**

সেলডেনাফিল সেবনে
মেলানোমা নামের



প্রাণঘাতী ত্বক ক্যান্সারের
আশংকা ৮৪ শতাংশ পর্যন্ত
বাড়়ে। অনেকেই ভাবছেন,
সেলডেনাফিল আবার কি?
ভায়াগ্রা নামে পরিচিত
ওষুধটির প্রধান উপাদানই
হলো সেনডেনাফিল।
এমনকি যে সব পুরুষ
একবারও সেনডেনাফিল বা
ভায়াগ্রা সেবন করেছেন
তাদেরও ক্যান্সারের
আশংকা দ্বিগুণ বাড়়তে
পারে বলে নতুন এক

সমীক্ষায় বলা হয়েছে।
আমেরিকা ও চীনের
২৬,০০০ মানুষের ওপর
চালানো সমীক্ষার ভিত্তিতে
এ দাবি করা হয়েছে।
আর ভায়াগ্রা নিয়ে এ
সমীক্ষার ফলাফল
প্রকাশিত হয়েছে মার্কিন
চিকিৎসা সাময়িকী
জামা'(জেএমএমএ)
তে।■

আমিল বতুল

আপনি কি হতাশ?

আর হতাশা নয়। নির্ভুল ভাগ্য গণনার মাধ্যমে নিজের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে
হলে স্বনামখ্যাত জ্যোতিষী কাজী সারওয়ার হোসেন পরিচালিত

“ভাগ্যচক্র”তে আসুন।

৩৪৫, সেগুনবাগিচা (চতুর্থ তলা)

(ভিসন অ্যাডভারটাইজিং সংলগ্ন)

শনি থেকে বৃহস্পতিবার: বিকেল ৫.৩০-৭.৩০

ফোন: ৮৩২২৭০৬, ৮৩৫২১৬৭ (আপয়েন্টমেন্টের জন্য)

ফিওদর মিখাইলভিচ দস্তয়ভস্কি, শুধু রাশিয়ার নন, আমাদের সবার!

কামরুন নাহার নিরু

জুয়ার নেশায় বঁদ হয়ে ছিলেন দস্তয়ভস্কি। একেদিন গায়ের
কোটসুদ্ধ খুলে দিয়ে আসতে হত তাঁকে।

সাহিত্যের পাঠক মাত্রই ফিওদর
মিখাইলভিচ দস্তয়ভস্কিকে চেনেন।
রুশ এ সাহিত্যিক, তাঁর কীর্তির বলেই
নিজেকে অমর করে রেখেছেন সারা পৃথিবীর
হাজারো পাঠকের কাছে। তাঁর জীবন কাহিনি
কোন উপন্যাসের চেয়ে কোন অংশেই কম
রোমাঞ্চকর নয়। আজ রইল তারই এক
ঝলক।

দস্তয়ভস্কি জন্মগ্রহণ করেন ১৮২১ সালে
রাশিয়ার মস্কোতে। ভাইবোনদের মধ্যে তিনি
ছিলেন পিতামাতার দ্বিতীয় সন্তান। বাবা
মিখাইল দস্তয়ভস্কি ছিলেন পেশায় চিকিৎসক,
আর মা মারিয়া দস্তয়ভস্কি গৃহিণী।

দস্তয়ভস্কির শৈশবটা খুব আনন্দমুখর
ছিল, এমনটা বলা যায় না। কৈশোরে তাঁকে
পড়াশোনার জন্য যেতে হয় এক বোর্ডিং স্কুলে।
সেখানে বছর তিনেকের মত পড়াশোনা করেন
তিনি। তাঁর মা, মারিয়া দস্তয়ভস্কি যক্ষ্মায়
আক্রান্ত হয়ে মারা যান ১৮৩৭ সালের ২৭
সেপ্টেম্বর, তখন দস্তয়ভস্কির বয়স মাত্র
পনেরো। মায়ের মৃত্যু, তাঁর বাবার জীবনে বড়
ধরনের পরিবর্তন নিয়ে আসে। তিনি সিদ্ধান্ত
নিলেন, শহরে আর জীবনযাপন করবেন না।
তাই হাসপাতালের চাকরি ছেড়ে দিয়ে
সপরিবারে শহরে পরিমণ্ডল থেকে দূরে,
পাকাপোত্তাভাবেই গ্রামে বসবাস শুরু করলেন।
দস্তয়ভস্কি আর তাঁর বড় ভাইকে ভর্তি
করে দেয়া হলো মিলিটারি এঞ্জিনিয়ারিং
ইন্সটিটিউটে।

কিন্তু গ্রামে গিয়ে বাবা মিখাইল দস্তয়ভস্কি
প্রতিবেশীদের সাথে নানান ঝামেলায় জড়িয়ে



পড়লেন। বলা হয়, তাঁর অত্যাচারে
প্রতিবেশীরা অতিষ্ঠ ছিল! তাদের মধ্যে ক্ষোভ
দানা বেঁধে উঠলে, কোচোয়ানের সাথে পরামর্শ
করে একদিন নির্জনে নিয়ে গিয়ে তাঁকে খুন
করা হয়! বাবার মৃত্যুতে দস্তয়ভস্কি
মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। কোন কারণ
ছাড়াই পিতার মৃত্যুর জন্য তিনি নিজেকে দায়ী
করা শুরু করেন। সম্ভবত এসময়ই তাঁর প্রথম
মৃগীরোগ দেখা দেয়, পরবর্তী জীবনে তিনি
আর কোনদিনও এ রোগ থেকে মুক্তি পাননি।

এঞ্জিনিয়ারিং অ্যাকাডেমী থেকে পাশ
করার পর সামরিক বিভাগে ডিজাইনারের
চাকরি নেন দস্তয়ভস্কি। এসময় তিনি জুয়ার
নেশায় জড়িয়ে পড়েন। অধিকাংশ দিনই তাঁকে
নিজের সবটুকু সম্বল খুইয়ে নিজের ডেরায়
ফিরে আসতে হত। মাইনের টাকা ফুরিয়ে যেত
দুদিনেই। কিছু অর্থ উপার্জনের তাগিদেই তিনি

ঠিক করলেন ফরাসী এবং জার্মান সাহিত্য অনুবাদ করবেন। তিনি এবং তাঁর বড় ভাই মিখাইল, ফরাসী সাহিত্যিক বালজাকের উপন্যাস অনুবাদ আরম্ভ করলেন। ১৮৪৪ সালে সেটি একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়া শুরু করলে, হাতে কিছু কাঁচা পয়সা পেলেন দস্তয়ভস্কি।

সাহিত্যের নেশায় পেয়ে বসল তাঁকে, চাকরি অসহ্য লাগতে শুরু করল। শেষমেশ, ১৮৪৪ সালেই চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে সম্পূর্ণরূপে সাহিত্য সাধনায় মনোনিবেশ করলেন।

তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাসের নাম, 'Poor Folk' যেটি প্রকাশিত হয় ১৮৪৬ সালে। এরপর তিনি বেশ কিছু ছোটগল্প লেখেন। তবে সেগুলো খুব একটা পাঠকপ্রিয়তা পায়নি। তারপর প্রকাশিত হলো তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস, 'The Double'।

প্রথম উপন্যাসে তিনি লেখক হিসেবে পরিচিতি পেয়েছিলেন, দ্বিতীয়টি এনে দিল খ্যাতি। তাঁর লেখনীতে ফুটে উঠেছিল মানুষের বেদনাময় জীবনের প্রতিচ্ছবি। তাই পাঠকেরা সহজেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হলো। সমাজের শিল্পী-সাহিত্যিক এবং সমালোচকদের দ্বারা তাঁর জন্য উন্মুক্ত হলো। এসময় দস্তয়ভস্কির জীবনে নেমে এল এক ভয়ঙ্কর বিপর্যয়। রাশিয়ার সম্রাট জার প্রথম নিকোলাস ছিলেন এক অত্যাচারী শাসক। তাঁর শাসনের বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্নস্থানে পড়ে উঠেছিল কিছু ছোট ছোট বিপ্লবী সংগঠন। এক বন্ধুর মারফতে দস্তয়ভস্কিও জড়িয়ে পড়লেন এমন এক সংগঠনের সাথে। কিন্তু সেটা সহজেই নজরে পড়ে গেল জারের গোয়েন্দাবাহিনীর। রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ১৮৪৯ সালের এপ্রিলে গ্রেফতার করা হলো দস্তয়ভস্কিকে। অন্য অনেকের সাথে তাঁকে বন্দি করে রাখা হলো আলা-বাতাসহীন ছোট্ট একটি কুঠুরিতে। দিনে মাত্র দু'একবারের জন্য বাইরে বেরুতে দেয়া হত তাঁদেরকে। এই দুঃসহ মানসিক অবস্থার মধ্যেই তিনি রচনা করেন একটি ছোটগল্প 'A Little Hero'। এটাই তাঁর কারাবন্দি জীবনের একমাত্র

উল্লেখযোগ্য রচনা।

গ্রহসনের বিচারে দস্তয়ভস্কিকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলো! চূড়ান্ত অনুমতির জন্য রায়ের কপি পাঠিয়ে দেয়া হলো সম্রাট নিকোলাসের কাছে। তবে এক্ষেত্রে দস্তয়ভস্কির কপাল ভাল, সম্রাট তাঁর মৃত্যুদণ্ড রদ করলেন। তবে বিনিময়ে তাঁকে চার বছরের জন্য সাইবেরিয়ায় নির্বাসন এবং পরবর্তীতে আরও চার বছর সৈনিকের জীবনযাপনের আদেশ দেয়া হলো।

ক্রিসমাস ডে-তে, পায়ে চার সের ওজনের লোহার শিকল পরিয়ে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলো সাইবেরিয়ার বন্দিনিবাসে। সেখানে একগাদা খুনে বদমায়েশের সঙ্গে একা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতই বসবাস করতে লাগলেন দস্তয়ভস্কি। ছোট্ট অক্ষকার প্রকোষ্ঠে, সাইবেরিয়ার অসহ্য ঠাণ্ডায় নরক দর্শন করতে হলো তাঁকে। ছাদের ফুটো দিয়ে বরফ ঝরে পড়ে মেঝেতে পুরু হয়ে জমে যায়, সেই তীব্র ঠাণ্ডায় হাত-পা ফেটে গিয়ে রক্ত ঝরতে থাকে। এরই মাঝে প্রতিটা দিন করতে হয় হাড়ভাঙা খাটনি। সে এক মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা। তাঁর এই অভিজ্ঞতার কথা পরবর্তীকালে (১৮৬২) তিনি জুলভ অক্ষরে লিখে গিয়েছেন তাঁর 'The House Of The Dead' উপন্যাসে।

দীর্ঘ চার বছর নরকে কাটানোর পর, অবশেষে তাঁকে মুক্তি দেয়া হয় ১৮৫৪ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি। তারপর সামরিক জীবন কাটানোর জন্য তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় সেমিপালতিনস্ক শহরে। রুগ্ন-শীর্ণ শরীরে সামরিক জীবনের কঠোর নিয়মকানুন তাঁর জন্য অসহনীয় হয়ে ওঠে। এমনিতেই তিনি ছিলেন কৃশকায়, উচ্চতা ছিল মাত্র ৫ ফুট ৩ ইঞ্চির মত। কিন্তু নিজের যোগ্যতায় কিছুদিনের মধ্যেই তিনি সামরিক বাহিনীর উঁচু পদে উঠে গিয়েছিলেন।

এই সময় শহরের প্রধান সেনানায়ক জানতে পারলেন, তাঁর সেনাবাহিনীতে একজন শিক্ষিত লেখক আছেন। তিনি দস্তয়ভস্কিকে ডেকে পাঠালেন। তারপর থেকে প্রতিদিন দস্তয়ভস্কিকে তাঁর বাড়িতে গিয়ে খবরের কাগজ পড়ে শোনাতে হত!

এখানেই একদিন দস্তয়ভস্কির সাথে

পরিচয় হয় এক মদ্যপ সরকারী কর্মচারি আলেকজাণ্ডার ইসায়েভ এবং তাঁর সুন্দরী তরুণী স্ত্রী মারিয়া দিমিত্রিয়েভনার সাথে। মারিয়াকে ভালবেসে ফেলেন দস্তয়ভস্কি। কিন্তু আচমকা ইসায়েভ বদলি হয়ে যায় চার'শ মাইল দূরের এক শহরে। মারিয়ার বিচ্ছেদে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন দস্তয়ভস্কি।

কিন্তু বিধাতা এক্ষেত্রে দস্তয়ভস্কির প্রতি সদয় হলেন। কয়েকমাসের মধ্যেই খবর আসে, মারা গেছে ইসায়েভ। বছরখানেকের মধ্যেই দস্তয়ভস্কি ছুটে যান মারিয়ার কাছে। কিন্তু গিয়ে এক ভীষণরকম ধাক্কা খেতে হলো তাঁকে। মারিয়া ততদিনে এক স্কুল শিক্ষকের প্রেমে পড়েছে! অনেক অনুনয়-বিনয় করে মারিয়ার মত পরিবর্তন করতে সক্ষম হলেন দস্তয়ভস্কি। ১৮৫৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে তাঁদের বিয়ে হয়।

নিজের বন্দিজীবনের মেয়াদ শেষ হলে, সামরিক বাহিনীতে ইস্তফা দেন দস্তয়ভস্কি। সপরিবারে এসে বসবাস শুরু করেন মস্কোর কাছাকাছি টিভর শহরে।

এখানেই তিনি লেখেন 'The House Of The Dead' উপন্যাসটি। কিন্তু কে প্রকাশ করবে এক অখ্যাত তরুণের লেখা? তাই বড়ভাই মিখাইলের সঙ্গে মিলিতভাবে প্রকাশ করলেন একটি পত্রিকা, নাম দিলেন 'সময়'। এতেই প্রকাশিত হলো উপন্যাসটি।

প্রকাশের সাথে সাথে দস্তয়ভস্কির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। সাইবেরিয়ার বন্দি জীবনের ভয়াবহতা ইতিপূর্বে কোন লেখকের লেখাতেই এমন মূর্ত হয়ে ওঠেনি। খ্যাতির সঙ্গে-সঙ্গে অর্থও আসতে শুরু করল। কিন্তু মারিয়ার বিলাসবহুল জীবন যাপনের সঙ্গে তাল মেলাতে ব্যর্থ হলেন দস্তয়ভস্কি।

১৮৬৩ সালে দস্তয়ভস্কির জীবনে প্রেমিকা হিসেবে আবির্ভূত হলো পলিনা সাল্লাভা। এক প্রাণোচ্ছল সুন্দরী তরুণী। কিন্তু পলিনাকে বেশি সময়ের জন্য কাছে পেলেন না দস্তয়ভস্কি, এক পুরুষে মন ভরে না তাঁর। বিচ্ছেদ ঘটে গেল দ্রুতই, ততদিনে অর্থও ফুরিয়ে এসেছে দস্তয়ভস্কির। জুয়ার নেশায় বৃন্দ হয়ে ছিলেন দস্তয়ভস্কি। একেদিন গায়ের কোটসুদ্ধ খুলে

দিয়ে আসতে হত তাঁকে। কোনদিন যদিও বা জিততেন, পরদিনই আবার তার বহুগুণ হেরে আসতেন। তাঁর এই জুয়াড়ী জীবনের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়েই পরবর্তীতে ১৮৬৭ সালে তিনি লিখেছিলেন 'The Gambler'।

এর মধ্যেই ১৮৬৪ সালে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তাঁর স্ত্রী মারিয়া। তাঁর সেবা-যত্নের কোন ক্রটিই করেননি দস্তয়ভস্কি। কিন্তু সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে এপ্রিলেই মারা যান মারিয়া। স্ত্রীর মৃত্যুর মাত্র তিনমাসের মধ্যে মারা যান তাঁর বড় ভাই মিখাইল।

এতে ভীষণভাবে মুষড়ে পড়লেন দস্তয়ভস্কি। তাঁর জীবনের অনেকখানি জুড়ে ছিলেন বড় ভাই মিখাইল।

এই দুঃখ নিয়েই রচনা করলেন তাঁর অনন্য সাধারণ একটি উপন্যাস, 'Crime And Punishment'। বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে যে কটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস আছে, এটি তার একটি। এই উপন্যাসটি রচনার পিছনে যখন দস্তয়ভস্কির সমস্ত একাগ্রতাটুকু কাজ করছিল, তখন অন্যান্য প্রকাশকদের সঙ্গে চুক্তিমত নতুন উপন্যাস জমা দেবার দিনক্ষণও এগিয়ে আসছিল। হাতে মাত্র দু'মাস সময়, কোন কলকিনারাই পাচ্ছিলেন না দস্তয়ভস্কি। এমন সময় তাঁর একজন বন্ধু পরামর্শ দিলেন একজন স্টেনোগ্রাফার রাখতে। শুধু পরামর্শ দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না, নিজের চেনাজানা একজন মেয়েকে পাঠিয়েও দিলেন।

কুড়ি বছরের সাদামাঠা চেহারার অ্যানা স্নিটকিন এসে দাঁড়াল দস্তয়ভস্কির দোরগোড়ায়। অ্যানার সাহায্যেই দস্তয়ভস্কি শেষ করেছিলেন তাঁর জুয়াড়ী নামে উপন্যাসটি। এই উপন্যাসের জুয়াড়ী আর কেউ নন, দস্তয়ভস্কি স্বয়ং।

দস্তয়ভস্কির মনে হতে লাগল, মারিয়া আর পলিনা তাঁকে যে সুখ দিতে পারেনি তা হয়তো দিতে পারবে অ্যানা! তাই সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বসলেন তাকে। তখন দস্তয়ভস্কির বয়স ৪৫, অ্যানার ২০।

সবার বিরোধিতা সত্ত্বেও, ১৮৬৭ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি তাঁদের বিয়ে হয়ে গেল! এসময় দেনার দায়ে রীতিমত ডুবে ছিলেন দস্তয়ভস্কি।

তাকে দেনা থেকে মুক্ত করতে আনাকে নিজের অনেক মূল্যবান সামগ্রী বিক্রি করে দিতে হলো! এই টাকা দিয়েই তাঁরা ১৮৬৭ সালের ১৪ এপ্রিল, খানিকটা বিলম্বিত এক হানিমুনে জার্মানি গেলেন!

ঘুরে বেড়াতে লাগলেন এক দেশ থেকে আরেক দেশে। দারিদ্র্য তাঁদের নিত্য সঙ্গী। এর মধ্যেই অবশ্য বেশ কয়েকটি উপন্যাস রচনা করেছিলেন দস্তয়ভস্কি। দেখতে-দেখতে চারটা বছর কেটে গেল, অথচ হানিমুনে বেরিয়েছিলেন মাত্র তিন মাসের জন্য!

ঘরে ফেরার জন্য অস্থির হয়ে উঠলেন দস্তয়ভস্কি। কিন্তু ফিরবেনই বা কেমন করে? পকেট তো শূন্য। হাতের শেষ সম্বলটুকুও খুইয়ে এসেছেন জুয়ার টেবিলে। এই বিপদের দিনে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেন তাঁর এক বন্ধু। তাঁর কাছ থেকে অর্থ সাহায্য পেয়েই ১৮৭১ সালে দীর্ঘ চার বছর পর সপরিবারে সেন্ট পিটার্সবার্গে ফিরে আসেন দস্তয়ভস্কি। আর্থিক সঙ্কট থেকে পুরোপুরি মুক্তি না পেলেও, তাঁর মনজুড়ে তখন চলছিল মহতী কিছু সৃষ্টির তাড়না। দীর্ঘ চার বছর লেখার পর ১৮৮০ সালে প্রকাশিত হলো, 'The Brothers Karamazov'। এ এক মহাকাব্যিক উপন্যাস। ব্যাপ্তিতে, গভীরতায়, চরিত্র রূপায়নের বিচারে, এটিও তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

সমস্ত দেশজুড়ে তিনি পেলেন এক অভূতপূর্ব শ্রদ্ধা আর ভালবাসা। তাঁকে বলা হলো জাতির প্রবক্তা। ক্রমশই তাঁর শরীর ভেঙে পড়ছিল। শেষমেশ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

১৮৮১ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি, চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন এই মনীষী। তাঁর শবযাত্রায় প্রায়

এক লক্ষ লোক সামিল হয়েছিল।

তাঁর জীবদ্দশায় তিনি প্রায় ১১ টি উপন্যাস, ৩টি উপন্যাসিকা এবং ১৭ টি ছোটগল্প লিখে গেছেন।

নরওয়ার্ডের ঔপন্যাসিক Knut Hamsun, দস্তয়ভস্কি সম্পর্কে বলেন, 'No one has analysed the complicated human structure as Dostoyevsky. His psychologic sense is overwhelming and visionary.'

দস্তয়ভস্কির উল্লেখযোগ্য রচনা সমূহ:

*Crime And Punishment (1866)

*The Brothers Karamazov (1880)

* Notes From Underground (1864)

*The Idiot (1869)

*Demons (1872)

*The Gambler (1867)

*The Eternal Husband (1870)

* The Double (1846)

* The Adolescent (1875)

* White Nights (1848)

* The House Of The Dead (1862)

* Poor Folk (1846)

* A Little Hero (1849)

* The Land Lady (1847)

* Uncle's Dream (1859)

* The Possessed

* The Grand Inquisitor

* The Insulted And Humiliated

শাওন বই ঘর

প্রোঃ শাহীন শেখর

বি. এ কলেজ রোড, সিরাজগঞ্জ।

সিরাজগঞ্জ জেলা শহরে একমাত্র পরিবেশক

সেবা প্রকাশনার নতুন ও পুরাতন বই পাওয়া যায়।

মোবাইল: ০১৭১০৭২০৪৮০, ০১৬৭০৭৮৭৮৫১, ০১৯১২৯৪৫৯৯৭

পিতার পত্র, পুত্রকে আসমার ওসমান

জানা যায়-দু'টি কিডনীই নষ্ট হয়ে গেছে তার। নতুন কিডনী না
লাগালে বাঁচানো যাবে না বড় ভাইকে।

জগতের এই আনন্দযজ্ঞে

বাপু আমার,
বড়দিনের উৎসবের রাতে নাকি একটা খালি মোজা বুলিয়ে রাখতে হয়, আর তাতে নাকি
গভীর রাতে বুড়ো সান্তা ক্লজ এসে রেখে যায় দারুণ সব উপহার! গত বড়দিনে তুই এতই
ছোট ছিলি যে এটা বোঝার বয়স হয়নি তোর। না হলে বাপু-ব্যাটা মিলে এক্সপেরিমেন্ট-টা করে
দেখা যেত! যা হোক, সামনের বার হবে না হয়!

তবে কী, বাপু, তুই নিজেও জানিস যে এমনটা হয় না। হতে পারে না। বড়জোর বাড়ির
ছোটদের মন ভরাতে বড়রাই লুকিয়ে লুকিয়ে ওই মোজায় উপহার ভরে রাখতে পারে। কিন্তু তাতে
কি ওই গল্পের আবেদন কমে গেছে এতটুকু! উঁহঁ, কমেনি। কারণ, জীবন এত বিচিত্র রকম সুন্দর
এবং এতটাই অভাবনীয় ও অযাচিত উপহারের পসরা সাজিয়ে বসে থাকে যে সেই তুলনায় মোজায়
সান্তা ক্লজের উপহার রেখে যাবার গল্পটি মোটেও অস্বাভাবিক নয়।

একটা গল্প শোনাই তোকে।

আমেরিকার অ্যালাবামা রাজ্যের গল্প।

অ্যালাবামায় থাকত এক কৃষ্ণাঙ্গ পরিবার। মধ্যবিত্ত, কিন্তু সুখী। বাবা-মা আর দুই ছেলে নিয়ে
সাজানো সংসার।

মায়ের ভারি শখ একটা মেয়ের।

সংসারের বাকিরাও মায়ের এই শখে সংগত দেয়। চারজন মিলে তারা হাজির হয়
এতিমখানায়। একটা মেয়ে চাই তাদের। এতিমখানার লোক খুঁজে-পেতে একটা ছবি বের করে
দেখাল। তিনবছর বয়সী ভারি ফুটফুটে একটা মেয়ে তাকিয়ে আছে ছবির বুক জুড়ে। এতিমখানার
লোক জানাল এই মেয়েটা ছাড়া আর কোনও মেয়ে ওই মুহূর্তে পালক নেবার মত নেই।

কোন অসুবিধা নেই।

ওই মেয়েটিকেই ভারি মনে ধরেছে চারজনের। এক কথায় সবাই রাজি।

বাবা-মা তো বটেই, খুশি আট আর ছ'বছর বয়সী দুই ভাই-ও। বাবা-মা খুশি-মেয়ে আসছে
ঘর জুড়ে-এই আনন্দে; আর ভাইদের খুশি-এতদিন তাদের কোন বোন ছিল না, এবার তাদেরও
একটা বোন হবে-এই ভেবে।

এরপর?

পাঁচজনের হাসি-খুশি-সুখী এক সংসার।

একে একে কেটে যায় তেইশটি বছর।

ততদিনে বড় ভাইয়ের বিয়ে হয়ে গেছে; তার সংসারে এসেছে দুই বাচ্চা। ছোট ভাই আর
বানের তখনও বিয়ে হয়নি।

এমন এক সময়ে অসুখে পড়ে বড় ভাই।

চিকিৎসা হয় অনেক-কিন্তু উপশম ঘটে না।

জানা যায়-দু'টি কিডনীই নষ্ট হয়ে গেছে তার। নতুন কিডনী না লাগালে বাঁচানো যাবে না বড় ভাইকে।

খোঁজ পড়ল কিডনীর।

আত্মীয়-স্বজন সবার কিডনী পরীক্ষা করা হলো। নাহ, বৃথা সন্ধান। পাওয়া গেল না কিডনী। বড় ভাইয়ের সাথে ম্যাচ করল না কারও কিডনী।

এর মাঝেই জন্মদিন পালন করা হলো বড় ভাইয়ের।

সবাই জন্মদিনের আয়োজনে মুখে হাসি ঝুলিয়ে রাখল বটে, কিন্তু বুকে ধরে রইল তীব্র বেদনা-কারণ সবাই নিশ্চিত সামনের জন্মদিন আসবে ঠিকই, কিন্তু তখন আর দুনিয়ায় থাকবে না মানুষটি।

কিডনী পাবার আশা বাড়ির সবাই প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল। কারণ, নিকটাত্মীয় ছাড়া অন্য কারও সাথে কিডনী ম্যাচ করবার সম্ভাবনা অতি ক্ষীণ। সম্ভাব্য সব নিকটাত্মীয়ের কিডনী পরীক্ষা করা হয়েছে; তাদের কারও সাথেই যখন মেলেনি-তখন বাইরের কারও সাথে মিলবার সম্ভাবনা তো আরও কম। তা ছাড়া বড় ভাইয়ের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটছে, সময় ফুরিয়ে আসছে দ্রুত।

এমনই সময়, কী মনে করে কিডনী পরীক্ষা করা হলো ওই পালিত বোনের।

আর কী আশ্চর্য, রূপকথার গল্পের মত এই দফা কিডনী ম্যাচ করে গেল!

রক্তের সম্পর্ক নেই তাতে কী, সব মিলে গেল একদম ঠিকঠাক!

হাসিমুখে বোন তার দু'টি কিডনীর একটি দিয়ে দিল অসুস্থ বড় ভাইকে।

বাস্, তারপর দিব্যি সুস্থ বড় ভাই-যার প্রাণের আশা সবাই প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল।

বড় ভাই সুস্থ হলে, বাড়ির সবাই মিলে একটা গ্রুপ ছবি তুলিয়ে বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে দেয়ালে।

ছবিতে দেখা যাচ্ছে-কী এক আশ্চর্য খুশিতে ঝলমল করছে সবার মুখ।

বাস্, আমার গল্প এখানেই ফুরাল।

নটে গাছটিও মুড়াল।

বাপ্ আমার, তুই নির্ঘাত আমাকে জিজ্ঞেস করবি-গল্পটা ভারি মিষ্টি সত্যি; কিন্তু এমন গল্প তো আমাদের অনেকের জীবনেই ঘটছে। যেখন থেকে আমরা কিছুই আশা করি না সেখান থেকেই অযাচিতভাবে পেয়ে যাই জীবনের আশ্চর্য সব সুখ সঞ্চয়। তা হলে, এই গল্পে নতুনত্ব কী?

হ্যাঁ, একদম ঠিক ধরেছিস তুই।

এই গল্পে কোন নতুনত্ব নেই।

জীবনের চিরন্তন গল্পই এটি।

এই গল্পটা বললাম তোকে শুধু এই কথাটুকু মনে করিয়ে দিতে যে-শেষ বিচারে জীবনটা ভারি সুন্দর। নানান অসঙ্গতি আর বেদনা আছে বটে; কিন্তু এই জীবনটাই যে কোথায় কোন্ কোণে লুকিয়ে রাখে অভাবিত সব সুন্দর -সেই স্বর কেউ জানে না। হঠাৎ হঠাৎ ওই খুশিতে ভরে যায় আমাদের জীবন। প্রাবিত করে জমে থাকা সব বেদনাকে।

তোর চলার পথ জুড়ে থাকুক এমন সব আশ্চর্য সুন্দর!

ইতি-

তোর বাপ্

পুনশ্চ: তোর মা-কে জিজ্ঞেস করে দেখিস যে বিয়ে-টিয়ে করবার বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না আমার। হয়তো চিরকুমারই থাকতে হত আমাকে-যদি না দেখা পেতাম তোর মার। আশ্চর্য রকম সরল-শ্রেমময় এবং দায়িত্বশীল তোর মার সাথে আমার পরিচয় এবং প্রণয় তো আকস্মিকই বটে! আর তোর মা না থাকলে আমার জগৎ আলো করে তুই-ই বা আসতিস কোথেকে? কখনও ভেবেছিলাম-যে, এত সুখীও হব আমি?

ভাষা বিষয়ক ফেব্রুনা-ক্যাসাদ

বাপ্ আমার, যখন তুই কৈশোরে পা দিবি-তখন কি তোর মুখের ভাষা বুঝব আমি?

না, বোঝা মানে আক্ষরিক বোঝা নয়। ভাষা যখন তোর বাংলা-ই হবে, বড়জোর ইংরেজি থাকবে তাতে-তখন সে কথা

বোঝবার মত এলেম আশা করি আমার থাকবে। আমি ভাবছি-ভাষাটার ভেতরটা বুঝব কিনা, কিংবা তোর শব্দ-ব্যবহারের ভেতরের অর্থটা কি বুঝব আমি?

জেনারেশান-গ্যাপ বা প্রজন্ম-ফারাক বলে যে কথাটা চালু আছে, সেই ফারাকের বড় একটা উপকরণ হলো ভাষার ব্যবহার।

যেমন, ইদানীংকালে একটা টেলিভিশন-বিজ্ঞাপনে দেখা যায় যে এক কিশোর তার বন্ধুকে ফোন করে সঘোষন করছে 'মামা' বলে; ওদিকে কিশোরের মা টেলিফোনের আলাপ শুনে মনে করছেন যে তাঁর সন্তান 'সত্যিকারের মামা'র সাথে কথা বলছে!

ফারাকটা তৈরি হয় এভাবেই।

সন্তানের ভাষা বোঝে না বাবা-মা।

কিংবা বাবা-মার ভাষা বোঝে না সন্তান। শব্দগুলো হয়তো চেনাই থাকে, কিন্তু বদলে যায় তার ব্যবহার। কিংবা বদল ঘটে তার অর্থের।

নতুন প্রজন্মের ভাষার এই পরিবর্তন অনেকে মেনে নিতে চান না। এই নিয়ে দুই প্রজন্মের মাঝে বাধে নীরব ফেটনা-ফ্যাসাদ। কখনও এই নিয়ে গুঠে তর্কের ঝড়। কয়েক বছর আগে আমাদের এই দেশের একটি মোবাইল ফোন কোম্পানি তরুণ প্রজন্মকে লক্ষ্য করে একটা বিশেষ বিজ্ঞাপন প্রচারণা হাতে নিয়ে তর্কের ঝড় তোলে। তারা তাদের বিজ্ঞাপনে শব্দের নব ব্যবহার আরম্ভ করে। যেমন-'কঠিন ভাব', 'জটিল', 'ফাটাফাটি', 'কঠিন মুড'-ইত্যাদি। শব্দগুলো যে নতুন এমন নয় কিন্তু তরুণ প্রজন্মের মাঝে শব্দগুলোর ভিন্নরকম ব্যবহারে পুরানো প্রজন্মের মানুষেরা অস্বস্তিতে পড়েন। তাদের মাঝে 'গেল গেল' রব ওঠে। শুধু পুরানো প্রজন্ম নয়, নতুন প্রজন্মেরও যারা ভাষার ঐতিহ্য রক্ষা করতে

চায়-তারাও সরব হয়, প্রতিবাদ করে।

ঠিক ওই সময়ের আশপাশেই মুস্তফা সরওয়ার ফারুকী-এক তরুণ ফিল্ম নির্মাতা-টিভি নাটকে, 'যাচ্ছে', 'করেছে', 'খেয়েছে'র বদলে 'যাইতেছে', 'করতেছে', 'খাইছে'-ইত্যাদির বহুল ব্যবহার করে রীতিমত হৈ-ঠে ফেলে দেন। শহুরে চরিত্র যখন টিভি পর্দায় ওই ভাষায় কথা বলা আরম্ভ করে তখন বিষয়টি সহ্য হতে চায়নি অনেকেই।

কিন্তু এ-ও সত্য যে, সহ্য হোক বা না হোক-ওই রকম ভাষা এবং তদসংলগ্ন কিছু আবরণ (হেয়ার জেল মাখানো খাড়া চুল, ঢোলা প্যান্ট ইত্যাদি) একটা প্রজন্মের একটা বড় অংশের তরুণের জীবনাচরণ হয়ে দাঁড়ায়। 'সংস্কৃতি ধ্বংস হয়ে গেল'-বলে হাহাকার করে ওঠেন অনেকে।

মাঝে অনেকগুলো বছর কেটে গেছে।

কিন্তু হাহাকার, তর্ক-বিতর্ক চলছে এখনও।

তবে, আমার কথা কী, বাপ-পণ্য বিক্রির জন্য পুঁজিবাদের নানান ফন্দিফিকিরের হাজারটা নেতিবাচক দিক আছে সত্যি-কিন্তু, একথা আমি বিশ্বাস করতে নারাজ যে ওই রকম ভাষার আবিষ্কার করেছিল ওই সেল ফোন কোম্পানি। গতটা হলো যে অমন একটা ভাষা, অমন একটা সংস্কৃতি-আমাদের উচ্চবিত্ত তরুণদের একটা অংশের মধ্যে চালুই ছিল। ওই ফোন কোম্পানি কায়দা করে অতি আত্মসী মার্কেটিং-এর মাধ্যমে ওই ভাষাকে, ওই সংস্কৃতিকে সাধারণের মধ্যে জনপ্রিয় করে তোলে। বিশাল এক তরুণ প্রজন্ম ওই কোম্পানির সিম কার্ড ব্যবহার করার পাশাপাশি অমন ভাষায় কথা বলাও আরম্ভ করে।

সংস্কৃতির কি ক্ষতি হচ্ছে এই ভাষা

আল আমিন বুক সাপ্লাই

প্রোঃ মোঃ আলী আকবর

সেবা প্রকাশনী ও প্রজাপতি প্রকাশনের নতুন-পুরানো সব বই এবং রহস্যপত্রিকা সরবরাহ করা হয়।

মোবাইল: ০১৯২৩৭০২৪৫১, ০১৯২৭১১২৪৮০

ব্যবহারে?

বাপ্ আমার, একটা কথা তোকে সাফ জানিয়ে রাখি যে-সময় একটা বড্ড জটিল বিষয়। এই ‘সময়’ যদি এক সময় তোকে-আমাকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় তখনও যেমন কিছু বলার থাকবে না, তেমনি সময়ের সাথে সাথে কিছু পরিবর্তন ঘটবেই। খুব বিখ্যাত একটা উপমা আছে-উট পাখি নাকি মরুঝড়ের সময় বালিতে মুখ গুঁজে থাকে আর ভাবে যে ঝড় হচ্ছে না! তেমনই-আমরা যা-ই ভাবি না কেন, কিছু পরিবর্তন ঘটবেই।

ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন ঘটবে।

ঘটছে।

যে কোন তরুণের লেখা এস.এম.এস দেখে প্রথমে পড়তেই পারবেন না অনেকে। তারা ‘See You’ কে লেখে ‘c u,’ ‘lots of laugh’ কে লেখে ‘lol,’ অথবা ‘The’ কে লেখে ‘d’। শুধু ভাষার সংক্ষিপ্ত এমন রূপ নয়, তাদের বলবার ধরনও সম্পূর্ণ আলাদা-অন্তত কেতাবী কথোপকথনের তুলনায়।

এটা ভাল কি মন্দ, সেটি বলবার দায়িত্ব আমি নেব না। আমি মনে করি, তেমন কোন সরল উত্তর নেই-ও। ভাষা নিয়ে এমন কারবার চলেছে চিরকাল, চলবেও।

তবে হ্যাঁ, যে ভাষাটা বেশিরভাগ লোক বোঝে, সেটা ঠিকমত শিখে নেয়া দরকার। তাই ব্যাকরণ জানা, বোঝা, চর্চাটাও জরুরি। তবে, তারচে’ও জরুরি হলো যে পরিবর্তন আর বৈচিত্র্যের সৌন্দর্য-কে ধরবার মত শ্বাস নেবার জায়গাটা খালি রাখা। নিয়মকানুনের জালে সবকিছুকে সবসময় আটকে রাখাটা সুস্থতার চর্চা নয়।

বাপ্, তুই কি ‘সিলেটি’ আর ‘চাটগাইয়া’ কথা গুনেছিস কখনও? আমি বাজি ধরে বলতে পারি-ওনারের বলা অনেক কথাই বুঝি না তুই। কিংবা তোর নানাবাড়ি মানে পুরানো ঢাকার মানুষের কথাও কিন্তু ঢাকার বাকি অংশের মত নয়, যদিও তার নাম-ঢাকাইয়া। এখন, এই যে স্থানভেদে ভাষার চর্চা-সেটি কি নিন্দনীয়? মোটেও না। বরঞ্চ এই বিচিত্র

শ্রোতশ্রী ভাষা আমাদের দেশের এক ঐতিহ্যই বটে-যা সমৃদ্ধিরও প্রতীক। একটা বোধগম্য লিখিত ভাষা শিখতে হবে সবাইকে; কিন্তু যদি ওই ‘সিলেটি’ ‘চাটগাইয়া,’ কিংবা ‘ঢাকাইয়া’ ভাষা হুবহু উঠে আসে নাটক, চলচ্চিত্র, গান কিংবা সাহিত্যের ভাষায়-সেটা হবে আমাদের জন্য এক বাড়তি পাওয়া। যদি ওগুলো বুঝতে অসুবিধা হয়, তবে ওইটুকু শিখে নিলে-লাভ হবে দর্শক, শ্রোতা কিংবা পাঠকেরই। এখনও আমাদের মূলধারায় এমন সৃষ্টি খুব কম। আমি বিশ্বাস করি-তুই যখন বড় হবি তখন এই চর্চা আরও বেগবান হবে। নিশ্চয় প্রসার ঘটবে আদিবাসী ভাষার গান আর সাহিত্যের।

আজকাল যে ‘গ্লোবলাইজেশন’ বা ‘বিশ্বায়ন’-এর কথা বলা হয়-তার সবচে’ বড় নেতিবাচক দিক, আমার মতে-সবকিছুকে একটা ছকের মধ্যে নিয়ে আসবার চেষ্টা। ভাষার এই বিচিত্রতা, বিশ্বায়নের ওই নেতিবাচক দিকটাকে রুখতেও প্রয়োজন হবে বৈকি।

এই জগতে ফ্রব সত্য বলে বিষয়টাই যেখানে ধোঁয়াটে, সেখানে ভাষা-ব্যবহার-এর পরিবর্তনটা মেনে নিতেই হবে।

হ্যাঁ, আমি জানি যে, পরিবর্তন অনেক সময়ই মানুষের মন খারাপ করায়। কিন্তু তাকে স্বাগত জানানোটাই ভাল। ক’বছর আগে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ থেকে যখন চিরতরে বিলুপ্ত ঘোষণা করা হলো টেলিগ্রাফ, তখন আমি জানি-অনেকেরই স্মৃতিকাতরতা তাদের ব্যথিত করে। এই যে মন কেমন করা, স্মৃতিকাতর হওয়া-এগুলো যেমন মনুষ্যত্বেরই লক্ষণ, তেমনি পরিবর্তনকে মেনে নেওয়াটা প্লুগতিরই লক্ষণ।

বাপ্ আমার, শেষ পর্যন্ত আমার চাওয়া একটাই। আমি চাই-তুই এমন একটা দুনিয়ায় বড় হ, যেখানে সব জানালাই খোলা থাকে। শত জানালার মাঝে একটাও যেন বন্ধ না থাকে।

ইতি-

তোর বাপ্

মরিচ কাহিনি

বাপু আমার,

জন্মের পর থেকে টানা ছ'মাস তুই শুধুমাত্র মা'র বুকের দুধ খেয়েই ছিলি। এটাই করা উচিত। তোর কপাল ভাল যে তোর মা তোকে অমন করে দুধ খাইয়েছে। সব বাচ্চাকে (বলা ভাল বেশিরভাগ বাচ্চাকেই) ওভাবে দুধ খাওয়ানো হয় না। অনেক লোক এখনও জানে না, আবার অনেকে জানলেও মানে না। নিয়মটা হচ্ছে-জন্মের পর থেকে বাচ্চার ছ'মাস বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত সে শুধুমাত্র মা'র বুকের দুধ খাবে। অন্য আর কিছু নয়, এমনকী এক ফোঁটা পানিও নয়।

যা হোক, ছ'মাস পর থেকে তুই অন্য খাবার ধরলি। পাতলা খিচুড়ি খাওয়ানো হত তোকে। মশলা দেয়া হত খুব কম।

যখন বয়স বছরখানেক হলো তোর, তখন থেকে তোর তরকারিতেও বড়দের মত করেই যোগ হতে লাগল ঝাল-মসলা।

আর ঝালের জন্য মরিচের বিকল্প কী!

প্রথম প্রথম একটু ঝালের ছোঁয়া পেলেই চিৎকার-চোঁচামেচি শুরু করতিস তুই। যতটা না ঝাল, তারচে' বেশি তোর মুখভঙ্গি, চিৎকার। চিৎকার করে বলতিস, 'ঝাল, ঝাল,' আর তার পরপরই ঠোঁটজোড়া গোল করে ফুঁ দেবার মত করে ঝাল কমাবার নাটক করতিস। সে এক মজার দৃশ্য ছিল বটে!

মরিচের জন্য এখন থেকে বহুদূরে-সেই যুক্তরাষ্ট্রে। ন'হাজার বছরের আগে থেকে ওই অঞ্চলে মরিচ চাষ করবার খবর পাওয়া যায়। ক্রিস্টোফার কলম্বাস আমেরিকা থেকে ইউরোপে নিয়ে আসেন মরিচ। সেখান থেকে ব্যবসায়ীদের হাত ঘুরে মরিচ পৌছে যায় এশিয়া আর আফ্রিকায়।

মরিচ মানেই কিন্তু ঝাল নয়। কোনটায় কান দিয়ে ধোঁয়া বেরোনোর মত ঝাল, কোনটায় সামান্য ঝাল, কোনটা আবার প্রায় মিষ্টি। দেখতেও হরেক রকম হয় মরিচ। কোনটা লম্বা, কোনটা গোল, কোনটা ছোট, কোনটা বা বড়। রঙ-ও হয় নানা রকম। সবুজ, লাল তো বটেই-এমন কী সাদা রঙের মরিচও আছে।

কোন মরিচের ঝাল বেশি, কোনটায় কম-সেটি পরিমাপের একটা একক আছে। এককটির নাম 'স্কেভিল'। স্কেভিল বেশি মানে ঝাল বেশি, আর স্কেভিল কম মানে ঝাল কম। সবচে' তীব্র ঝালের মরিচ হচ্ছে 'হাকনেরো,' যেটি আমাদের দেশে 'বোম্বাইয়া মরিচ' নামে চেনে লোকে। এই বোম্বাইয়া মরিচে আবার জাতভেদে স্কেভিল থাকে এক থেকে সাড়ে তিন লক্ষ। আর আমাদের চেনা যে সবুজ কাঁচা মরিচ তার এক-একটায় থাকে আড়াই থেকে পাঁচ হাজার স্কেভিল।

ঝাল কম-বেশি শুধু নয়, কোন মরিচ মুখের কোথায় ঝালের জ্বালা ধরাবে তাতেও রয়েছে ভিন্নতা। বোম্বাইয়া মরিচে যদি কামড় বসাস্ তুই, তবে সেই ঝাল তোকে আক্রমণ করবে গলায়। আর সবুজ কাঁচা মরিচ ঝাল ধরাবে জিভের আগায়।

মরিচের ঝাল আসে কোথেকে?

মরিচের ঠিক কোন জায়গাটায় থাকে ঝাল? মরিচের বীজে থাকে 'ক্যাপসাইসিন' নামে একটি পদার্থ-ওইটেই ঝালের জন্য দায়ী। তাই, মরিচের বীজগুলোতে কামড় পড়লেই সবচে' বেশি ঝাল লাগে।

ঝালমরিচ চাষের জন্য চাই গরম আবহাওয়া। তাই, এশিয়া আর আফ্রিকার মরিচ ঝালের জন্য বিখ্যাত। তবে দুনিয়ার সবচে' ঝাল মরিচ মেলে আমেরিকার নিউ মেক্সিকো অঞ্চলে।

বাপু আমার, কমলা লেবুর ভক্ত তুই একদম ছোটবয়স থেকেই। তোকে একটা খবর জানিয়ে রাখি, যে একটি বড় ঝালবিহীন মরিচে একটি কমলালেবুর চে' পাঁচ থেকে ছ'গুণ বেশি ভিটামিন 'সি' থাকে!

অতিপ্রাচীন সভ্যতা মায়া। খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০সাল থেকেই ওই সভ্যতার সূচনা। মায়ারা দাঁত ব্যথা উপশমে মরিচের ঝালকে কাজে লাগাত। আধুনিক বিজ্ঞানীরা বলছেনও যে মরিচ খাবার পরপর 'এনডোরফিন' নামে শরীরে ব্যথা নিরাময়ক যে উপাদানটি থাকে-সেটি শরীরের নানান প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে ব্যথা উপশম করতেও পারে। তবে তোকে সাবধান করে দিই এই বলে যে দাঁতে ব্যথা

হলে ডাক্তার দেখানোই ভাল। যখন চিকিৎসা বিজ্ঞান অত অগ্রসর হয়নি তখন হয়তো ওই ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি প্রয়োজনীয়ই ছিল, কিন্তু এ যুগে ওই সব টোটকা ব্যবহারের কোন মানে হয় না।

আচ্ছা, যদি খুব ঝাল লেগেই যায়, তা হলে কী করবি তখন? না, ঢকঢক করে গ্যাসের পর গ্যাস পানি না গিলে যদি হাতের কাছে হাতরুটি বা পাউরুটি থাকে—তা হলে এক টুকরো রুটি চিবিয়ে ঝাল উপশম করা সম্ভব। বরফের একটা টুকরো মুখে নিয়ে চুষলেও দিব্যি কাজ দেবে। সবশেষে তোকে শিখিয়ে দিই একটু ঝাল—একটু মিষ্টি সুইট চিলি সস তৈরির কায়দা। সাদা ভিনিগার বা সিরকা নিবি এক কাপের চারভাগের এক ভাগ। তারপর ওই কাপের বাকিটুকু পানি দিয়ে পূর্ণ করে নে। এই মিশ্রণ চুলায় দে, তাতে মিশিয়ে দে আধ কাপ চিনি। আঁচ দিতে থাক। দু'কোয়া রসুন মিহি করে কেটে নে। আর কুচি করে কেটে নে চার থেকে ছটা লাল মরিচ (শুকনো মরিচ নয় কিন্তু, পাকা লাল মরিচ)। এখন সিরকার ওই মিশ্রণে রসুন আর মরিচ ছেড়ে দিয়ে জ্বাল দিতে হবে ভাল করে। আধ চামচ লবণ দিয়ে দিস ওতে। তিন-চার মিনিট পর রসুন নরম হয়ে গিয়ে সুগন্ধ ছড়াতে থাকলে দু' টেবিল চামচ কর্ন ফ্লাওয়ার ওই মিশ্রণে ছেড়ে দিয়ে ভাল করে নাড়তে হবে। ঘন হলে নামিয়ে ফেলতে হবে। ব্যস্, তৈরি হয়ে গেল সুইট চিলি সস! সস কৌটায় ভরে ফ্রিজে রাখলে অনেক দিন ভাল থাকবে।

শিখে গেলি রান্না।

এখন বড় হ।

তারপর বাপ্-ব্যাটা মিলে রান্না করব, আর খাব! কেমন?

ইতি—

তোর বাপ্

পুনঃ সুইট চিলি সস তৈরির কৌশলটা জেনেছি তোর রুমানা বৈশাখী ফুপির কাছ থেকে। তোর এই ফুপি ভয়ঙ্কর-ভয়ঙ্কর সব ভূতের গল্প লেখে আর ইন্টারনেটে প্রিয় ডট কম নামের একটা ওয়েবসাইটের লাইফ পাঠায় মজার মজার সব রান্নার খবর ছাপায়! ■

রহস্যপত্রিকা



গোয়েন্দা ঝাকানাকার একগাদা নতুন গল্প নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে

গোয়েন্দা ঝাকানাকা ও এক ডজন রহস্য।

মোবাইলে অর্ডার দিতে চাইলে কল দিন ০১৮১৯৮১৮৩৮৫ নাম্বারে, কুরিয়ারে বই চলে যাবে আপনার বাড়ি।

গোয়েন্দা ঝাকানাকার আগামী গল্পের জন্যে চোখ রাখুন রহস্য পত্রিকার পাতায়, আর নতুন বইয়ের খোঁজ রাখতে চোখ রাখুন গোয়েন্দা ঝাকানাকার ফেসবুক পাতায়:

www.facebook.com/goyenda.jhakanaka

সুড়ঙ্গ খুঁড়ে খানমণ্ডি থেকে কেন বান্দরবান যেতে চায় দস্যু বদরু খাঁ? ব্যাণ্ডের ড্রামার ড্রামান দিষ্টাকে কেন বদরুর হাতে মার খেতে হলো? মাশয়েশিয়ার নিখোঁজ বিমান কি ভাবে বদরুই ছিনতাই করেছে?

জানতে হলে পড়তে হবে গোয়েন্দা ঝাকানাকা।

মাম্পস অর্কাইটিস

ডা. মোঃ ফজলুল কবির পাভেল

দু'টি অণুকোষই যদি আক্রান্ত হয় তা হলে
বক্ষ্যাত্ত্ব হবার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়।

মাম্পস অসুখের জটিলতা হিসেবে দেখা
দেয় অর্কাইটিস। অর্কাইটিস মানে
অণুকোষ বা টেসটিসে প্রদাহ।
অণুকোষে প্রদাহ হলে রোগী ব্যথায় বেশ কষ্ট
পান। মাম্পস অর্কাইটিসের প্রকোপ বর্তমানে
অনেক কমে গেছে। ভ্যাকসিন দেবার ফলে
মাম্পসের প্রকোপ অনেক কমে গেছে, যার
ফলে মাম্পস অর্কাইটিসও কমে এসেছে। কিন্তু
EPI শিডিউলে মাম্পসের ভ্যাকসিন দেওয়া
হয় না। এজন্য মাম্পস অর্কাইটিসের রোগী
পাওয়া যায়।

মাম্পস একটি ভাইরাস ঘটিত সংক্রামক
রোগ। মাম্পসে প্যারোটাইড গ্রন্থি ফুলে যায়
এবং ব্যথা হয়। মাম্পস ভাইরাস RNA
ভাইরাস এবং প্যারোমিস্কোভাইরাস গ্রুপের।
মাম্পস ভাইরাস হাঁচি, কাশির মাধ্যমে একজন
থেকে অন্যজনে ছড়ায়। ১০ বছরের নীচে
যাদের মাম্পস হয় তাদের সাধারণত অণুকোষে
প্রদাহ হয় না। কিন্তু বয়ঃসন্ধির পরে এবং
পূর্ণবয়স্কদের মাম্পস হলে অণুকোষে প্রদাহ
হবার সম্ভাবনা বেশি থাকে। এই প্রদাহ একটি
বা দু'টি অণুকোষেই হয়। প্যারোটাইড গ্রন্থির
প্রদাহের ১-২ সপ্তাহ পরে অণুকোষের প্রদাহ
শুরু হয়।

মাম্পসের ফলে টেসটিস বা অণুকোষের



যে প্রদাহ হয় তার ফলে টেসটিস ছোট হয়ে
যায়। তবে এ থেকে বক্ষ্যাত্ত্ব হবার সম্ভাবনা খুব
কম। কারণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে একটি
অণুকোষ আক্রান্ত হয়। তবে দু'টি অণুকোষই
যদি আক্রান্ত হয় তা হলে বক্ষ্যাত্ত্ব হবার
সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়।

মাম্পস অর্কাইটিসের কোন সুনির্দিষ্ট
চিকিৎসা নেই। বিশ্রাম, অণুথলিকে সাপোর্ট
দেয়া এবং ব্যথানাশক ওষুধ দেয়া হয়। অনেক
সময় অ্যান্টিবায়োটিক দেয়া হয়, কারণ
পাশাপাশি ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণও থাকে।
মাম্পস অর্কাইটিসে স্টেরয়েড ব্যবহার করা
হয়। স্টেরয়েড ব্যবহার করলে ফোলা ও ব্যথা
কমে যায়। তবে স্টেরয়েডের ব্যবহার নিয়ে
বিতর্ক আছে।

মাম্পস অর্কাইটিসের রোগী প্রায়ই পাওয়া
যায়। তবে যেহেতু এ থেকে বক্ষ্যাত্ত্ব হবার
সম্ভাবনা থাকে, তাই অবশ্যই একজন
চিকিৎসকের কাছে যাওয়া উচিত। অবহেলা
করলে পরিণতি খারাপ হতে পারে। মাম্পস-
এর ভ্যাকসিন পাওয়া যায়। ভ্যাকসিন নিলে
মাম্পসের হাত থেকে নিরাপদে থাকা যায়।
আর মাম্পস না হলে মাম্পস অর্কাইটিসও হবে
না।

শব্দ-ফাঁদ ৯৩

রবীন্দ্র

১	২	৩		৪	৫	৬	
৭				৮			৯
১০			১১			১২	
			১৩		১৪		
	১৫	১৬			১৭	১৮	
১৯				২০			
২১							২২
				২৩			

সমাধানের সূত্রাবলী

পাশাপাশি

- বিশ্বাস বা আস্থা নষ্ট হয় এমন কাজ বা আচরণ।
- জানানো, বিজ্ঞাপন, নিবেদন।
- যানবাহনের গতিরোধের জন্য সংকেত-বাতি।
- পদপিষ্ট, চরণমর্দিত।
- দুধ বা দুধজাত পদার্থের উপরের আবরণ, সরার জন্য অনুজ্ঞা।
- মাথার টাক, টেকো।
- নবনী, ননি।
- অক্ষকার, চোখের ছানিরোগ।
- পুত্র, ছেলে।
- নোংরা, কুটিল, অপবিত্র।
- খোঁজখবর, সংবাদ বিনিময়।
- রক্ত পড়া, ক্ষত থেকে রক্ত বের হওয়া।

উপর-নীচ

- বিজ্ঞপ্তি, জানানোর জন্য ঘোষণা বা লেখন।
- যার পা কুকুরের মত, হিংস্র জন্তু।
- দলিল, উপাধিপত্র।
- রসাতল, পাতাল।
- যন্ত্র, ফাঁদ, কৌশল।
- খোঁজ, অন্বেষণ।
- ভর্ৎসনা, গালি, ধমক।
- লেখা, অক্ষরবিন্যাস, চিঠি।
- তাক, উন্মুক্ত, জ্বালাতন।
- মানুষ, নর।
- দাতব্য, ভিক্ষা।
- মিশ্রণ, মিল, ঘোর।
- সেই সময়ে, সেকালে, তবে।

- সংবাদ, সন্ধান, বৃত্তান্ত।
- বিধৌত, স্নান করেছে এমন।

সমাধান পাঠাবার ঠিকানা: শব্দ-ফাঁদ ৯৩, রহস্যপত্রিকা, ২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০। যাদের সমাধান নির্ভুল বিবেচিত হবে, তাদের ভিতর থেকে লটারির মাধ্যমে তিনজনকে নির্বাচন করে পুরস্কার হিসেবে তাদের প্রত্যেকের ঠিকানায় ডাকযোগে পাঠিয়ে দেয়া হবে পরবর্তী তিন সংখ্যা রহস্যপত্রিকা। সমাধান আমাদের দপ্তরে এসে পৌঁছবার সর্বশেষ তারিখ: ১২ জুন, '১৪।

সমাধান শব্দ-ফাঁদ ৯২

ঔ	প	নি	বে	শি	ক		এ
দ	র	মা	হা		র	জ	ক
রি	পু		গ		তা	মা	ক
ক	রু	ক		গ	ল	দা	
	ষ	ড	ভু	জ		র	সা
আ		ম	ব	ল	গ		ক্ষ
দা	ব	ডা	ন		গ	ত	র
ব	উ	নি		মা	ন	ব	তা

শব্দ-ফাঁদ ৯২-তে
যাঁরা পুরস্কারের জন্য
নির্বাচিত হয়েছেন

- মৌলী
আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা।
- তানজিনা রহমান নিপা
কুমারপাড়া, সিলেট।
- কাজী সাখাওয়াৎ হোসেন
নিরালা আ/এ, খুলনা।

নিয়তি

সঞ্জয় দেবনাথ

আরে,
২০১৪ সাল
তো
কেবল
গুরু
হলো।
এর
আবার
সালতামামি
কী?



লোকটি এ এলাকায় নতুন। বোধহয় আজই প্রথম এসেছে। অত্যন্ত কুশ্রী চেহারা। একগাদা বই নিয়ে ফুটপাথের পাশে বসে আছে। আজ এখানে বসেছে, দু'দিন পরে হয়তো অন্যখানে বসবে। এদের কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। বলা চলে ভ্রাম্যমাণ হকার। অল্প দামের বেশ কিছু বই সে বেশ সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছে। একের ভিতর তিন, ছোটদের বাল্যশিক্ষা-এই টাইপের বই-ই বেশি। অল্প কিছু গল্পের বই, উপন্যাসও আছে।

ভ্রাম্যমাণ হকারদের প্রচুর কথা বলতে হয়। কথা বলতে না পারলে তাদের ব্যবসা জমজমাট হয় না। তবে কেন জানি, কুশ্রী চেহারার নাম না জানা এ ভ্রাম্যমাণ হকারটি দার্শনিকের ভাব নিয়ে বসে আছে। ডান হাতটি গালের সাথে লেপ্টে আছে। হকারের বয়স বেশি না, ২০ বা ২৫-এর মাঝামাঝি হবে। গালে হাত দিয়ে বসা নাকি ভাল না। এমনটি করলে বউ বা শাওড়ি মারা যায়-এ জাতীয় কথা অশীতিপূর বৃদ্ধরা বলে থাকেন। এ ভাষাটা বোধহয় ভ্রাম্যমাণ হকারটি জানে না। অবশ্য গালে হাত দিয়ে বসাতে বেশ লাগছে। আইনস্টাইন-আইনস্টাইন ভাব চলে এসেছে। গালে হাত দিয়ে বসলে শুধু আইনস্টাইনকেই মানাবে এমন কোন কথা নেই। ভ্রাম্যমাণ হকাররা কখনও গালে হাত দিয়ে বসে না। এ লোকটি বসেছে। এটা একটা অতি তুচ্ছ এবং দুর্লভ দৃশ্য। ঢাকা শহরে দুর্লভ দৃশ্য কমে যাচ্ছে। সবকিছুই এখন সুলভ হয়ে গেছে। নিউইয়র্ক শহরের মত। নেশাট পরে কেউ হেঁটে গেলেও আশপাশের কেউ চোখ বড় করে না। কিংবা এ-ও হতে পারে, অনিয়মের শহরে সবকিছুই এখন স্বাভাবিক লাগে।

শরিফুল হক পেশায় একজন পানের দোকানি। মতিঝিলে তার নিজস্ব দোকান আছে। বেচা-বিক্রি বেশ ভাল। সে এ ড্রামামাণ হকারের দোকানে এসেছে দু'একটি শিশুতোষ বই কেনার জন্য। তার চার বছরের একটি শিশু সন্তান আছে। সামনের বছরেই স্কুলে ভর্তি করে দেবে। তার আগে বইয়ের সাথে কিছু জানাশোনা হওয়ার জন্যই সে ড্রামামাণ বইয়ের দোকানে এসেছে। ড্রামামাণ হকারের সাথে কথা বলে শরিফুল হকের বেশ ভাল লাগল। কুশী চেহারার মানুষের ব্যবহার ভাল হয়—এটাই প্রচলিত। ড্রামামাণ হকারের ব্যবহার অত্যন্ত অমায়িক। ভাল ব্যবহারের জন্য নোবেল পুরস্কার দেয়া হলে এ ড্রামামাণ হকার ওই পুরস্কার নিশ্চয়ই পেত। শরিফুল হকের মন ভাল হয়ে গেল। সে বেশ খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে বই দেখতে লাগল। বিক্রেতার ব্যবহার ভাল হলে জিনিস কিনতে ইচ্ছা না থাকলেও মন কিছু কেনার জন্য খচখচ করে। শরিফুল হক পাঁচটি শিশুতোষ বই কিনল। হঠাৎ একটি বইয়ের প্রতি চোখ আটকে গেল শরিফুল হকের। বইয়ের নাম দেখে শরিফুল হকের চক্ষু যেন চড়ক গাছ হয়ে গেল। বইয়ের নাম 'সালতামামি-২০১৪'। আরে, ২০১৪ সাল তো কেবল শুরু হলো। এর আবার সালতামামি কী? ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনার সংকলনই তো হলো সালতামামি। ২০১৪ সাল তো সবে শুরু হলো, এর সালতামামি বের করা যাবে ২০১৫ সালে। শরিফুল হক ভাবল হয়তো নামে ভুল হয়েছে। তবুও মনে যখন একটু সন্দেহ ঢুকেছে তখন শরিফুল হক বইটা হাতে নিল বেশ আগ্রহ নিয়ে। এটাই মানব মনের ধর্ম। মনে কোনো কিছু ধাক্কা দিলে সে বিষয়ে আগ্রহ বেড়ে যায়। একবার শরিফুল হক তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে প্যাণ্টের চেইন না লাগিয়েই বাইরে বের হয়েছিল। এক দুই ব্যক্তি এ বিষয়ে ইঙ্গিত করে বলেছিল, 'ভাইজান, আজ তো শুক্রবার। সরকারি ছুটির দিন। আপনার পোস্ট অফিস খোলা রাখছেন কেন?' এ কথা শুনে শরিফুল হক বেশ

লজ্জা পেয়ে প্যাণ্টের চেইন লাগায়। এ ঘটনটি শরিফুল হকের মনকে তীব্রভাবে ধাক্কা দেয়। এখন তো শরিফুল হক বের হওয়ার আগে অন্তত ৫০ বার চেক করে প্যাণ্টের চেইন লাগিয়েছে কিনা। মাঝেমধ্যে রাস্তায় বের হলেও অবচেতন ভাবে হাত দিয়ে চেক করে প্যাণ্টের চেইন লাগিয়েছে কিনা। এটাই মানব মনের সহজাত ধর্ম।

শরিফুল হক 'সালতামামি-২০১৪' বইটা দেখে যতটা অবাক হয়েছে তার চেয়ে কোটি গুণ অবাক হলো বইটা পড়ার পর। কারণ বইটিতে পুজানুপুজ্ঞ বর্ণনা দেয়া হয়েছে কী-কী ঘটবে ২০১৪ সালে! কোন-কোন ব্যক্তি মারা যাবে তারও একটা তালিকা দেয়া আছে। এক জায়গায় এসে আটকে গেল শরিফুল হকের চোখ। সে বুঝতে পারছে না এসব কী হচ্ছে। সে কি সত্যি-সত্যি কোনো প্যারা নরমাল জগতে ঢুকে পড়েছে? দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই শরিফুল হক ১০ পৃষ্ঠার মত পড়ে ফেলল। আর পড়তে পারল না।

পাগলের মত দৌড়াচ্ছে শরিফুল হক। যত দ্রুত পারে সে চাইছে তার বাসায় ফেরার জন্য। বইয়ের তথ্য ঠিক থাকলে আজই, একটু পরে শরিফুল হকের পুরো বাসা আগুনে পুড়ে যাবে। অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যাবে সবাই; আর এ ঘটনায় ঝড় উঠবে সারা দেশে। বাড়ির বাইরে থাকায় একমাত্র শরিফুল হকই বেঁচে যাবে। উসাইন বোল্টের চেয়েও জোরে দৌড়াল শরিফুল হক। কিন্তু না, ততক্ষণে সব শেষ। অগ্নি-তাণ্ডবে সব লগুঙও। হতবিস্মলের মত আগুনের কুণ্ডলীর সামনে দাঁড়িয়ে রইল শরিফুল হক। তার কিছু বলার নেই। অমোঘ নিয়তির সামনে সে একজন দর্শকমাত্র। নিয়তির লিখন খণ্ডনযোগ্য নয়। প্রকৃতি বিরাট রহস্যের জাল বিস্তার করে নিয়তিকি আগলে রেখেছে। এ রহস্যের ভেদ করতে পারে না কেউ। আর করতে পারে না বলেই জীবন এত রোমাঞ্চকর। এত বৈচিত্র্যময়।

জাতীয় পত্রিকা ও সেবা প্রকাশনীর বইসহ সৃজনশীল বইয়ের বিপুল সমাহার

আনন্দ বিপনী

১০ খান সুপার মার্কেট, জনতা ব্যাংক মোড়
ফরিদপুর।

মোবা: ০১৭১১২৩৪২৭৩, ০৬৩১৬৪৪৬৭

নেশায় মুখ ও দাঁতের ক্ষতি হয়

ডা. মোঃ ফারুক হোসেন

নেশার ঘোরে থাকার জন্য এরা সাধারণত
দাঁত ব্রাশ করে না বা অবহেলা করে।



নেশা শব্দটি সব শ্রেণীর লোকদের কাছে
পরিচিত। এই নেশা বিভিন্নভাবে
দেহের ক্ষতি করে থাকে।

ফেনসিডিলের নেশা: বাংলাদেশের নেশার
জগতে সবার কাছে ডাইল নামে পরিচিত।
নেশাগ্রস্ত যুবক-যুবতীরা ফেনসিডিল গ্রহণ
করে। দুধ-চিনি বেশি দিয়ে চা পান করে
তথাকথিত ফিলিংস পাওয়ার জন্য। কিন্তু এই
নেশার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রয়েছে। অতিরিক্ত দুধ-
চিনি মিশ্রিত চা ক্রমাগত পান করার ফলে দাঁত
ক্ষয় হতে থাকে। ফেনসিডিল আসক্তরা গভীর
রাত এমনকী ভোর রাত পর্যন্ত জেগে থাকে।
তারপর ঘুমিয়ে পড়ে। নেশার ঘোরে থাকার
জন্য এরা সাধারণত দাঁত ব্রাশ করে না বা
অবহেলা করে। ফলে তাদের দাঁতের ক্ষয়
তুলনামূলকভাবে অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি
হয়।

হেরোইনের নেশা: সাধারণত হেরোইন
আসক্তরা একটি পয়সা জিভের নীচে দিয়ে
পাইপের মাধ্যমে হেরোইন সেবন করে। এটি
অনেকগুলো পদ্ধতির একটি। হেরোইন টানতে
টানতে পয়সাটি কালো রং ধারণ করে। এর
পাশাপাশি দাঁতের রং কালো হয়ে যায় এবং যে
কোন সময় ক্যান্সার হতে পারে।

গাঁজার নেশা: গাঁজায় আসক্তরা মুখের বিভিন্ন
সমস্যায় ভুগে থাকেন। তার মধ্যে অন্যতম
হলো মুখের দুর্গন্ধ। এছাড়া সিগারেটের মত
আলসার বা ক্যান্সার অথবা অন্য যে কোন

সমস্যা গাঁজা সেবনের মাধ্যমে হতে পারে।
ক্রমাগত গাঁজা সেবনের ফলে অনেকের মুখের
স্বাভাবিক কাঠামো নষ্ট হয়ে যায়। তা ছাড়া
এদের অনেকেই কোষ্ঠকাঠিন্যে ভুগে থাকেন।

বিয়ারের নেশা: বিয়ারে অ্যালকোহল এবং
চিনির মিশ্রণ থাকে। ক্রমাগত বিয়ার পান
করতে থাকলে দাঁতের ক্ষয় হতে পারে। এ
ছাড়া একটু বেশি বয়সে বিয়ার ক্রমাগত পান
করলে ডায়াবেটিস হওয়া বিচিত্র কিছু নয়।

ইয়াবার নেশা: বর্তমানে আমাদের দেশে
ইয়াবার নেশা ভয়ংকরভাবে এবং ব্যাপক
আকারে বিস্তৃতি লাভ করেছে। ইয়াবা সেবনে
তরুণ-তরুণীদের জীবনী শক্তি নিঃশেষ হয়ে
যায়। ইয়াবা ট্যাবলেট প্রথম দিকে যৌন
উত্তেজনা বাড়ালেও কিছুদিনের মধ্যে এ
অনুভূতি চিরদিনের জন্য ধ্বংস করে দেয়।
ফলে সমাজে নানা ধরনের অশান্তি এবং
বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে। ইয়াবা সেবনে শুষ্ক মুখের
সৃষ্টি হয়। মুখে ও জিভে আলসার দেখা দিতে
পারে।

সর্বোপরি মরফিন, প্যাথিডিন থেকে শুরু করে
যে কোন নেশাগ্রস্ত মানুষ কল্লনার জগতে বাস
করে। তাই তারা স্বাভাবিক দাঁতের পরিচর্যা
করে না। তাই মুখে এবং দাঁতে যে কোন রোগ
দেখা দিতে পারে।

মুখ ও দন্তরোগ বিশেষজ্ঞ
মোবাইল: ০১৮১৭৫২১৮৯৭

সেই মেয়েটি

সোহানা রহমান

আমার
ওই
অসুস্থতার
সময়
ভৌতিক,
আলৌকিক
বিষয়ের
উপর প্রচণ্ড
আগ্রহ
জন্মে।



এক

সু ল ছাড়ার প্রায় বারো বছর পর কম্পাউণ্ডে ঢুকলাম। সেই ছোটবেলার কথা মনে পড়ে গেল। ইশ! কী সুন্দরই না ছিল দিনগুলো! ক্লাস থিটে ভর্তি হয়েছিলাম এখানে। তারপর ক্লাস টেন পর্যন্ত পড়েছি। এখানকার প্রতিটা ইট আমার আত্মার সাথে পরিচিত। ছোটবেলার বান্ধবীদের কথা মনে পড়তে লাগল খুব বেশি করে। কে জানে তারা কোথায়! কত ছোট-খাট বিষয় নিয়ে ঝগড়া হত। তখন মনে হত এর চেয়ে বড় দুঃখ আর কিছু হতে পারে না।...পরের দিন আবার সব ঠিক হয়ে যেত। ভুলেই যেতাম আগের দিন কী হয়েছিল।

খুব মনে পড়ে টিফিন পিরিয়ডের কথা। চুরি করে ছাদে উঠে যেতাম, ছাদের রেইলিং-এ পা ঝুলিয়ে বসতাম। উফ! এখন ভাবতেও ভয় লাগে। তিন তলার ছাদে উঠে রেইলিং-এ বসার সাহস আর আমার নেই। সিক্সের ক্লাসরুমটা ছিল সবচেয়ে সুন্দর। তিন তলায় বায়োলজি ল্যাব-এর ঠিক পাশেই ছিল রুমটা। আমরা দরজার ফাঁক দিয়ে ভিতরে রাখা মানুষের কংকালটা দেখতাম আর ভয় পেতাম। এত নির্জন ছিল ওই ফ্লোরটা! ক্লাস সিক্স আর সেভেন-এর প্রায় ১৫০ জন মেয়ে ক্লাস করত তিন তলায়। তাও কখনও মনে হত না যে এক ঝাঁক দুই মেয়ে সারাদিন ওখানে কাটিয়ে দেয়। টিচারের আসতে দেরি হলেই আমরা কেমন জানি ভয় পেয়ে যেতাম। কিছুই ছিল না, অথচ কী যেন ছিল! একবারে ১৫০টি দূরন্ত মেয়েকে ভয় পাইয়ে দেয়ার ক্ষমতা ছিল ওই ফ্লোরের। আরেকটা জায়গা ছিল যেখানে যেতে ভয় পেতাম আমরা। আমাদের হলরুমের পিছনের দিকে

পাশাপাশি দুটি টয়লেট ছিল। সেখানে কেউ যেত না। টয়লেট দুটি ছিল স্কুলের মূল ভবনের সমসাময়িক, ১৯১২ সালে তৈরি। ক্লাস টেনে পড়ার সময় একবার বাস্কবীদের সাথে বাজি ধরে আমি ওই টয়লেটে গিয়েছিলাম। বহু বছরের পুরানো দরজাটা খুলতেই কেমন যেন লেগেছিল আমার। দিনের বেলাতেই কী ভয়ঙ্কর অন্ধকার ছিল! বাজি ছিল যে আমি পাঁচ মিনিট টয়লেটে একা থাকব। আমি দরজা আটকে ভিতরে গিয়ে দাঁড়াতেই অদ্ভুত এক অনুভূতি চেপে ধরেছিল আমাকে। মনে হচ্ছিল কীসে যেন ভর করেছে আমার উপর। পাঁচ মিনিট পর যখন আমার বাস্কবীরা আমাকে বের করে এনেছিল, তখন প্রচণ্ড জ্বরে আমি কাঁপছি থরথর করে। ক্লাসরুম পর্যন্ত পৌছানোর আগেই জ্ঞান হারিয়েছিলাম আমি।

তারপর... অনেকদিন অসুস্থ ছিলাম। থেকে থেকে অজ্ঞান হয়ে যেতাম। কিন্তু আমি বা আমার বাস্কবীরা কখনওই কাউকে বলিনি ওদিন আসলে কী হয়েছিল! প্রায় তিন মাস লেগেছিল আমার পুরো সুস্থ হতে।

আমার ওই অসুস্থতার সময় ভৌতিক, অলৌকিক বিষয়ের উপর প্রচণ্ড আগ্রহ জন্মে। তখনই আমি ঠিক করেছিলাম আমি প্যারাসাইকোলজি নিয়ে লেখাপড়া করব। বাসার সবাই প্রথমে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল। আমিও জানতাম যে এ দেশে এ বিষয়ে পড়ালেখা করা সম্ভব না। রাতারাতি আমি পড়ালেখায় প্রচণ্ড মনোযোগী হয়ে গেলাম। এস.এস.সি আর এইচ.এস.সি-তে সাক্ষাতিক রকম ভাল রেজাল্ট করে 'Coventry University'-তে প্যারাসাইকোলজিতে পড়ার সুযোগ পেয়ে গেলাম। তারপর ওখান থেকেই গ্রাজুয়েশন আর পোস্ট গ্রাজুয়েশন করার পর পি.এইচ.ডি করার সুযোগ পেলাম ডক্টর রেডিন-এর সাথে। এবং বর্তমানে সেই পি.এইচ.ডি-র জন্যই আমার এই স্কুলে আবার আগমন প্রায় বারো বছর পর। ghost investigation আমার বিষয়। অনেক জায়গায় গিয়ে বিভিন্ন তথ্য জোগাড় করেছি। শুধু এই স্কুলের হলরুমের বাথরুমটার কাহিনি যোগ করলেই আমার রিসার্চ পেপার জমা দেয়ার উপযুক্ত হয়ে যাবে।

এখানে এসে আরও কিছু তথ্য পেয়েছি

আমি। গত দুই বছর ধরে নাকি এখানে খুব ভয়ঙ্কর একটা ঘটনা ঘটেছে। আজ সারা সকাল স্কুলের ছাত্রী আর শিক্ষক, শিক্ষিকাদের সাথে কথা বলেছি, নোট নিয়েছি এ বিষয়ে। গত বছরের আগের গ্রীষ্মের এক কাঠফাটা রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে ডে শিফট-এর অ্যাসেম্বলির সময় হঠাৎ সবাই গুনতে পেল ভীষ্ম কণ্ঠে একটি মেয়ে চোঁচিয়ে উঠেছে। সবাই শব্দের উৎস, অর্থাৎ তিন তলার বারান্দার দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল নীল রঙের জামা পরা একটি মেয়ে বারান্দা থেকে পড়ে যাচ্ছে। মাঠ ভর্তি হাজার খানিক মেয়ে আর সব কয়জন শিক্ষক চোঁচিয়ে উঠল দৃশ্যটি দেখে। চোখের সামনে মেয়েটি পড়ে গেল আর ধপাস করে একটি শব্দ হলো। এবং...চোখের সামনেই উধাও হয়ে গেল মেয়েটি। এরপর কী ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সেটা সহজেই অনুমেয়। অনেকদিন স্কুল বন্ধ ছিল। তিন তলা পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। বাচ্চা অনেক মেয়ে এই স্কুল ছেড়ে অন্য স্কুলে ভর্তি হয়েছিল। মৌলভী আর পুরোহিত দিয়েও স্কুলকে 'দোষমুক্ত' করা হয়েছিল।

তারপরে এক বছর কিছু হয়নি। সবই মোটামুটি স্বাভাবিক। টয়লেটে যাওয়ার সময় এখন অনেকেই আর আয়াদের ডেকে নেয় না বাইরে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য। এমন সময় আরেক গ্রীষ্মের দিনে, আবার একই সময়ে একই দৃশ্য দেখা গেল। এবারও নীল জামা পরা মেয়েটিকে সবাই পড়তে দেখল, পড়ার শব্দ শুনল এবং আগের মতই উধাও হয়ে যেতে দেখল। এবার অর্ধেকের বেশি মেয়ে স্কুল ছেড়ে দিল। এ বছর গ্রীষ্ম শেষের পথে। এখনও কিছু দেখা যাচ্ছে। সবাই আশা করছে ভৌতিক এ ঘটনা থেকে এবার বুঝি মুক্তি মিলবে।

নোট নিতে-নিতে ভাবছিলাম যে অনেক পরিত্যক্ত বাড়ি আর দুর্গে ঘুরেছি, কিন্তু এমন আশ্চর্য কাহিনি আর কোথাও শুনিনি। যে মেয়েটি তিন তলা থেকে পড়ে যায় তার বিবরণ দিতে গিয়ে কেউ ভালভাবে কিছু বলতে পারল না। মেয়েটি এত দ্রুত পড়ে যায় যে কেউ কিছু দেখার সুযোগ পায়নি। সবাই শুধু লক্ষ করেছে যে মেয়েটা নীল জামা পরে থাকে। কেমন নীল জিজ্ঞেস করতে একজন শিক্ষক বললেন, 'তুমি যেমন নীল পরেছ, তেমন নীল।' নিজের জামার

দিকে তাকালাম, আকাশী রঙের একটা কামিজ পরা আমি। মর্নিং শিফটের ক্লাস চলছিল। এরা ঘটনা নিজের চোখে দেখেনি। যদিও এদের কাছ থেকে অনেক তথ্য পাওয়া গিয়েছে। আমি ডে শিফটের মেয়েদের সাথে কথা বলার আগে তিন তলাটি নিজের চোখে একবার দেখব।

মর্নিং শিফটের ক্লাস ছুটি হওয়ার পর হেডমিস্ট্রেস ম্যাডামের কাছ থেকে তিন তলার চাবিটা চেয়ে নিলাম আমি। উনি কিছুতেই রাজি হচ্ছিলেন না। পরে বললেন সাথে যেন দারোয়ানকে নিয়ে যাই আমি। রাজি হয়ে গেলাম। আমাকে তিনতলা খুলে দিয়েই দারোয়ান তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গেল। হাসি পেয়ে গেল আমার। বেচারা ভয় পেয়েছে।

আমি পুরো তিনতলা ঘুরে-ঘুরে দেখছিলাম। কত খেলা করেছি এই বারান্দায়। আবার পুরানো বান্ধবীদের কথা মনে পড়তে লাগল ভীষণভাবে। নীচে ঘন্টা গুনলাম, এখন মেয়েরা লাইনে দাঁড়িয়ে অ্যাসেম্বলি করবে। আমার ইচ্ছা হলো আমিও ছুটে গিয়ে দাঁড়াই ওদের সাথে। বহু বছর আগে আমিও এমন লাইনে দাঁড়িয়ে গান গাইতাম, শপথ পড়তাম। এসব ভাবতে-ভাবতেই কংকালের রুমটা চাবি দিয়ে খুলে ফেললাম।

এক মুহূর্ত যেন আমি স্থবির হয়ে গেলাম। তেরো বছর আগের সেই অনুভূতি ফিরে এল। মনে হলো হলরুমের টয়লেটে দাঁড়িয়ে আছি আমি। ভীষণ এক ভয় এসে চেপে ধরল আমাকে। মনে হলো লক্ষ কণ্ট একসঙ্গে অট্টহাসি করে উঠেছে। ভয়ঙ্কর আতংকে পিছিয়ে এলাম আমি, মনেই ছিল না পিছনে রেইলিংটা খুব নিচু। ভাল হারালাম আমি। নিজের অজান্তেই একটা চিৎকার বেরিয়ে এল বুক চিরে। হঠাৎ পুরো চিত্রটা ফুটে উঠল মনের মাঝে। চৈতন্যের শেষ অবস্থায় আমি বুঝলাম গত দুই বছর ধরে নীল জামা পরা কোন মেয়েকে পড়ে যেতে দেখা যায় এখন থেকে।

দুই

আজ আর নীল জামা পরা মেয়েটা উধাও হয়ে যায়নি। ওই তো, ওখানে পড়ে আছে। কী আচর্য, সবাই এমন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কেন?!

শীঘ্রি আসছে ওয়েস্টার্ন ডেথ ট্রেইল

সায়েম সোলায়মান

আড়াই লক্ষ ডলারের বুলিয়নের একটা চালান যাচ্ছিল রেটন পাস থেকে স্যান মার্কোস সিটিতে। দৃষ্টি আকর্ষিত হলো

শকুনদের, অ্যামবুশ করল তারা।

কপালগুণে বেঁচে গেল বুলিয়নবাহী ওয়্যাগনের মাস্টার জেব স্টুয়ার্ট। মারা পড়ল ওর তিন বন্ধু। শহরে ফিরে

বুঝতে পারল, ফেঁসে গেছে সে-লুপ্তিত চালান উদ্ধার করতে না পারলে জেল

হয়ে যাবে। এদিকে ওর কোম্পানির

একাংশ কিনে নিয়েছে অলিভিয়া

কারসন, যে মনে করে তার বাবার

মৃত্যুর জন্য জেবই দায়ী। শরীরে

বুলেটের ক্ষত, নতুন পার্টনারের মনে

সন্দেহ। শকুনেরা ব্যস্ত আরেকটা

নীলনকশার বাস্তবায়নে। দু'মাসের

মধ্যে সমস্যার সমাধান না হলে

কোম্পানি দেউলিয়া। এ-অবস্থায় ডেথ

ট্রেইলে রওয়ানা হতে হলো জেবকে,

যে-ট্রেইল দিতে পারে হারানো

বুলিয়নগুলোর সন্ধান। কিন্তু ঘাতকরা

আছে সঙ্গে, হামলা করতে পারে

ইন্ডিয়ানরা। সুতরাং ডেথ ট্রেইলে

কারও-না-কারও মরণ সুনিশ্চিত।

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

mail: alochonabibhag@gmail.com

শো-রুম

৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

প্রশ্ন-উত্তর



প্রশ্ন: শীতকালে নারকেল তেল জমে যায় কেন?

উত্তর: ফ্যাট থাকে বলে।

প্রশ্ন: রেস্টুরেন্ট শব্দটি এসেছে ফরাসী শব্দ থেকে, এর অর্থ কী?

উত্তর: Refresh (রিফ্রেশ)।

প্রশ্ন: কোন্ মহাদেশে সবচেয়ে বেশি দেশ আছে?

উত্তর: আফ্রিকা।

প্রশ্ন: শুটিং কথটি কোন্ খেলার সঙ্গে যুক্ত?

উত্তর: বাস্কেটবল।

প্রশ্ন: টেস্ট ক্রিকেটে কে প্রথম ১০০ হাজার

রান করেন?

উত্তর: সুনীল গাভাসকার।

প্রশ্ন: তর্জমা কী?

উত্তর: ভাষান্তর, এটি একটি বাংলা শব্দ।

প্রশ্ন: পেঙ্গুইন পাখি কোথায় দেখতে পাওয়া যায়?

উত্তর: দক্ষিণ মেরু।

প্রশ্ন: মাখনের পরিবর্তে আমরা যে মার্জারিন ব্যবহার করি তা কী দিয়ে তৈরি হয়?

উত্তর: নারকেল।

প্রশ্ন: অভিনেত্রী সূচিত্রা সেন ১৯৬৩ সালে ফিলা ফেস্টিভ্যালে কোন ফিল্মের জন্য শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছিলেন?

উত্তর: সাত পাকে বাঁধা।

প্রশ্ন: নিরামিষ কেক বানাতে ডিমের বদলে কী দিতে হয়?

উত্তর: কর্নফ্লাওয়ার।

প্রশ্ন: খেজুর গাছের রস যারা সংগ্রহ করে তাদের কী বলে?

উত্তর: শিউলি।

প্রশ্ন: জন্মজয়ন্তী-এই জয়ন্তী বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: পতাকা।

প্রশ্ন: কুচকাওয়াজ, কুচ যদি সৈন্যবাহিনীর সংঘবদ্ধতা বোঝায় তা হলে কাওয়াজ কী?

উত্তর: যুদ্ধ শিক্ষা।

প্রশ্ন: চিনি ও গুড় কীসের থেকে পাওয়া যায়?

উত্তর: আখ।

প্রশ্ন: নৌসেনা প্রধানকে কী বলা হয়?

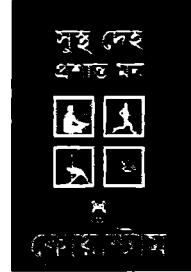
উত্তর: অ্যাডমিরাল।

সংগ্রহে: ফরিদা ইয়াসমিন

প্রকাশিত হয়েছে

সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন

সম্পাদনা: ডা. আতাউর রহমান



আধুনিক মানুষের জীবনযাপনের বিজ্ঞান কোয়ান্টাম। সঠিক জীবনদৃষ্টি প্রয়োগ করে মেধা ও প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশের মাধ্যমে প্রতিটি মানুষকে অনন্য মানুষে রূপান্তরিত করাই এর লক্ষ্য।

স্ব-উদ্যোগ, স্ব-পরিকল্পনা ও স্ব-অর্থায়নে সৃষ্টির সেবায় সম্ভবত্বভাবে কাজ করে বাংলাদেশকে বিশ্বের নেতৃস্থানীয় জাতিতে রূপান্তরিত করাই এর মনোভাব। কোয়ান্টাম মেথড অনুশীলন করে সমাজের সর্বস্তরের লোকেরা মানুষ অশান্তিকে প্রশান্তিতে, রোগকে সুস্থতায়, ব্যর্থতাকে সাফল্যে, অভাবকে প্রাচুর্যে রূপান্তরিত করেছেন। কোয়ান্টাম চর্চার মাধ্যমে আপনিও বদলে দিতে পারেন আপনার জীবন।

দাম ■ নব্বই টাকা

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

mail: alochonabibhag@gmail.com

শো-রুম

৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

শিক্ষণীয়

সামদাদ হোসেন সোহাগ

শিক্ষক
এই
শর্তে
রাজি
হলেন যে,
সবাইকে
আলাদা
রুমে
পরীক্ষা
দিতে
হবে।



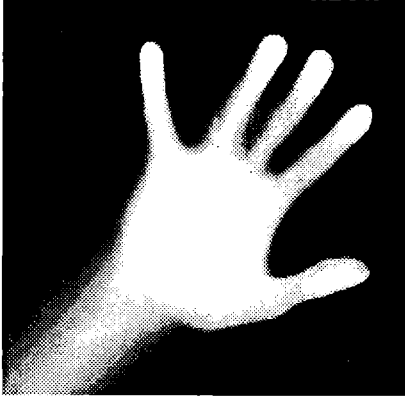
চারজন এঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র এক জায়গায় বেড়াতে গিয়ে ফাইনাল টেস্ট মিস করল। তখন তারা একটা গল্প ফেঁদে শিক্ষকের কাছে গিয়ে বলল, ‘স্যর, আমাদের একজনের দাদী মৃত্যুশয্যায় ছিলেন। তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম। পরে আসার সময় গাড়ির চাকা পাংচার হয়ে যাওয়ায় আর পরীক্ষা দিতে পারিনি,’ বলে আবার পরীক্ষা নিতে অনুরোধ করল।

শিক্ষক এই শর্তে রাজি হলেন যে, সবাইকে আলাদা রুমে পরীক্ষা দিতে হবে। সবাই রাজি হলে চারজনকে চার রুমে বসিয়ে প্রশ্ন দেয়া হলো।

পরীক্ষায় কেবল একটি প্রশ্নই ছিল, ‘গাড়ির কোন চাকাটি পাংচার হয়েছিল?’

গল্পের নীতিকথা: শিক্ষকের সঙ্গে মিথ্যে বোলো না; তিনি একজন এঞ্জিনিয়ার এবং একসময় তিনিও ছাত্র ছিলেন। ■

কুয়াললামপুর, মালয়েশিয়া।
julnarnain21ap@yahoo.com



শ্রেতের নজর রুবেল কান্তি নাথ

‘কোনও দুষ্ট ভূত শ্রেতের নজর
পড়েছিল তোমার উপর।’

রা তখন সাড়ে দশটা কি এগারোটায় মত বাজে। মেয়েটার দাঁতে প্রচণ্ড ব্যথা উঠেছিল। আমি মেয়েটার গর্ভধারিণী মা। আমি পারিনি আমার একমাত্র মেয়েটার এই যন্ত্রণা চেয়ে-চেয়ে দেখতে। তাই তো মঙ্গলবার রাতে ডাক্তারের কাছে ছুট দিলাম, ওর ব্যথার ওষুধ আনার জন্য। পথিমধ্যে হাতের ডান পাশে পড়ে শ্মশান-যেখানে হিন্দু সম্প্রদায়ের ‘বণিক’ গোত্রের মড়া পোড়ানো হয়। ওই শ্মশানে শত-শত মরা মানুষের চিতা। এসব আমার মনে ছিল না, বা কোনও ভয়ও পাইনি আমি।

আমাদের বাড়ির পাশেই হিন্দু ‘যোগী’ সম্প্রদায়ের সমাধিস্থান। (হিন্দুদের মধ্যে যোগী সম্প্রদায় মড়া পোড়ায় না। কবর দেয়।) তো ওই সমাধিস্থান লাগোয়া পুকুর, ওই পুকুরে রাত বারোটাই-একটায় স্নান করি আমি। কখনও আমার বিন্দুমাত্র ভয়ও লাগেনি বা আমি তেমন একটা ভূত-প্রেতে বিশ্বাসীও নই।

আমার বয়স কমপক্ষে পঁয়তাল্লিশ বছর পেরিয়ে গেছে। এই পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে আমি কোনও দিন ভৌতিক কোনও অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হইনি।

সেদিন মেয়ের জন্য ওষুধ নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। রাতে খেয়ে-দেয়ে ছেলে মেয়েকে ওইয়ে দিয়ে, আমি গেলাম ওই সমাধিস্থান লাগোয়া পুকুরে স্নান করতে। গরমকালে আমি রাতে স্নান না করলে থাকতে পারি না। গরম কিছুতেই সহ্য করতে পারি না আমি। তাই গরমকালে প্রতি রাতে স্নান করা আমার রুটিনই বলা চলে। আমি যখন ওই পুকুরে স্নান করি, তখন পুকুর ঘাটে কেউ থাকে না। আমার সাথেও কেউ পুকুরে সঙ্গ দিতে যায় না। ওরকম নিকষ কালো রাতে আমি শ্রুকা-একাই স্নান করতে যাই।

আগেই বলেছি, আমার ভৌতিক-টৌতিক বা এসব হাবিজাবি ব্যাপারে কোনও ভয় নেই। তো, ওইদিন হাঁড়ি-পাতিল ঘষে-মেজে শেষ করে, পুকুরে দুটো ডুব দিয়ে ঘরে ফিরি।

খেয়ে-দেয়ে মেয়েকে নিয়ে ঘরের মেঝেতে শীতল পাটি পেতে শুয়ে ছিলাম। খাটে ছিল মেয়ের বাবা আর ছোট ছেলেটা। মেয়েটার দাঁতে ব্যথা যেমন ও সহ্য করতে পারছিল না, ঠিক ওর কষ্টটাও আমি মা হয়ে সহ্য করতে পারছিলাম না। তাই মেয়েটাকে সঙ্গ দিচ্ছিলাম।

মেয়েটাকে ঘুম পাড়াতে-পাড়াতে গভীর রাত হয়ে গেছিল। ঘরে ডিম লাইটটা স্নান আলো ছড়চ্ছিল। ওই আলোতে দেখলাম, ভালুকের মত দেখতে ভয়ংকর চেহারার দুটো দানব বন্ধ ঘরের মধ্যে কীভাবে যেন ঢুকে পড়ল। কাছে এসে মেয়ে আর আমাকে তীব্র আক্রোশে ছিড়ে-ঝুড়ে ফেলতে চাইছিল ওরা।

আমি মেয়েকে ওদের হাত থেকে টেনে নিতে চাইলে, ওরা আমাকে টেনে নিতে চাইল মেয়েকে ছেড়ে। আমি নিজেকে ওদের কাছ থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করলে, ওরা মেয়েকে তুলে নিয়ে যেতে চাইছে। কী ভয়ানক ব্যাপার!

কিছুতেই ওদের কাছ থেকে নিস্তার পাচ্ছিলাম না আমরা, মা আর মেয়ে!

ওদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে আর থাকতে না পেরে, ভয়ে, তীব্র আতংকে গলা ফাটিয়ে চিৎকার দিলাম।

আমার স্বামী আমার কান ফাটানো চিৎকার শুনে ধড়মড় করে ঘুম থেকে জেগে উঠল। শুনতে পেলাম, বাইরে কে যেন দরজায় মহা আক্রোশে লাথি মারছে। তীব্র আতংকে বরফের মত জমে গেলাম আমি। আমার চিৎকারের সময়ই ওই দুই কালো প্রেত, নাকি দানব(!) এক নিমিষেই বাতাসে মিলিয়ে গিয়েছিল।

স্বামী বেচারা আমাকে ধরে ঝাঁকাতো-ঝাঁকাতো জিজ্ঞেস করল, “কী হয়েছে তোমার?”

তখনও দরজায় দড়াম-দড়াম লাথি পড়ছিল। স্বামী আমাকে ছেড়ে দরজায় কে আঘাত করছে, দেখতে গেল। আমি বোবা হয়ে গেছিলাম। ওকে দরজা খুলতে মানাও করতে পারছিলাম না।

দরজা খুলতেই তুফানের বেগে ঘরে ঢুকল তিন দেবর-তাদের বড় আর শ্বশুর-শাশুড়ি। সবার একটাই জিজ্ঞাসা, “হয়েছেটা কী?”

তখনও আমি প্রচণ্ড ভয়টা কাটিয়ে উঠতে পারিনি, বাকরুদ্ধ হয়ে ছিলাম। ওরা মনে করেছিল, আমাকে কারেন্ট শক দিয়েছে!

পরে একটু ধাতস্থ হয়ে পুরো ঘটনাটা ওদের খুলে বলি।

শাশুড়ি মা সব শুনে বললেন, ‘আজ মঙ্গলবার। শ্মশানের ওদিকে রাতে যাওয়াতে কোনও দুষ্ট ভূত-প্রেতের নজর পড়েছিল তোমার উপর।’

এধরনের ভয় আমি জীবনেও পাইনি। ছোটবেলা থেকে এত বড় হয়েছে, কখনও এরকম

পরিস্থিতিতে পড়িনি। শুনতাম, লোকে নাকি ভূত-প্রেতের খপ্পরে পড়ে-বিশ্বাস করতাম না তা। ভাবতাম, ওসব আষাঢ়ে গল্পপো। কিন্তু নিজে যখন পড়লাম, তখন আর বিশ্বাস না করে পারলাম না।

এবার ভূমি কাহিনিটা বিশ্বাস করলে করো, না করলে তো আমার কিছু করার নেই। তবে কাহিনিটা যে একশো ভাগ সত্যি, তা প্রমাণ করার জন্য, আমার সন্তান দু’জনের মাথা ছুঁয়ে বলতে পারব।

১৪.৫.২০১৩ ইং তারিখে এই ভয়ঙ্কর সত্যি ঘটনাটি আমাকে বলেছিলেন আমার পাড়াতো এক কাকীমা।

আমি যতটুকু জানি, তিনি সত্যবাদী ধরনের। বিশ্বাসযোগ্য-নির্ভরযোগ্য একজন প্রকৃত মানুষ। মজার ব্যাপার হলো, তিনিও আমার মত বিজ্ঞান মনস্ক-মানে, ভূত-প্রেতে তেমন একটা বিশ্বাস নেই। সেই তিনি কিনা অনাকাক্ষিত এধরনের একটি ভৌতিক অভিজ্ঞতার শিকার হলেন!

আসলেই পৃথিবীতে মাঝে-মাঝে অলৌকিক-অবাস্তব ঘটনা ঘটে, যে ঘটনাগুলোর কোনও ব্যাখ্যা থাকে না। এসব ঘটনা রহস্যের আধারেই থাকে যায়।

আমি আর উনি দু’জনেই হাসি-খুশি আর মিশুক টাইপের বলে, কাহিনিটা তিনি আমাকে বলেছিলেন।

আমি আগ্রহ সহকারে কাহিনিটার আদ্যোপান্ত শুনেছিলাম। এবং এই সুযোগে একটা সত্যি কথা বলছি, ওই দিন রাতে আমি ভয়ে ঠিকমত ঘুমাতো পারিনি।

চোখ বন্ধ করলেই আমার মনে হচ্ছিল যে, কালো-কালো দুটো পিশাচ আমাকে জাপটে ধরছে! কোনওমতে বিধাতার নাম স্মরণ করে ওই ভয়ানক রাতটা পার করেছিলাম।

আপনিও কি ভূতে বিশ্বাস করেন না?

রাতে কখনও ভয়ে আমার মত কাবু হননি?

তবে আপনাকেই বলছি, লেখাটা রাত বারোটার পর পড়ে, লাইট নিভিয়ে একলা ঘরে ঘুমাতো চেষ্টা করুন।

গভীর রাতে দেখতে পাবেন, দুটো কালো-কালো ভয়াল দানব সদৃশ প্রেত আপনাকে ছিড়ে-ঝুড়ে ফেলতে চাইছে!

দয়া করে, ভয় পাবেন না!

হাণ্টার

তৌফির হাসান উর রাকিব

এই
ছেলের
বিরুদ্ধেই
ছয়জন
মানুষ হত্যা
করে
একতাল
সোনা নিয়ে
চম্পট
দেয়ার
অভিযোগ
রয়েছে।



গানগনে সূর্যটা অবিরত আগুন ঢালছে। মাথার মগজসুদূর গলিয়ে ফেলবে যেন! কপালে জমা হওয়া বিন্দু বিন্দু ঘাম, ক্ষণে ক্ষণেই দৃষ্টি অস্পষ্ট করে তুলছে। হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে আবারও ঘাম মুছল রায়ান। ঠিক তখনই দূরে আবছাভাবে কিছু দালান-কোঠার কাঠামো চোখে পড়ল তার। কোন সন্দেহ নেই, ওটাই সিলভার সিটি। এই এলাকার একশ' বর্গমাইলের মধ্যে এটা ছাড়া আর কোন শহর নেই!

শহরের কাছাকাছি আসতেই হোলস্টারের উপরের ফিতা খুলে পিস্তল দুটো খানিকটা আলগা করে নিল রায়ান। যে কোন মুহূর্তে বের করার জন্য প্রস্তুত। পশ্চিমের যে কোন শহরে আগন্তুককে প্রথমে সন্দেহের দৃষ্টিতেই দেখা হয়। সেজন্য সদা সতর্ক না থেকে উপায় নেই।

সিলভার সিটি শহরটা একটা মাইনিং টাউন। তবে আজকাল খনির ব্যবসার পাশাপাশি গরু ব্যবসাতেও জড়িত এখানকার কিছু বাসিন্দা। পশুনের দিক থেকে বেশ পুরনো হলেও, আকারের দিক দিয়ে খুব বেশি বড় নয় শহরটা। কয়েকটা ছোট বড় সেলুন, দুটো জেনারেল স্টোর, হোটেল, রেস্টোরাঁ, কামারের দোকান আর কয়েকটা দালান, এই নিয়েই গড়ে উঠেছে মূল শহর। শহরের একধারে একটা স্টেজ স্টেশন। প্রতিদিন অন্তত একটা স্টেজ কোচ আসে এখানে। পাশেই দোতলা ব্যাংক। পাথরে তৈরি, বেশ মজবুত। রোদের আলোয় ঝিকমিক করছে সামনের রঙচঙা সাইনবোর্ড। টাউন মার্শালের অফিসের একদম পাশেই জেলখানাটা। শহরের মূল সড়কটা চলে

গেছে একেবারে দালানগুলোর মাঝ বরাবর। দু'পাশের কাঠের ফুটপাথগুলো এই মধ্য দুপুরে রীতিমত ফাঁকা। দু'একটা ঘেয়ো কুকুর ছাড়া অন্য কোন প্রাণীর নড়াচড়া চোখে পড়ল না রায়ানের।

শহরে ঢুকতেই হাতের বাঁ পাশে মাঝারী আকৃতির একটা লিভারি স্টেবল দেখতে পেল সে। ভিতরে পা রাখতেই ঘোড়ার মল মূত্র, খড় আর ঘামের মিশ্রণে বিচিত্র এক দুর্গন্ধ এসে ঝাপটা মারল নাকে। গন্ধটা রায়ানের নিত্যস্ত অপরিচিত না হলেও, চট করে বমি পেয়ে গেল। বহু কষ্টে সেটা ঠেকিয়ে ধীরে সুস্থে ঘোড়া থেকে নামল সে। স্টেবলের বুড়ো হসলার লোকটা একখানা বেতের চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে দিবানিদ্রায় ব্যস্ত। দিন দুনিয়ার কোন খবর নেই তার। মুখের হাঁ এত বিশাল যে, কোন পাখি যদি ভুল করে এখানে বাসা বাঁধার চেষ্টা করে তা হলে কিছুতেই সেই পাখিকে দোষারোপ করা যাবে না!

হালকা পায়ে এগিয়ে গিয়ে বুড়োর পাশে রাখা রাইফেলটা দূরে সরিয়ে রাখল রায়ান। তারপর মৃদুস্বরে ডাকল বুড়োকে। প্রথম ডাকেই ধড়মড় করে জেগে উঠল সে। চোখ মেলেই হাত বাড়াল রাইফেলের দিকে। হতভম্ব হয়ে আবিষ্কার করল, জায়গামত নেই সেটা! তারপর ভয়াবহ দৃষ্টিতে তাকাল সামনে দাঁড়ানো আগন্তকের দিকে।

ঝঞ্ঝু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে রায়ান। দীর্ঘদেহী একহারা দেহের গড়ন। রোদেপোড়া তামাটে মুখখানা লম্বাটে। কালো চোখজোড়া গভীর। বলিষ্ঠ পেশীগুলো প্রচুর দৈহিক শক্তির পরিচয় বহন করছে। দেহের দু'পাশে জোড়া পিস্তল ঝুলানো। মাথায় ধূলিমলিন ধূসর হ্যাট। গলায় একখানা নীল স্কার্ফ আলগা করে বাঁধা।

একপলকেই সবকিছু দেখে নিল বুড়োর অভিজ্ঞ চোখ। গোটা অবয়বের কোথাও অশুভ কিছু খুঁজে পেল না সে। ততক্ষণে পুরোপুরি ধাতস্ত হয়ে গেছে সে।

'হাউডি স্ট্রেঞ্জার!'

বাম পায়ে দেহের ভার বদল করল রায়ান। পিছনের বিশাল কালো স্ট্যালিয়ন ঘোড়াটাকে দেখিয়ে বলল, 'ভালমত যত্ন নিয়ে

ঘোড়াটার। অনেকটা পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে। অচিরেই আবার পথে নামতে হবে হয়তো। দেখো, কোন অযত্ন যেন না হয়।'

'চিন্তা করো না, ভালই থাকবে ও। তা, কী নামে ডাকা হয় ওকে?'

'টাফ। আদতেই ভীষণ টাফ ও।'

'আর টাফের মালিকের নাম?'

স্থির দৃষ্টিতে রায়ানের চোখের দিকে তাকিয়ে আছে বুড়ো। চেহারাটা চেনা চেনা লাগছে বটে, তবে কিছুতেই নাম মনে করতে পারছে না সে। আবার এটাও ঠিক যে, আগে কখনও এই যুবককে দেখেনি সে। তবে চেহারা চিনতে এটা মোটেও কোন প্রতিবন্ধকতা নয়। পশ্চিমে লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ে চেহারার নিখুঁত বর্ণনা। বহু মাইল দূর থেকেও মানুষ মানুষকে চিনে নেয় নিমিষেই!

বুড়োর দিকে ভালমত তাকাল রায়ান। তারপর মৃদুস্বরে নিজের নাম বলল।

'শুধু রায়ান! রায়ানের আগে পরে কিছু নেই?' খানিকটা যেন অবাক হয়েছে হসলার বুড়ো!

'না, শুধুই রায়ান।' শান্ত গলার জবাব পেল সে।

'তা এই হতচ্ছাড়া শহরে আগমনের হেতু কী? না মানে...শহরটা মূল ট্রেইলের বাইরে কিনা!' নিরীহ গলায় বলল বুড়ো।

'তুমি কি সবসময়ই এত বেশি বেশি কথা বল? তোমার বয়সী যে কারও জানা উচিত, বাড়তি কৌতূহল স্বাস্থ্যের জন্য ভাল নয় মোটেও। দেখা যাচ্ছে, বিধাতা তোমার উপর বিশেষ সদয়। এজন্যই এখনও দিবানিদ্রা উপভোগ করার সুযোগ পাচ্ছে।'

হো হো করে হেসে উঠল বুড়ো। হাসির দমকে কেঁপে কেঁপে উঠল বিশাল ভুড়ি।

'না, সান। সবার সাথে এত বেশি কথা বলা হয় না। শুধু যাদেরকে ভাল লেগে যায়, তাদের ক্ষেত্রেই কেবল মুখের লাগাম ছেড়ে দেই।'

চতুর বুড়ো, মনে মনে বলল রায়ান। মিষ্টি কথায় মন জয় করার বিদ্যা ভালই রপ্ত করেছে।

'সেধে আসিনি তোমাদের শহরে। ড্যান

হপার ডেকে পাঠিয়েছে। তার গরু, ঘোড়া নাকি একে একে মারা পড়েছে কোন এক গালকাটা সিংহের হাতে। তাকে শায়েস্তা করতেই আমায় খবর পাঠিয়েছে ড্যান।'

বিস্ময়ে চোখ কপালে উঠল বুড়োর।
'ভূমিই তা হলে লায়ন রায়ান?'

ফস করে ম্যাচ জ্বেলে একটা সিগারেট ধরাল রায়ান। একটা টান দিয়ে আয়েশ করে ঝোঁয়া ছাড়ল। পাঁচটা সিগারেট সহ বাকি প্যাকেটটা হতভস্ত বুড়োর হাতে গুঁজে দিল সে।

'গুঁই নামেও লোকে ডাকে বলে শুনেছি। তবে আমি শুধুই রায়ান। সামনে পিছনে কিছু নেই।'

চকিতে সামনে দাঁড়ানো যুবককে পুরোপুরি চিনে ফেলল বুড়ো। মনে পড়ে গেল তার সম্পর্কিত সকল তথ্য। লায়ন রায়ান। একজন অফিশিয়াল লায়ন হান্টার। কাজ, সিংহ শিকার। ইতিমধ্যে গোটা পশ্চিমে রীতিমত কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছে এ যুবক। আশপাশের কয়েক কাউন্টির অজস্র সিংহ মেরেছে সে। রক্ষা করেছে অসংখ্য গরু, ঘোড়া আর মানুষের জীবন। মানুষকে সিংহকে তাড়া করতে গিয়ে বারবার নিজের প্রাণ বাজী রেখেছে। গহীন অরণ্য কিংবা রুক্ষ পার্বত্য অঞ্চল থেকে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে ফিরে এসেছে বারবার।

সিংহ শিকারি হিসেবে সরকারী বেতন ছাড়াও কাউন্টি বোনাস পায় সে সিংহের মাথাগুলোর জন্য। টাকা পয়সার দিক থেকে বেশ সচ্ছল বলা যায় লায়ন রায়ানকে।

আরেকটা ভয়ঙ্কর পরিচয় আছে তার।

সিংহ শিকারের পাশাপাশি, মানুষ শিকারেও তার জুড়ি নেই!

রায়ান একজন বাউন্টি হান্টার।

সিলভার সিটির একমাত্র আবাসিক হোটেল এবং সবচেয়ে বড় সেলুনটার মালিক ড্যান হপার। তবে তার আসল ব্যবসাটা গরুর। শহরের অদূরেই, পর্বতের কোলজুড়ে এক বিশাল র‍্যাক করেছে লোকটা। তাকে নিঃসন্দেহে শহরের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি আখ্যা দেয়া যায়।

বাথান মালিকের সাথে হপার সেলুনেই

দেখা করল রায়ান। এই সেলুনটা অন্যান্য সেলুনের চেয়ে খানিকটা ব্যতিক্রম। সেলুন আর জেনারেল স্টোরের সংকর যেন! একপাশে খরে খরে সাজানো মদের বোতলের তাক, অন্যপাশে নিভা প্রয়োজনীয় নানা জিনিসপত্র সাজানো। দূর-দূরান্ত থেকে আগত গরুর পাইকারদের সাথে এখানে বসেই ব্যবসায়িক আলাপ সারে ড্যান। 'চকচকে কাঠের কাউন্টারে, ডান হাতের উপর থুতনি রেখে নীরবে পুরো বৃষ্টিস্তম্ভে গেল রায়ান। মাঝে-মাঝে অবশ্য বাথান মালিকের উপহার দেয়া দামি কনিয়াকের বোতলে চুমুক দিতে ভুলল না।

জানা গেল, গত বেশ কিছুদিন ধরেই সিংহটার হাতে নিয়মিত গরু হারাচ্ছিল ড্যান। সপ্তাহখানেক আগে লাইন রাইডিংরত, দুই কাউবয়ের সামনে পড়ে যায় সিংহটা। পরক্ষণেই তাদের আক্রমণ করে গুটো। মুহূর্তেই একজনকে কাবু করে ফেলে। তবে অপর কাউব্যাগ গুলি ছুঁড়তে-ছুঁড়তে কোনমতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছে। তার একটা গুলি সিংহটার ডান গাল লাগে, আহত হয় জানোয়ারটা। তারপর থেকে আরও হিংস্র এবং সাহসী হয়ে ওঠে গালকাটা। চারদিন আগে বাথানের দক্ষিণ সীমান্তের এক লাইন কেবিনে হামলা করে, এক পাঞ্চর আর তার ঘোড়া সাবাড় করে গালকাটা। এখন প্রাণভয়ে আর কোন কাউবয়ই লাইন রাইডিঙে যেতে চাচ্ছে না। এই সুযোগে সীমান্ত অরক্ষিত পেয়ে কখন আবার রাসলাররা হামলা করে, সেই দুচিন্তায় রাতের ঘুম হারাম হবার উপক্রম ড্যানের। শিগগিরই এর একটা বিহিত না করলেই নয়।

কাউব্যাগদের বর্ণনা থেকে জানা গেছে, বিশাল এক মন্দা সিংহ এই গালকাটা। তবে গড়পড়তা মন্দা সিংহের চেয়েও অন্তত দেড়গুণ বড় এর দেহ কাঠামো। কেশরের রঙ অন্যান্য সাধারণ সিংহের মত তামাটে নয়, কৃচ্ছকুচে কালো। দু'চোখে রাজ্যের শয়তানী। ইতিমধ্যেই আশপাশের সব বাথান মালিকেরা মিলে গালকাটার মাথার জন্য পাঁচশ ডলার পুরস্কার ঘোষণা করেছে। তবে গালকাটাকে মারতে পারলে ড্যানের তরফ থেকে আরও

কিছু বোনাস পাবে রায়ান।

ড্যানের বর্ণনা শেষ হলে মুখ ঝুলল সে, 'বিক্কেলে আমি তোমার বাথানে যাব। সর্বশেষ আক্রমণটা যেখানে করেছিল গালকাটা, সে জায়গাটা নিজে জরিপ করে দেখে আসব।'

'ওখানে তো কিছু নেই আর এখন! পাঙ্কজ আর তার ঘোড়ার দেহাবশেষ যেটুকু পেয়েছি আমরা, কবর দিয়ে দিয়েছি।'

'না, সেজন্য না। ওখানে গেলে বুঝতে পারব, সিংহটা এরপর কোনদিকে গেছে। ভরপেটে খুব বেশি দূরে যাবার কথা নয় তার।'

'বেশ, যেয়ো। তবে আমি যেতে পারছি না তোমার সাথে। ব্যবসায়িক আলাপ সারতে হবে এক পাইকারের সাথে। আমার ফোরম্যান, ফিল জ্যাক, তোমাকে নিয়ে যাবে সেখানে।'

'তাতে কোন অসুবিধে নেই আমার।'

নীরবে আবারও গ্রাসে চুমুক দিল রায়ান। বহুদিন এমন ভাল মদ পেটে পড়েনি তার। রাই হুইস্কি খেতে খেতে মুখে একদম অরুচি ধরে গিয়েছিল।

বাইরে বেরোতে গিয়েও ব্যাটউইং ডোরের কাছে থমকে দাঁড়াল ড্যান হুপার। ফিরে তাকিয়ে বলল, 'ভাল কথা রায়ান, যাবার আগে মার্শালের অফিস ঘুরে যেয়ো একবার। ডেভিড বুঁজছিল তোমাকে, কী নাকি কথা আছে তোমার সাথে।'

নীরবে মাথা দোলাল রায়ান।

মনে মনে ঝানিকটা বিরক্ত হলো। তার সাথে এখন কী কাজ মার্শালের? মানুষকে কো সিংহ শিকারে বেরোলে, মাথা ঠাণ্ড রাখতে হয়। না হয় যেকোন মুহূর্তে নিজেই শিকার বনে যাবার সম্ভাবনা ষোলোআনা। এখন অন্য কোন ঝামেলায় জড়ানোর বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই তার।

মার্শালের কামরাটা ছোট। ঘরের একপাশে একটা বড় কাঠের ডেস্ক, সামনে দুটো চেয়ার। অন্যপাশে লম্বা একটা বেক্স পাতা। ছোট একটা গানরাক আছে ঘরের আরেক দেয়ালের কাছে। চেয়ারে শরীর এলিয়ে সামনের ডেস্ক পা তুলে বসে আছে মার্শাল ডেভিড নিকোল। আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেট, কপালে চিন্তার ভাঁজ। মুখের সামনে পাক খেতে খেতে ছাদের দিকে উঠে যাচ্ছে

একরাশ ধোয়া।

খনি শ্রমিকদের মজুরীর বিশ পাউন্ড সোনা নিয়ে দিন চারেক আগে সিলতার সিটিতে আসছিল একটা স্টেজ কোচ। পথে ইয়েলো স্প্রিং-এর কাছে, স্টেজ ড্রাইভার এবং অন্য সব যাত্রীদের খুন করে সব সোনা নিয়ে পালিয়ে যায় এক দুর্বৃত্ত। অনেক পরে খবর পেয়ে তাড়া করে গিয়েছিল পসি বাহিনী। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি, ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। আগের রাতের ঝড়ে সব চিহ্ন বেমালাম গায়েব হয়ে গেছে। ট্রাক কবর সম্ভব হয়নি আউট-লকে। তবে তার পরিচয় অবশ্য জানা গেছে। ডাবল ডি বাথানের কাউবয়, ডাস্টি ফগ। কেবলমাত্র এই ব্যাটা ছাড়া, বাকি সবার লাশই পাওয়া গেছে স্টেজ কোচের আশপাশে। ইতিমধ্যেই ডাস্টির মাথার উপর এক হাজার ডলার পুরস্কার ঘোষণা করেছে খনি মালিকেরা। তবে আশংকার কথা, বেমালাম লাগাতা হয়ে গেছে ডাস্টি ফগ। সিংহের ভয়ে বাউন্টি হান্টাররাও কেউ পিছু নেয়নি তার। এরমধ্যে দক্ষিণের সীমান্ত পেরিয়ে একবার মেক্সিকোতে ঢুকে গেলে আর কখনও ধরা যাবে না হারামজাদাকে। এটা নিয়েই চিন্তিত টাউন মার্শাল, ডেভিড নিকোল।

তার চিন্তার বিঘ্ন ঘটিয়ে রুমে ঢুকল রায়ান। মার্শালকে এরকম হাত পা ছেড়ে এলিয়ে পড়ে থাকতে দেখে, তার চোখে-মুখে স্পষ্ট বিরক্তি ফুটে উঠল। ডেস্কের কাছে এসে কঠিন গলায় বলল, 'কী জন্য বুঁজছ আমাকে? জলদি বল।'

চট করে ডেস্কের উপর থেকে পা নামিয়ে নিল মার্শাল। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে বুকের টিনের ব্যাজ মেঝেতে পড়ে গেল। সেদিকে ত্রক্ষেপও করল না ডেভিড।

'আহা, এত চটছো কেন রায়ান? বসো। জরুরি আলাপ আছে।'

একটা লোহার চেয়ার টেনে তাতে বসল রায়ান। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট ধরাল। তারপর চোখে কৌতূহল নিয়ে মার্শালের দিকে তাকাল।

ডেভিড ততক্ষণে মেঝে থেকে টিনের তারাটা তুলে নিয়েছে। ধুলো ঝেড়ে আবার

লাগিয়ে নিয়েছে যথাস্থানে। বৃকে মার্শালের ব্যাজটা থাকলে, অনেক বল পায় ও। অবশ্য রায়ানের মত ব্যক্তিত্বের সামনে সেটা খুব একটা কাজে আসে না। এরকম ঠাণ্ডা মানুষদের সামনে নিজেকে বড্ড অসহায় লাগে ডেভিডের। বৃক খড়্‌খড়্‌ করে, শ্বাসকষ্ট হয়।

কোনমতে বলল সে, 'ড্যান হপারের কাজটা নিয়েছ?'

'হ্যাঁ,' সর্ধক্ষিপ্ত জবাব দিল রায়ান।

'তা হলে তো সিংহটাকে তাড়া করতে তোমাকে ওস্ত উলফ পর্বতশ্রেণীর দিকে যেতেই হবে, তাই না?'

'যেতে হতে পারে। এখনও হামলার জায়গাটা নিজের চোখে দেখিনি।' নিশ্চিত নয় রায়ান।

'যদি ষাও, সিংহটার পাশাপাশি একটা আউট-লকেও শিকারের অনুরোধ করব তোমাকে।' মৃদুস্বরে বলল মার্শাল। কিছু না বলে পূর্ব দৃষ্টিতে মার্শালের দিকে তাকাল রায়ান, চোখে ফুটে উঠেছে প্রশ্ন।

ধীরে সূস্থে সন্ধিস্তারে স্টেজ ডাকাতির ঘটনাটা বর্ণনা করল মার্শাল। তরুরকে জীবিত অথবা মৃত ধরে আনার পুরস্কার যে এক হাজার ডলার, একখাটা স্পষ্ট করে একাধিকবার বলতে তুলল না।

'এই কাউন্সেলর আগের কোন অপরাধের রেকর্ড আছে তোমার কাছে?'

'না, নেই।' ঝানকটা অসহায় লাগল মার্শালকে।

'হুম। ছেলোটা একাই ছয়-ছয়জন পূর্ববয়স্ক সশস্ত্র মানুষকে বুন করে ফেলল, ব্যাপারটা কেমন অবিশ্বাস্য নয় কি?'

'অবিশ্বাস্যই বটে। তবে যেভাবেই হোক, সে অসম্ভবকে সম্ভব করতে সক্ষম হয়েছে। আমরা এখনও জানি না সে বাইরে থেকে কারও সাহায্য পেয়েছিল কি না। ঝড়ে সব চিহ্ন মুছে গিয়েছিল। কিছুই বোঝার উপায় ছিল না।'

'যেহেতু সে স্টেজে চেপেছিল, তাই সাথে নিজের ঘোড়া ছিল না নিশ্চয়ই। তা হলে ডাকাতির পর পালান কীভাবে? তুমি নিশ্চয়ই বলবে না যে, পায়ে হেঁটে সে ওস্ত উলফ-এর

দুর্গম ট্রেইলে নেমেছে?'

'না, তা বলছিও না। মৃত ঘোড়াগুলো মধ্য একটা ঘোড়া কম ছিল। হিসেব মতে স্টেজ কোচে আরেকটা বাড়তি ঘোড়া থাকার কথা। সম্ভবত সেটি নিয়েই চম্পট দিয়েছে লুটেরা ছেলোটা।'

'সেটা হতে পারে। তা তুমি নিজে খুঁজতে যাচ্ছ না কেন?'

'সিংহের ভয়ে। তা ছাড়া তুমি জানো এখন ক্যাটল ড্রাইভের মৌসুম। প্রতিদিনই শহরে কোন না কোন ঘটনা ঘটছে। এসময় আমার শহরে থাকাটা গুরুত্বপূর্ণ।'

মার্শালের সহজ স্বীকারোক্তি মেনে নিল রায়ান। সত্যি কথাই বলেছে লোকটা। ক্যাটল ড্রাইভের সময় আউটফিটগুলো গনগনে কয়লার মত তেতে থাকে। সামান্য ক্ষুণ্ণ থেকেই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হতে পারে যখন-তখন। শুরু হয়ে যেতে পারে ক্যাটল ওয়ার। মার্শাল শহরে না থাকলে, সেটা ঠেকাবার আর কেউ থাকবে না।

মার্শালের কাছ থেকে আউট-ল ডান্টি ফগের চেহারার বর্ণনা ভাল করে জেনে নিল রায়ান। তারপর বেরিয়ে এল রাস্তায়। ড্যান হপারের বাথানে যেতে হবে তাকে এখন। সিংহের হামলার জায়গাটা নিজে একবার দেখা দরকার।

পরদিন সকাল সকাল টাকের পিঠে চেপে ওস্ত উলফ পর্বতশ্রেণীর দিকে চলল রায়ান। সিংহের চিহ্ন বিশ্লেষণ করে সে নিশ্চিত হয়েছে, ওখানেই কোথাও গালকাটার আবাসস্থল। মাঝে মাঝে এসে আক্রমণ শানিয়ে আবার নিজের ডেরায় ফিরে যায় গালকাটা। ভারী রাইফেলটা কোলের উপর ফেলে রেখেছে রায়ান। গানকাইটে সিস্ত্রগান উপযুক্ত হলেও, সিংহ মারতে রাইফেলের জুড়ি নেই। ঘন্টাব্যবধি ঘোড়া ছোটানোর পর খোলা আকাশের নীচে রক্ষ প্রান্তরে চলে এল রায়ান। গালকাটার চিহ্ন অনুসরণ করে দ্রুত পথ চলছে সে। মাঝে মাঝে টাকের সঙ্গে আপনমনে কথা বলছে। ঘোড়াটাও বুঝদারের মত কান খাড়া করে শুনেছে কথা, যেন সবই বুঝতে পারছে।

এরই মাঝে সূর্য উঠে এল মাথার উপর।

পূর্ণ তেজে আশুন ঢালছে অক্লান্তভাবে। নাকে মুখে জ্বালা ধরানো বাতাসে, রীতিমত হাঁপ ধরার উপক্রম। একে সূর্যের উত্তাপ, তার উপর বালির গরমে একেবারে নরক হয়ে উঠল যেন ট্রেইল। সামনের পাহাড়শ্রেণী থেকে উড়ে আসা বালির চাদরের জন্য দম নেয়া রীতিমত কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়াল। শেষমেশ উপায়ান্তর না দেখে, ট্রেইলের পাশের একটা ঝোপঘেরা ক্রীকের পাশে ঘোড়া থামাতে বাধ্য হলো রায়ান। ক্রীকের স্বচ্ছ নির্মল জলে হাতমুখ ধুয়ে নিল। আকণ্ঠ পান করার পর, ক্যান্টিনেও ভরে নিল। টাফও পানি খেয়ে নিল প্রাণভরে।

এদিক ওদিক তাকাতেই হঠাৎ একটা পরিত্যক্ত ক্যাম্প আবিষ্কার করল রায়ান। মূল ট্রেইলের খানিকটা ভিতরের দিকে ক্রীকের পাড়ে করা হয়েছিল ক্যাম্প। মাটি চাপা দেয়া হয়েছে পুড়ে যাওয়া কাঠকয়লাগুলো। এখানে ওখানে ইতস্ততভাবে ছড়ানো আছে বুটের ছাপ আর সিগারেটের টুকরো। একজন মানুষ, কয়েক ঘণ্টা ছিল এখানে, গত রাতটা কাটিয়েছে।

মুখ তুলে তাকাল রায়ান। ক্যাম্পের পিছন দিকে বনের মধ্য দিয়ে একটা সরু ট্রেইল দেখা যাচ্ছে। ওস্ত উলফ পর্বতশ্রেণীর দিকেই গেছে ওটা। লোকটা এই পথেই এগিয়ে গেছে সামনের দিকে। সিংহের ভয় নেই তার? নাকি মানুষকেটার কথা জানা নেই। রায়ানের চেয়ে বড়জোর ঘণ্টা দু'য়েক এগিয়ে আছে সে। রায়ানও মূল ট্রেইল ছেড়ে বুনা পথের সেই অচেনা ট্রেইল ধরেই সামনে এগুনো শুরু করল।

সামনের লোকটাকে ট্র্যাক করা খুবই সহজ হলো রায়ানের জন্য। নরম বালিতে স্পষ্ট ছাপ রেখে গেছে লোকটার ঘোড়া। ট্র্যাক লুকানোর ক্ষেত্রে হয় লোকটা ভীষণ আনাড়ি, নয়তো চরম উদাসীন। পিছনের কাউকে ফাঁকি দেয়ার সামান্যতম চেষ্টাও লক্ষ্য করা গেল না তার মধ্যে!

ট্রেইলটা সোজা চলে গেছে পর্বতের পাদদেশে অনুচ্চ পাহাড়শ্রেণীর সমতল মাথার উপর দিয়ে। ঘণ্টা দু'য়েক অবিরাম ঘোড়া ছুটিয়ে একটা বিশাল লাল শিলাখণ্ডের কাছে

এসে থামল রায়ান। এর একটু সামনেই কিছু ঝোপের আড়ালে ডান দিকে বেকে গেছে ট্রেইলটা। লোকটার খুব কাছাকাছি এসে গেছে রায়ান, তাই এখন খুব সাবধানে এগোচ্ছে। অসাবধানতায় অ্যামবুশে প্রাণ দেয়ার কোন ইচ্ছে নেই তার।

রেকাবে দাঁড়িয়ে চারপাশটা ভাল করে জরিপ করতে লাগল রায়ান। অকস্মাৎ সামনের একটা গ্রীজউডের ঝোপ থেকে সবগে ডানা ঝাপটে উড়ে গেল গোটা কয়েক বাজার্ড। ডানায় ভেসে কর্কশ কণ্ঠে ডাকাডাকি করতে লাগল ওরা। চকিতে সতর্ক হয়ে গেল রায়ান। সিংহটা নয়তো?

হাত বাড়িয়ে রাইফেলটা তুলে নিল সে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে রইল। সেই সাথে খেয়াল রাখছে টাফের আচরণের দিকে। জানে, গালকাটা আশপাশে থাকলে, তার চেয়ে অনেক আগে সেটা টের পাবে ঘোড়াটা। তবে টাফ শান্ত রয়েছে, কোনরকম চঞ্চলতা দেখা গেল না তার মধ্যে।

স্যাডল থেকে নেমে পা টিপে ঝোপটার দিকে এগিয়ে গেল রায়ান। দৃঢ় মুষ্টিতে সামনে বাগিয়ে রেখেছে রাইফেলটা। সত্তর্পণে বাম হাত দিয়ে কয়েকটা কাঁটা ঝোপের ডাল সরাতেই চোখে পড়ল লোকটাকে!

এদিকে পিছন ফিরে রয়েছে। একটা কটনউড গাছের গুঁড়িতে পিঠ ঠেকিয়ে বসে, একমনে গরুর শুকনো জার্কি চিবোচ্ছে। পাশেই একটা নিচু ঘেসো জমিতে চরছে তার ঘোড়াটা। ধীরে-ধীরে লোকটার দিকে এগিয়ে গেল রায়ান। একেবারে পিছনে পৌঁছে মাথায় রাইফেল ঠেকিয়ে, শীতল গলায় বলল, 'একদম নড়বে না। স্থির হয়ে থাকো।'

বলার অবশ্য প্রয়োজন ছিল না। মাথায় বন্দুকের নল ঠেকতেই একেবারে জায়গায় জমে গেছে লোকটা। যেন বুঝতে পারছে, শিয়রে যমদূত উপস্থিত, মৃত্যু এখন কেবল সময়ের ব্যাপার মাত্র! লোকটাকে সার্চ করে একটা ছয়গুলির রিপিটার, গানবেল্ট আর একটা হাষ্টিং নাইফ পাওয়া গেল। পকেটে পাওয়া গেল কিছু খুচরো পয়সা আর একটা লাল রুমাল।

জিনিসগুলো সরিয়ে একটু দূরে লোকটার মুখোমুখি ঘাসের উপর বসল রায়ান। রাইফেল ধরা রইল হাতে, সামান্যতম বেচাল দেখলেই নির্দিধায় গুলি করবে। তারপর ভাল করে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল সামনে বসা বন্দিকে।

লোক না বলে, ছেলে বলাই যুক্তিসঙ্গত। বয়স বড়জোর সতেরো আঠারো হবে। নাকের নীচে গৌফের রেখা তেমন ঘন নয়। দু'চোখের চাহনি কেমন যেন নিষ্পাপ, জগতের পাপ-পঙ্কিলতা দেখার অভিজ্ঞতা খুব একটা নেই বোধহয়। দেহের গড়নও তেমন একটা মজবুত নয়। জোরাল কোন মরু ঝড়ে উড়ে যাবে না, এ নিশ্চয়তা দেয়া সম্ভব নয় কোনমতেই!

‘কী নাম তোমার?’

‘ডাস্টি ফগ,’ মৃদুস্বরে জবাব দিল ছেলেটা।

সাথে সাথেই চোখের তারা জ্বলে উঠল রায়ানের। দেখতে যেমনই লাগুক না কেন, এই ছেলের বিরুদ্ধেই ছয়জন মানুষ হত্যা করে একতাল সোনা নিয়ে চম্পট দেয়ার অভিযোগ রয়েছে। এই নিষ্পাপ চেহারার আড়ালেই হয়েছে লুকিয়ে আছে কোন এক ভয়ঙ্কর খুনি! কিন্তু সোনার প্যাকেটটা কোথায়? স্যাডল ব্যাগে কিংবা ছেলেটার সাথে তো নেই ওটা! পথে অন্য কোথাও লুকিয়ে ফেলেছে?

‘আচ্ছা, তুমিই তা হলে স্টেজ ডাকাতির মূল হোতা! যে সবাইকে খুন করে পালিয়েছে? শীতল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল রায়ান। পলকেই ফগের চেহারা বিঘাদের চাদর নেমে এল। চোখ দুটোয় যেন রাজ্যের বিষনুতা!

কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলল, ‘পালিয়েছি ঠিকই, তবে আমি কাউকে খুন করিনি। বরঞ্চ ধরতে পারলে আমাকেই ওরা খুন করত।’

‘মানে? কারা?’ ভয়ানক চমকে উঠল রায়ান।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল ফগ। তারপর মৃদুস্বরে তার কাহিনি বর্ণনা করতে লাগল রায়ানের কাছে।

জানা গেল, স্টেজ কোচ ইয়েলো স্প্রিং-এর কাছে আসতেই হামলা করে ভ্যান গগের ডাকাত দল! তরুরা আগে থেকেই ডাভ পাসের ঢালে লুকিয়ে ছিল। তাই ড্রাইভার আগে

থেকে ঘৃণাক্ষরেও কিছু টের পায়নি। একে একে সবাইকে গুলি করতে লাগল ওরা নির্বিচারে। তাদের কুকীর্তির কোন সাক্ষী রাখতে অভ্যস্ত নয় ওরা। এ দৃশ্য দেখে ভয়েই অচেতন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিল ফগ। বেশ কিছুক্ষণ সংজ্ঞাহীন ছিল। মৃত ভেবেই হয়তো তার দিকে তেমন নজর দেয়নি লুটেরার দল। তারা তখন লুটের মাল আহরণে ব্যস্ত। চেতনা ফিরে পেয়েই কাছের ঘোড়াটার পিঠে চেপে জঙ্গলে ঢুকে পড়ে ফগ। ডাকাতরা যতক্ষণ তাকে দেখতে পায়, ততক্ষণ সে পগার পার। তবুও তারা কিছুদূর পিছু ধাওয়া করেছিল তাকে। ঠিক তখনই একটা ঝড় আসে আর ডাকাতদের হাত থেকে মুক্তি পায় ও। তার দু’দিন পর সিলভার সিটিতে ফিরে গিয়েছিল ও। তবে ভোরবেলায় শহরে ঢোকার মুখে এক ভবঘুরের মুখে জানতে পারে, স্টেজ কোচ ডাকাতির জন্য তাকেই দায়ী করা হচ্ছে! তার মাথার মূল্য নির্ধারণ করে হলিয়া জারি করা হয়েছে! তাই প্রাণভয়ে আবারও ফিরে আসে ডাস্টি। কিন্তু ভাগ্যের লিখন, না যায় খণ্ডন। তাই এখন সে বসে আছে পশ্চিমের দুর্ধর্ষ বাউন্টি হান্টার, লায়ন রায়ানের সামনে। কথা শেষে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল সে। কান্নার দমকে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল তার পিঠ।

ডাস্টি ফগের প্রতিটি কথা মন দিয়ে শুনেছে রায়ান। এবং বিশ্বাসও করেছে। কারণ প্রাপ্ত প্রমাণাদি পর্যালোচনা এবং বিচার বুদ্ধি দিয়ে স্বল্প বিশ্লেষণ করে দেখলে ছেলেটার কথায় সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। তা ছাড়া আউট-ল ভ্যান গগ এবং তার দল এখন এদিকটায়, এরকম একটা উড়ো খবর আগেই রায়ানের কানে এসেছিল। যদিও সিলভার সিটির কেউ এখনও ব্যাপারটা জানে না। ভ্যান গগের আসল নাম জানা নেই কারও, নিজেই এই নামেই পরিচয় দিতে পছন্দ করে সে।

ছেলেটাকে কোন সান্দ্রনা দিল না রায়ান। নিজের মত কাঁদতে দিল। এভাবে হেঁচট খেতে খেতেই রক্ষ পশ্চিমে সে ছেলেমানুষ থেকে পুরুষ হয়ে উঠবে। নিজেই রক্ষা করার যোগ্যতা তার নিজেই অর্জন করে নিতে হবে। একসময় চোখের সামনে যমদূতকে

দেখলেও আর একফোঁটা অশ্রু ঝরবে না চোখে! এটা পশ্চিম, ভীষণ রকম ক্রুদ্ধ, বুনো। পূর্বের মানুষের মত আবেগে আপ্ত হবার সুযোগ এখানে বড় কম!

খানিকক্ষণ পর, ফগকে অবাধ করে দিয়ে তার সবকিছু তাকে ফেরত দিল রায়ান। এটুকুতেই সে বুঝে নিল, সামনের কঠোর চেহারার আগন্তুক তার কথা বিশ্বাস করেছে। চোখ মুছে, ভূবন ভুলানো হাসিতে মন ভরিয়ে দিল সে রায়ানের। আরও নিশ্চিত হলো রায়ান, ছেলেটা সত্যিই ভাল।

স্যাডল ব্যাগ থেকে কফি তৈরির জিনিসপত্র বের করে দু'জনের জন্য কফি চড়াল রায়ান। তারপর কফি খেতে খেতে গালকাটার কথা তুলল।

‘কাল রাতে কোন সিংহের গর্জন শুনেছ?’
‘হ্যাঁ। ওই মেসারটার ওপারে কোথাও একটা সিংহ কয়েকবার ডেকেছিল।’ স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল ফগ। তার জানা নেই, গালকাটা মানুষখেকো!

কফি শেষ হতে হতে গালকাটার কীর্তি জানা হয়ে গেল ফগের। শুনতে শুনতে ভয়ে তার চোখ-মুখ শুকিয়ে গেল পুরোপুরি। কাল রাতে একই এলাকায় ছিল সে আর মানুষখেকোটা! শুধুমাত্র ঈশ্বরের দয়াতেই এখনও বেঁচে আছে ও! পশ্চিমের পাহাড়গুলোর মাধ্যমে নেমে এসেছে টকটকে লাল সূর্য। গোখূন্টির ধমধমে পরিবেশে নিস্তব্ধ হয়ে আছে গোটা পৃথিবী। দ্রুত ঘনিয়ে আসছে আঁধার। একটু পরই ঝপ করে নেমে আসবে ঘন কালো আঁধারের চাদর।

একটা মেসার উপর রাত কাটাতে বলে স্থির করল রায়ান। সমতল থেকে ঝাড়া পঁচিশ ফুটের মত উঁচু জায়গাটা। প্রান্তে রয়েছে একটা রিম-রক। সমতল মেসারটি মেসকিট আর মেড্রোনে দিয়ে ঘেরা। দু’পাশে উঁচু শৈলশ্রেণী ঘেরা বোন্ডারের আড়াল রয়েছে। তাই ওদিকগুলো নিরাপদ। রিম-রকের নীচে মেসকিট, ক্যাটস-ক্রু আর বুনো সেজ বোপের লতাপাতার এক বিশাল জঞ্জাল। তারও নীচে রয়েছে একটা চমৎকার ওয়াটারহোল।

জায়গাটা সুন্দর। বাদামী স্বচ্ছ পানি

জলাশয়ের। তিন-চারটে ছোট জুনিপারের বোপ দিয়ে ঘেরা। একদিকে বিশাল দুটো বোন্ডারের মাঝ দিয়ে প্রশান্ত একটা ক্যাটল ট্রেইল এসে মিলেছে পানিতে।

ওয়াটারহোলের পাড়ে গালকাটার পায়ে ছাপ দেবেছে রায়ান। কাল রাতেও এখানে পানি খেতে এসেছিল ওটা। ভাগ্য ভাল হলে আজ রাতেও আসবে। আর যদি আসে মেসার উপরে মানুষের উপস্থিতি নিঃসন্দেহে নজর কাড়বে তার!

এসব পাহাড়ি এলাকায় সচরাচর মানুষের পা পড়ে না বলে শুকনো কাঠের অভাব হয় না কখনও। তাই সারারাত জ্বালানোর মত কাঠ জোগাড় করতে খুব একটা সময় লাগল না ওদের। বেশ বড় করে অগ্নিকুণ্ড জ্বালানো হলো। তারপর গরুর শুকনো জার্কি দিয়েই ঝটপট রাতের খাবার সেরে নিল ওরা। তারপর একটা বড় পাথরের আড়ালে আত্মগোপন করে পাহারায় বসল। ফগ চোখ রাখছে নীচের জলাশয়ের দিকে আর রায়ান চোখ রাখছে মেসার উঠে আসা প্রবেশ পথের দিকে।

রাত বাড়তে লাগল। সময় যেন খুব ধীরে গড়িয়ে চলছে। নীচের জলাশয়ে জানা-অজানা অসংখ্য জানোয়ার সাবধানী ভঙ্গিতে এসে পানি খেয়ে যেতে লাগল। তবে গালকাটার দেখা নেই!

বসে থেকে থেকে অস্থির হয়ে উঠল ফগ। তবে রায়ানের মধ্যে কোন অস্থিরতা নেই। স্থির অচঞ্চল নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে।

অবশেষে ধৈর্যের ফল মিলল। কাছেই কোথাও গর্জন করে উঠল পশুরাজ। মুহূর্তেই আশপাশের সমস্ত জানোয়ারের সব রকম শব্দ বেমালাম বন্ধ হয়ে গেল। পিনপতন নীরবতা নেমে এল চতুর্দিকে।

আসছে!
অস্থির হয়ে উঠল ঘোড়াগুলো। পারলে দড়ি ছিড়ে পালিয়ে যায়, এমন অবস্থা। শ্বাস বন্ধ করে ভয়ে কাঁঠ হয়ে বসে রইল ডাস্টি ফগ। পায়ে পিপড়া কামড়াচ্ছে সেদিকে জ্রফেপ নেই তার।

পরক্ষণেই প্রবেশ পথে দেখা দিল দুটো

জুলজুলে চোখ। আগুনের আলোর ছটায় ভাটার মত জ্বলছে ওগুলো। শক্তিশালী দুটো টর্চলাইট যেন! অস্থির হয়ে ভাবছে ফগ, গুলি করছে না কেন এখনও রায়ান? রাইফেলের রেঞ্জের মধ্যেই তো আছে সিংহটা!

এদিকে গুলি করার আগে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে চায় রায়ান এটা সেই মানুষকেটাই কিনা। অন্য কোন সাধারণ সিংহকে প্রাণে মারার ইচ্ছে নেই তার। ফাঁকা গুলি করে ভয় দেখিয়ে তাড়ালেই চলবে।

আরেকটু সামনে এগিয়ে এল পশুরাজ। এবার দেখা গেল মাথাভর্তি কুচকুচে কালো কেশর। ডান গালে বিশাল একটা দগদগে ক্ষত! রাইফেল তাক করল রায়ান। আর ঠিক তখনই তাদের দেখতে পেল গালকাটা।

সাথে-সাথে নিচু হয়ে পেট প্রায় মাটির সাথে মিশিয়ে ফেলল। লেজটা ধনুকের ছিলার মত টানটান হয়ে আছে। এখনই শিকারের উদ্দেশ্যে ঝাঁপ দেবে!

ঠিক তখনই গর্জে উঠল রায়ানের রাইফেল। পরপর দুটো গুলি করল সে, শোনালা একটার মতই। মুহূর্তেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ল গালকাটা!

সশব্দে নিঃশ্বাস ফেলল ডাস্টি ফগ। উভেজনার অবসাদে তার শরীর প্রায় ভেঙে আসছে। মৃদু হেসে উঠে দাঁড়াল রায়ান। সিংহটার কাছে গিয়ে ভালমত পরীক্ষা করল। মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েই আগুনের পাশে এসে কফি বানাতে বসল।

ফগ কিন্তু রায়ানের মত অতটা নিশ্চিত হতে পারল না। সে উঠে গিয়ে মৃত সিংহের শরীরে তার সিন্ধুগান খালি করল। বাধা দিল না রায়ান, মৃদু হাসল শুধু।

রাত আরও গভীর হলে বেডরোল বিছিয়ে দু'জনেই শুয়ে পড়ল। ঘুমের অতলে তলিয়ে যেতে সময় লাগল না। সারাদিন বডবড ধকল গেছে দু'জনেরই।

ভোর হলে দিনের আলোয় সিংহের লাশটা আবারও পরীক্ষা করল রায়ান। দুটো গুলিই কপালে একেবারে পাশাপাশি দু'চোখের মাঝামাঝি লেগেছে। এজন্যই সাথে-সাথে মারা গেছে ওটা। শরীরের অন্য কোথাও লাগলে এত তাড়াতাড়ি কাবু হত না। 'কোথাও যাবে বলে

ভাবছ?' ডাস্টিকে জিজ্ঞেস করল রায়ান।

চেহারা বিমর্ষ হয়ে গেল ফগের। মৃদুস্বরে বলল, 'দক্ষিণের সীমান্ত পেরিয়ে মেক্সিকো চলে যাব। এদেশে আর থাকার উপায় নেই আমার।'

চূপচাপ কিছুক্ষণ ভাবল রায়ান। তারপর বলল, 'দেশ ত্যাগ করার চেয়ে কিছুদিনের জন্য নাম পরিবর্তন করলে কেমন হয়?'

'মানে?'

'মানে হলো, ডাস্টি ফগ নামটা বাদ দিয়ে, কিছুদিন অন্য নামে, কোন একটা রানশে কাজ করো। এরমধ্যে আমি দেখি তোমার ব্যাপারটার কোন সমাধান করা যায় কিনা। সম্ভব হলে ভ্যান গগের দলকে পাকড়াও করারও চেষ্টা করব।'

ফগ যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেল। খুশিতে ঝলমল করে উঠল তার চোখ-মুখ। কিন্তু কী ভেবে, পরক্ষণেই আবার হাঁড়ির তলার মত কালো হয়ে গেল মুখ।

অস্ফুটে বলল, 'কিন্তু কে দেবে আমার কাজ?'

'দেবে একজন। আমি এক বুড়োকে চিনি, জেমস রাইনার। গোটা পশ্চিমের অন্যতম সেরা একটা বাখানের মালিক সে। "সার্কেল আর" রানশ। আমাকে চেনে সে, খুবই স্নেহ করে। একবার তার রানশে গিয়ে দু'দুটো সিংহ মেরে দিয়েছিলাম। তাকে গিয়ে আমার কথা বললেই তোমাকে চাকরি দেবে সে। তবে ভুলেও কাজে ফাঁকি দিয়ো না যেন। তা হলে পিটিয়ে পিঠের ছাল তুলে নেবে বুড়ো।'

আবারও মুখে হাসি ফিরে এল ডাস্টি ফগের। রায়ান তাকে 'সার্কেল আর' এ যাবার পথ বাতলে দিল। ছোট একখানা চিঠিও লিখে দিল, যেন ফগকে বিশ্বাস করে জেমস রাইনার।

ঘন্টাখানেক পর দুটো ঘোড়া দু'দিকে রওনা দিল। একটা ঘোড়ার পিছনে বাধা সিংহের মাথাটা, হাঁটার তালে তালে এদিক-ওদিক দুলছে। ঘোড়াটার নাম টাফ। আরোহীর নাম রায়ান, লায়ন রায়ান।

যার মন জুড়ে রয়েছে আউট-ল ভ্যান গগ।

মাইল পঞ্চাশেক দূরে, নিজের আস্তানায় বসা ভ্যান গগ অবশ্য সেটা জানতে পারল না!

মোবাইল ফোন ও ক্ষতিকর প্রভাব

সাফায়েত আহমদ চৌধুরী

বেশিরভাগ মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীই জানেন না,

মোবাইল ফোন কীভাবে মানব দেহের

উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে।

বি

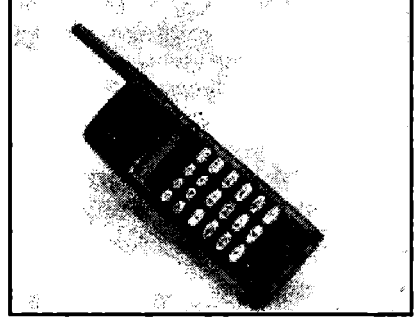
শব্দ্যাপী প্রতিদিন লক্ষ-লক্ষ মানুষ মোবাইল ফোন (মুঠো ফোন)কে যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করছেন। কিন্তু বেশিরভাগ মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীই জানেন না, মোবাইল ফোন কীভাবে মানব দেহের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। মোবাইল ফোন ব্যবহারের বিরূপ স্বাস্থ্য ঝুঁকি রয়েছে।

বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন গবেষণায় জানিয়েছেন, মোবাইল ফোন এবং মোবাইল যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত বেইজ স্টেশন থেকে (BTS: Base Transceiver Station) থেকে যে তরঙ্গ বিকিরণ (Radio Frequency Radiation) হচ্ছে। মোবাইল ফোন এবং ব্যবহৃত বেইজ স্টেশন থেকে যে তরঙ্গ বিকিরণের ফলে মানব স্বাস্থ্যের উপর যে প্রতিক্রিয়া ও সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে, তার কিছু কারণ চিহ্নিত করেছেন তাঁরা:

মাথা ধরা, কানে কম শোনা, দৃষ্টিভ্রম, স্বল্পকালীন স্মৃতি বিভ্রাট, অনিদ্রা, অনুভূতি নষ্ট হওয়া, ক্লান্তি বা অবসাদ লাগা, উদ্ভিগ্ন হওয়া ইত্যাদি।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO), মোবাইল ফোনে ব্যবহৃত তরঙ্গ এবং মোবাইল ফোন থেকে উৎপাদিত শক্তিকে কিছু রোগ ও রোগের লক্ষণ সৃষ্টিতে সহায়ক হিসাবে চিহ্নিত করেছে:

- ১। Alzheimer's Disease.
- ২। Heart Disease.
- ২। Anxiety.
- ২। Kidney Damage.
- ৩। Birth defects.
- ৪। Cancers.
- ৫। Brain Cancers and Tumors.



৬। Memory Loss.

৭। Hair Loss.

৮। Blood Pressure Increase.

৯। Chronic Fatigue.

১০। Depression.

১১। Hallucination.

১২। Eye and Ear Discomfort

and pain.

১৩। Sleep Disorders.

১৪। Facial Rashes and

Swelling.

১৫। Headaches.

১৬। Chronic Stress.

দীর্ঘস্থায়ী মোবাইল ফোন ব্যবহারের

বিশেষ ঝুঁকি:

কিছু গবেষণায় জানা গেছে, যারা চার বছর বা তার অধিক সময় থেকে মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন, তাঁদের ক্ষেত্রে তিনটি স্বাস্থ্য ঝুঁকি রয়েছে:

* Decreased Male Fertility.

* Increased Cancer Risk.

* Behavioral Problems in Children.

মোবাইল ফোন ব্যবহারের স্বাস্থ্য ঝুঁকির উপর ২০০৭ সালে বাংলাদেশের একটি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়-এর ক'জন ছাত্রের গবেষণার অংশ হিসাবে একটি জরিপ পরিচালিত হয়। জরিপটি দেশের বিভিন্ন শহরে প্রায় আট (৮) হাজার বিভিন্ন পেশার মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর উপর পরিচালিত হয়। জরিপটির কিছু আংশিক তথ্য তুলে ধরা হলো:

Number of Mobile User		Main impact on Health (Due to their comment)
2050	1150	Headaches, Sleep disorder, Hair Loss, Memory Loss
	350	Memory Loss, Headaches, Eye and ear discomfort and pain
	300	Depression, Burning sensation, Headaches
	250	No effect on health

Table: Surveying Report on Mobile User

বিশ্বব্যাপী জনসাধারণকে এ বিষয়ে সচেতন করার জন্যে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গবেষণা পরিচালিত হয়ে আসছে। আমাদের দেশে যারা মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন, তাঁদের মধ্যে বেশিরভাগেরই মোবাইল ফোন ব্যবহারের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে কোনও জ্ঞান নেই বললেই চলে। যার ফলে মোবাইল ফোনের বিকিরণে নীরবে অনেকেই আক্রান্ত হচ্ছেন এবং ঝুঁকির মধ্যে আছেন।

তাই মোবাইল ফোন ব্যবহারে আমাদেরকে একটু সতর্ক হতে হবে। অন্তত: স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে।

তথ্য সূত্র: বিভিন্ন গুয়েবসাইট অবলম্বনে।

আত্মউন্নয়ন

বয়স

মোঃ শাহাবুদ্দিন নাহিদ

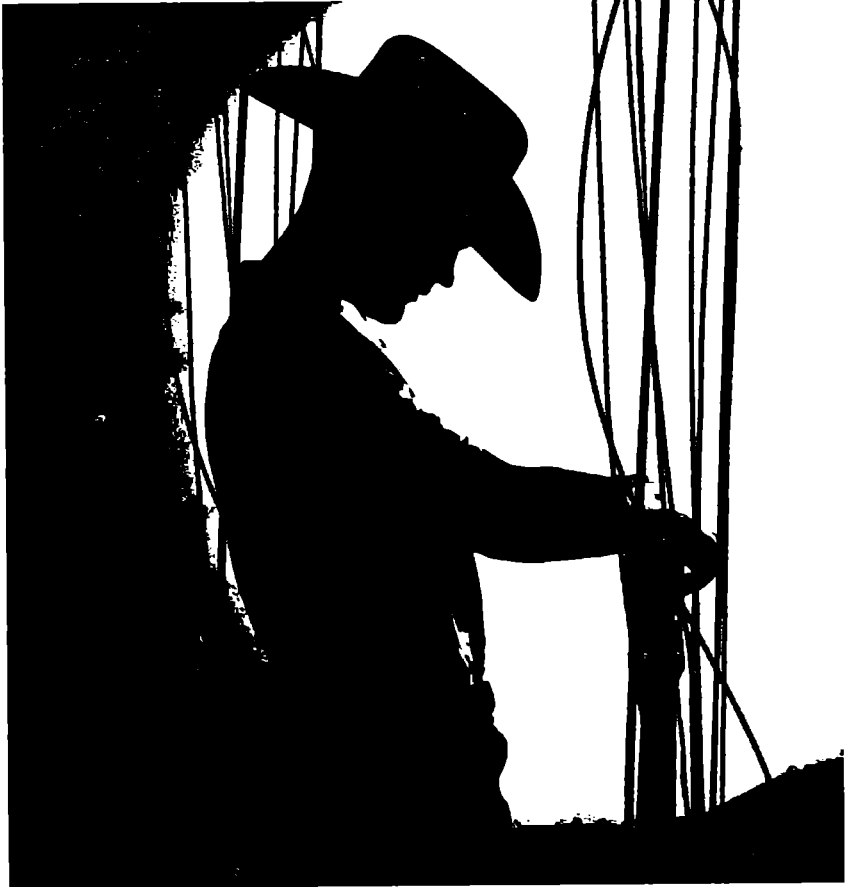
যখন আমরা দেখতে পাই যে, আমাদের বিপদে কেউ এগিয়ে আসছে,
তখন আমরা বুঝতে পারি আমরা আসলে কারও কাছ থেকে আলাদা নই।

জনপ্রিয় মার্কিন কথাসাহিত্যিক জর্জ সগারস যুক্তরাষ্ট্রের সিরাকুজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৩ সালের সমাবর্তনে তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন, ‘একটা মজার জিনিস হলো, মানুষ স্বাভাবিকভাবেই বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এক সময় ক্ষমাশীল হয়ে ওঠে। এটাই হয়তো মানুষের বৈশিষ্ট্য। আমরা যত বেড়ে উঠি, আমরা আসলে বুঝতে পারি স্বার্থপর হওয়া সত্যিই কতটা অর্থহীন। বয়স বাড়ার সাথে সাথে আমাদের ভাবনার পরিবর্তন হতে থাকে, এবং মানুষকে ভালবাসতে শিখি। যখন আমরা দেখতে পাই যে, আমাদের বিপদে কেউ এগিয়ে আসছে, তখন আমরা বুঝতে পারি আমরা আসলে কারও কাছ থেকে আলাদা নই। আমরা যখন দেখি, আমাদের প্রিয় মানুষরা একে একে পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছে, কেবল মাত্র তখনই আমরা বিশ্বাস করি একদিন আমরাও বিদায় নেব! প্রায় সব মানুষই তার শেষ দিনগুলোয় অনেক বেশি ভাল আর উদার হয়ে ওঠে।’

রহস্য উপন্যাসিকা
এরকুল পোয়ারো কাহিনি

মৃত্যুঘণ্টা

মূল ■ আগাথা ক্রিস্টি
রূপান্তর ■ ইসমাইল আরমান



বেডরুম থেকে বেরিয়ে ক্ষণিকের জন্য দরজার সামনের ল্যান্ডিংয়ে দাঁড়াল জোওন অ্যাশবি। উল্টো ঘুরে যে-ই না কামরায় ঢুকতে যাবে, ঠিক তখনই... যেন পায়ের তলায়... গুরুগম্ভীর আওয়াজে ডিনারের ঘণ্টা বেজে উঠল। তড়িঘড়ি করে ছুটে গুরু করল মেয়েটা, সিঁড়ির মুখে পৌঁছতেই ধাক্কা খেলো উল্টো দিক থেকে আসা এক যুবকের সঙ্গে।

‘আরে জোওন! কী ব্যাপার, এত তাড়া কীসের?’

‘দুঃখিত, হ্যারি। আমি তোমাকে দেখতে পাইনি।’

‘তা তো আমিও বুঝতে পারছি,’ হালকা গলায় বলল হ্যারি ডেলহাউস। ‘কিন্তু ছুটছে কেন?’

হ্যারি। ‘এর জন্যে তোমার চাকরি যেতে পারে, তা জানো?’

মুচকি হাসল বাটলার। ‘আজ দশ মিনিট দেরিতে ডিনার পরিবেশন করা হবে, স্যার। কর্তার হুকুম।’

‘এ তো ভারি অস্বাভাবিক!’ হুকুম কোঁচকাল হ্যারি। ‘মামা হঠাৎ এমন হুকুম দিলেন কেন?’

‘সাতটার ট্রেন, স্যার। আজ ওটা আধঘণ্টা দেরিতে পৌঁছবে। সেজন্যেই...’

কথা শেষ হলো না বাটলারের, তার আগেই ঠাস করে চাবুকের মত একটা আওয়াজ ভেসে এল।

‘এ কী!’ বিভ্রিবিড় করে উঠল হ্যারি। ‘এ তো গুলির আওয়াজ!’

বামদিকের ড্রইংরুম থেকে আরেক যুবক

‘পুলিশের মতে, মসিয়ো হিউবার্ট লিচামের মৃত্যুরহস্য চূকেবুকে গেছে।

কিন্তু আমি, এরকুল পোয়ারো বলছি... ঘটনা তা নয়।’

‘ঘণ্টার আওয়াজ শুনলাম তো।’

‘সে তো প্রথম ঘণ্টা।’

‘উই, দ্বিতীয়। আগেও একবার বেজেছে... আমি শুনেছি।’

‘তুল শুনেছ। এটাই প্রথম।’

‘না, দ্বিতীয়।’

তর্ক করতে করতে নীচতলার হলে নেমে এল দুজনে। ঘণ্টা বাজানোর লাঠিটা জায়গামত রেখে বাড়ির বাটলার বিনীত ভঙ্গিমায়ে এগিয়ে এল ওদের দিকে।

‘ওটা দ্বিতীয় ঘণ্টা!’ জোর গলায় বলল জোওন। ‘কোনও সন্দেহ নেই। বিশ্বাস না হলে ঘড়ির দিকে তাকাও।’

গ্র্যাণ্ডফাদার ক্লকের দিকে চকিতে নজর বোলাল হ্যারি। পরক্ষণে বিব্রত চেহারা করল সে। ‘আটটা বেজে বারো মিনিট! তা হলে দ্বিতীয় ঘণ্টাই হবার কথা। কী আশ্চর্য, আমি প্রথমটা শুনেতেই পাইনি।’ বাটলারের দিকে ফিরল, ‘ডিগবি, এইমাত্র কি প্রথম না দ্বিতীয় ঘণ্টা বাজল?’

‘প্রথম, স্যার।’

‘এত দেরিতে?’ চোখ কপালে তুলল

বেরিয়ে এসেছে। পয়ত্রিশের মত বয়স, সুদর্শন। ওদের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, ‘আওয়াজটা কীসের হলো বলতে পারো? গুলি নাকি?’

‘আমার মনে হয় গাড়ির ইঞ্জিনের ব্যাকফায়ার, স্যার,’ বলে উঠল বাটলার। ‘বাড়ির কাছেই রাস্তা, উপরতলার জানালাগুলোও সবসময় খোলা থাকে।’

‘আমার তা মনে হয় না,’ সন্দেহ প্রকাশ করল জোওন। ‘শব্দ তা হলে ওদিক থেকে আসত...’ ডানদিকে ইশারা করল ও। ‘কিন্তু এসেছে এদিক থেকে।’ এবার বামদিক দেখাল ও।

দ্বিতীয় যুবক এবার মাথা নাড়ল। ‘উই। এদিকে ড্রইংরুম। আমি ভিতরেই ছিলাম। আমার কাছে মনে হয়েছে শব্দটা এসেছে ওদিক থেকে।’ স্টাডির দরজা আর ডিনারের ঘণ্টার দিকে ইঙ্গিত করল সে।

হেসে উঠল হ্যারি। ‘বাহ... পূর্ব, পশ্চিম আর দক্ষিণ? আরেকটা দিক আর বাকি থাকে কেন, কিন? আমি বলব উত্তর... মানে শব্দটা এসেছে আমাদের পিছন থেকে।’

‘দেখো গিয়ে... কেউ হয়তো কাউকে খুন করছে!’ রসিকতা করল জেফরি কিন। হাসছে। ‘গুলির সঙ্গে খুনের সম্পর্ক থাকে।’ জোওনকে নড়ে উঠতে দেখে সেদিকে তাকাল। ‘আপনাকে আবার ভড়কে দিলাম নাকি, মিস অ্যাশবি?’

‘না, না, তেমন কিছু না। হঠাৎ খুনের কথা বললেন তো, তাই কেঁপে উঠেছি।’

‘খুন? বেড়ে বলেছ বটে,’ হ্যারি বলল। ‘কিন্তু দুর্গমিত, চিক্কার শুনিনি আমরা, রক্তও দেখতে পাচ্ছি না। কেউ খরগোশ শিকার করছে হয়তো। তেমনটা হবার সম্ভাবনাই বেশি।’

‘বড্ড সাদামাঠা ব্যাখ্যা,’ বলল কিন। ‘তা-ই সই। এসো, সবাই ড্রইংরুমে এসো।’

‘ভাগ্যিস দেরি হয়নি,’ জোওন বলল। ‘দ্বিতীয় ঘণ্টা বেজে গেছে ভেবে কী ছুটই না লাগিয়েছিলাম!’

হাসতে হাসতে ড্রইংরুমে ঢুকে পড়ল সবাই।

ঘটনাস্থল: লিচাম কোজ-ইংল্যান্ডের বিখ্যাত প্রাচীন বাড়িগুলোর একটি। মালিকের নাম হিউবার্ট লিচাম। বৃদ্ধ মানুষ, খান্দানি লিচাম বংশের শেষ প্রতিভা। লোকে তাকে আড়ালে-আবডালে পাগলা বুড়া বলে ডাকে। সেটা একটু বাড়াবাড়ি হলেও একেবারে মিথ্যে নয়। মানুষটি অত্যন্ত খামখেয়ালি স্বভাবের। প্রতিভাবান বাদ্যশিল্পী, সেইসঙ্গে বড্ড রগচটা তিনি। নানা ধরনের বাতিক আছে, সেগুলোর বিষয়ে বিন্দুমাত্র ছাড় দেন না। এ-বাড়িতে যারা আসে, হিউবার্টের মন জুগিয়ে চলতে হয় তাদের। অন্যথায় ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবেন, আর কোনোদিন চৌকাঠ মাড়াতে দেবেন না।

বাতিকের তালিকায় প্রথমই আছে তাঁর সঙ্গীত। অতিথিদের বাজিয়ে শোনাতে কোনও আপত্তি নেই, কিন্তু শর্ত হলো পিনপতন নীরবতা বজায় রাখতে হবে তাঁর বাদ্য চলাকালীন সময়ে। সামান্যতম ফিসফিস, কাপড়ের খসখসানি, কিংবা মৃদু নড়াচড়াও চলেবে না। তেমন কিছু হলে রেগে অগ্নিমূর্তি ধারণ করবেন তিনি, তৎক্ষণাৎ অপমান করে

তাড়িয়ে দেবেন অতিথিকে, আর কখনও এ-বাড়ির চেহারা দেখবে না সে।

আরেকটি বাতিক হলো সময়ানুবর্তিতা। তবে সেটা শুধু ডিনারের সময়। এ-বাড়িতে যে-যখন খুশি ব্রেকফাস্ট করতে পারে, বেলা বারোটো হলেও ক্ষতি নেই। লাঞ্ছন্য বেলাতেও একই কথা খাটে। ঠাণ্ডা মাংস আর স্টু পরিবেশন করা হয় দুপুরবেলায়। সেটা কে কখন খেল, বা আদৌ খেল কি না, তা নিয়ে মাথা ঘামান না হিউবার্ট। কিন্তু রাতের ডিনার তাঁর বিচারে রীতিমত এক পরম-আরাধ্য অনুষ্ঠান... একটা উৎসব! সে-খাবার রান্না করে নামকরা এক বাবুর্চি, বিরাট এক হোটেল থেকে তাকে ঈর্ষণীয় বেতনের বিনিময়ে ভাগিয়ে এনেছেন বৃদ্ধ।

সন্ধ্যা ঠিক আটটা পাঁচে বাজানো হয় প্রথম ঘণ্টা। সোয়া আটটায় বাজানো হয় দ্বিতীয়বার। ঘণ্টা শেষে খুলে যায় ডাইনিং রুমের দরজা, সমবেত অতিথিদের আমন্ত্রণ জানানো হয় ভিতরে। কেউ যদি ভবন হাজির না থাকে, তার কপালে খাবার জুটবে না... ভবিষ্যতেও না। চিরদিনের জন্য এ-বাড়িতে আসার অধিকার হারাবে সে।

এ-সব কারণেই আজ ঘণ্টা শুনে ছুট লাগিয়েছিল জোওন অ্যাশবি। হ্যারিও অবাক হয়েছে দেহিতে প্রথম ঘণ্টা বেজেছে বলে। লিচাম কোজে নিয়মিত আনাগোনা আছে ওর; তাই বুঝতে পারছে, আজকের এই ঘটনা অত্যন্ত অস্বাভাবিক। মামাকে আগে কোনোদিন নিয়মের ব্যত্যয় ঘটাতে দেখেনি।

হিউবার্টের সেক্রেটারি জেফরি কিনও দেরি দেখে বিস্মিত। ‘ভারি অবাক ব্যাপার তো। দশ মিনিট পরে ডিনার? আপনারা শিয়োর?’

‘ডিগবি তো তা-ই বলল,’ তাকে জানান হ্যারি।

‘কী যেন এক ট্রেনের কথা বলল,’ যোগ করল জোওন। ‘ওটার জন্যেই দেরি।’

‘ট্রেনের সঙ্গে ডিনারের কী সম্পর্ক?’ বিভ্রিবিড় করল কিন। ‘যাক গে, যখনকারটা তখন জানা যাবে। তবে ব্যাপারটা অদ্ভুত, এতে কোনও সন্দেহ নেই।’

নীরবতা নেমে এল কামরায়। নিজের অজান্তেই জোড়নের দিকে চেয়ে রইল দুই যুবক। আকর্ষণীয় মেয়ে সে। একহারা চমৎকার দেহ, মাথায় সোনালি কেশরাজি, চোখদুটো নীল, নিষ্পাপ চাহনি। এই প্রথম লিচাম ক্রোজে এসেছে ও, হ্যারির সঙ্গিনী হিসেবে।

কয়েক মুহূর্ত পর কামরায় প্রবেশ করল আরেকটি মেয়ে। ডায়ানা ক্লিভস-হিউবার্টের পালিতা কন্যা। বুনো একটা ভাব রয়েছে ডায়ানার মধ্যে। দৃষ্টিতে ধূর্ততা, জিভে বিষ। সহজেই যে-কোনও পুরুষকে সম্মোহিত করে ফেলতে পারে, এবং তখন তাদের দুরবস্থা দেখে সে রীতিমত মজা পায়। অদ্ভুত এক মেয়ে-বাহ্যিকভাবে মনে হবে অত্যন্ত উদার ও উষ্ণ; বাস্তবে তার ভিতরটা বরফের মত শীতল।

‘যাক, বুড়াকে অস্ত্র একটিবার হার মানাতে পারলাম,’ ডাইনিং রুমে ঢুকেই বলে উঠল সে। ‘আজ আর আগেভাগে এসে ঘড়ি ধরে বসে নেই লোকটা।’

ওর দিকে এগিয়ে গেল দুই যুবক। মৃদু হাসি হেসে দুজনকেই নীরব সম্ভাষণ জানাল মেয়েটা। ফিরল হ্যারির দিকে। কিনের গাল লাল হয়ে উঠল। হতাশ ভঙ্গিতে পিছিয়ে এল সে।

আর তখন ড্রইংরুমে ঢুকলেন হিউবার্টের স্ত্রী-মিসেস লিচাম। বেশ লম্বা তিনি, গায়ের রঙ শ্যামলা, মুখ দেখে সহজে মনের ভাব বোঝা যায় না। সবুজ রঙের একটা ঝালরঝলা পোশাক পরেছেন। তাঁর সঙ্গে রয়েছে মাঝবয়েসী এক ভদ্রলোক। পাখির ঠোঁটের মত ছুঁচালো নাক, চৌকো চোয়াল। শ্রেণির বারলিং-নামকরা ব্যবসায়ী। হিউবার্টের পুরনো বন্ধু।

ঢ-অ-ঙ!

দ্বিতীয়বারের মত বেজে উঠল ডিনারের ঘণ্টা। আওয়াজটা কমে এলে ডাইনিং রুমের দরজা খুলে উদয় হলো বাটলার ডিগবি। ঘোষণার সুরে বলল, ‘খাবার পরিবেশন করা হয়েছে।’

কথাটা বলেই থমকে গেল সে, বিস্ময়ে বড় হয়ে গেছে দু’চোখ। তার দীর্ঘ

চাকরিজীবনে এই প্রথম এক অদ্ভুত ঘটনা দেখছে-খাবারের ঘোষণা দেয়া হয়েছে, অথচ তার কর্তা অনুপস্থিত!

বিস্ময়টা বাকিদের ভিতরেও সংক্রামিত হয়েছে। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মিসেস লিচামের দিকে তাকাল সবাই, নার্ডাস হাসি হাসলেন তিনি। কিছু বলতে পারলেন না। এক ধরনের অনিশ্চয়তায় আক্রান্ত হলো অতিথিরা, মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। কী করবে বুঝতে পারছে না। এ-বাড়িতে এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়নি কেউ ইতিপূর্বে। কিছু করতে গেলে হিউবার্ট খেপে যান কি না, সে-ভয় তো রয়েছেই। অগত্যা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল সবাই। দেখা যাক বৃদ্ধ নিজেই হাজির হন কি না।

কয়েক মিনিট কেটে গেলে সশব্দে খুলে গেল ড্রইংরুমের দরজা। ছোটখাট গড়নের একটি মূর্তিকে দেখা গেল সেখানে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে গিয়েও থেমে যেতে হলো অতিথিদের। নবাগত মানুষটি এ-বাড়ির গৃহকর্তা নন, অন্য একজন। চেহারাসূত্রে মনে হচ্ছে বিদেশি, গোলগাল মাথায় মস্ত এক টোক, নাকের নীচে পাকানো গোঁফ। পরনে ইতালি সুট, তবে তা খুব দামি নয়।

‘মাফ করবেন, মাদাম,’ গৃহকর্তার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন ভদ্রলোক। ‘আমি বোধহয় একটু দেরি করে ফেলেছি...’

‘না, না,’ বোকা বোকা গলায় বললেন মিসেস লিচাম, ‘এ কোনও ব্যাপার নয়, মিস্টার...’

‘পোয়ারো, মাদাম। এরকুল পোয়ারো।’

পিছন থেকে কে যেন অস্ফুট আওয়াজে বিস্ময় প্রকাশ করল। নারীকণ্ঠ। সম্ভবত বিখ্যাত গোয়েন্দাটিকে চিনতে পেরেছে।

পোয়ারো বললেন, ‘আজ যে আমি আসব, সে-খবর জানতেন না আপনারা? মসিয়ো লিচাম বলেননি?’

ইতস্তত করে মিসেস লিচাম বললেন, ‘ইয়ে... হ্যাঁ, বলেছিল বোধহয়। কিছু মনে করবেন না, মসিয়ো পোয়ারো। আমি বড্ড আত্মভোলা, কিছুই মনে রাখতে পারি না। ডিগবি আছে বলে রক্ষে। ও-ই সবকিছু

দেখেনে রাখে।’

ঘড়ির দিকে তাকালেন পোয়ারো। ‘ট্রেনটা আজ দেরি করে ফেলেছে। লাইনে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল।’

‘ও! বলে উঠল জোওন। ‘তা হলে আপনার জন্যই ডিনার পিছিয়ে দেয়া হয়েছে।’

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন পোয়ারো। ‘সেটা কি অস্বাভাবিক?’

‘কী জানি...’ দ্বিধাস্থিত মনে হলো মিসেস লিচামকে, ‘আসলে... ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত। হিউবার্ট কখনোই এত দেরি করে না।’

‘উনি এখনও খেতে আসেননি?’

‘উঁহঁ। সে-কারণেই আমরা আরও বেশি অবাক হচ্ছি।’

‘ব্যাপার হলো কী,’ কথা জোগাল কিন, ‘সময়ের ব্যাপারে মি. লিচাম অতিমাত্রায় সচেতন। বিশেষ করে ডিনারে আজ পর্যন্ত কোনোদিন তাঁকে দেরি করতে দেখিনি আমরা।’

ভুরু কঁচকালেন পোয়ারো। কী ঘটছে বুঝতে পারছেন না-ডিনারের সময়সূচি নিয়ে সবার চোখেমুখে এত উদ্বেগ আর আতঙ্ক কেন!

সমস্যা সমাধানের ভঙ্গিতে মিসেস লিচাম বললেন, ‘একটু ধৈর্য ধরুন আপনারা। আমি দেখছি কী হয়েছে।’ ঘণ্টা বাজিয়ে বাটলারকে ডাকলেন তিনি। ‘ডিগবি, তোমার কর্তা কোথায়?’

‘মি. লিচাম আটটা বাজার পাঁচ মিনিট আগে নীচে নেমেছেন, ম্যাডাম, স্টাডিতে ঢুকেছেন।’

‘তা হলে আসছেন না কেন? ঘণ্টার আওয়াজ কি শুনতে পাননি?’

‘নিশ্চয়ই পেয়েছেন, ম্যাডাম। ঘণ্টাটা ঠিক স্টাডির দরজার উল্টোপাশে।’

‘তাও বটে... তাও বটে।’ বিড়বিড় করলেন মিসেস লিচাম। দ্বিধাদ্বন্দ্ব ভুগছেন, কিংকর্তব্য ঠিক করতে পারছেন না।

উপযাজকের মত ডিগবি বলল, ‘আপনি চাইলে আমি গিয়ে তাঁকে খবর দিতে পারি।’

‘হ্যাঁ... হ্যাঁ। ধন্যবাদ, ডিগবি। তা-ই করো।’

বাউ করে বেরিয়ে গেল বাটলার।

অতিথিদের দিকে ফিরে বিব্রত হাসি হাসলেন মিসেস লিচাম। বললেন, ‘দেখলেন অবস্থা? ডিগবি না থাকলে কী যে হতো আমার!’

কয়েক মিনিটের জন্য নীরবতা নেমে এল। অপেক্ষা করছে সবাই। একটু পরেই ফিরে এল ডিগবি। মৃদু হাঁপাচ্ছে, মনে হলো ছুটে এসেছে।

‘মাফ করবেন, ম্যাডাম। স্টাডির দরজা ভিতর থেকে বন্ধ।’

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল সবাই। বোঝা যাচ্ছে, এই ব্যাপারটাও অস্বাভাবিক। অনিশ্চয়তা দেখা দিল সমবেত অতিথিদের মাঝে।

আর চুপ করে থাকা সম্ভব বলে মনে হলো না পোয়ারোর কাছে। পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ নিজ হাতে তুলে নিতে বাধ্য হলেন। গলা ঝাঁকার দিয়ে বললেন, ‘এক্সকিউজ মি, আমাদের বোধহয় ওখানে গিয়ে ব্যাপারটা দেখে আসা দরকার।’

হলঘর থেকে বেরিয়ে এলেন পোয়ারো, পিছু পিছু বাকিরা। নিজের অজান্তেই বিদেশি মানুষটির নেতৃত্ব মেনে নিয়েছে সবাই। শুরুতে যতটা হাস্যকর দেখিয়েছিল তাঁকে, এখন আর তা দেখাচ্ছে। বরং ছোটখাট মানুষটির আচরণ লক্ষ করে সবাই বুঝে গেছে, ইনি যেন-তেন লোক নন। সহজাত নেতা, যে-কোনও সমস্যা মোকাবেলার ক্ষমতা রাখেন।

হলঘর হয়ে এগিয়ে চলল দলটা। গ্র্যাণ্ডফাদার ক্লক আর সিঁড়ি পেরিয়ে পৌছে গেল হলঘরের পিছনের অংশে, পেতলের ঘণ্টাটা যেখানে বসানো হয়েছে। ঘণ্টার ঠিক উল্টোপাশে স্টাডির বন্ধ দরজা।

এগিয়ে গিয়ে দরজায় টোকা দিলেন পোয়ারো-প্রথমে আস্তে, তারপর জোরে। ওপাশ থেকে কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন তিনি, চোখ রাখলেন চাবির ফুটোয়। পরক্ষণে ঝট করে উঠে দাঁড়ালেন। ফিরলেন সঙ্গীদের দিকে। উত্তেজিত গলায় বললেন, ‘দরজাটা ভাঙতে হবে... এক্ষণি!’

কেউ কোনও প্রশ্ন তুলল না। দলের মাঝে কিন আর বারলিং সবচেয়ে লম্বা-চওড়া, দুজনে

ঝাপিয়ে পড়ল দরজার উপরে। প্রথমে কিছুক্ষণ অনড় রইল ভারী পাল্লা-পুরনো আমলের ভারী দরজা, এমন নয় যে একটা-দুটো আঘাতে ভেঙে পড়বে-তবে উপর্যুপরি আঘাতের মুখে এক পর্যায়ে হার মানতে বাধ্য হলো। বিস্তীর্ণ শব্দ তুলে ভেঙে গেল তাল, হাট হয়ে খুলে গেল পাল্লাদুটো।

যেন বজ্রপাত হয়েছে... খোলা দরজার সামনে মূর্তির মত স্থবির হয়ে গেল অতিথিরা। অবচেতন মনের আশঙ্কা বাস্তবে পরিণত হয়েছে, মর্যাদিক একটা দৃশ্য ভেসে উঠেছে তাদের চোখের সামনে। ঘরের ভিতরে, বামদিকে, দরজা আর জানালার মাঝামাঝি জায়গায় দেখা যাচ্ছে একটা বিশাল লেখার টেবিল; ওটার পিছনে নয়, পাশে, একটা চেয়ারে এলিয়ে বসে আছেন বিশালদেহী একজন মানুষ। দর্শকদের দিকে পিঠ, মুখ জানালার দিকে... তবে তাঁর বসে থাকার ডঙ্গিই বলে দিচ্ছে কী ঘটছে। একটা হাত নিশ্চেজভাবে ঝুলছে, নীচের মেঝেতে পড়ে আছে একটি চকচকে পিস্তল।

ঝট করে বারলিঙের দিকে তাকালেন পোয়ারো। ‘মহিলাদের সরিয়ে নিয়ে যান। তাড়াতাড়ি!’

মাথা ঝাঁকিয়ে মিসেস লিচামের বাহ ধরলেন বারলিং, সঙ্গে সঙ্গে কঁপে উঠলেন ভদ্রমহিলা। ফিসফিসিয়ে বললেন, ‘আত্মহত্যা করেছে ও... নিজেই নিজেকে গুলি করেছে... ওহ! কী ভয়ঙ্কর!’ দু’হাতে মুখ ঢাকলেন তিনি।

ধীরে ধীরে তাঁকে স্টাডির সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন বারলিং। জোওন আর ডায়ানা অনুসরণ করল তাঁদের।

স্টাডিতে ঢুকলেন পোয়ারো, পিছু পিছু হ্যারি আর কিন।

ওদেরকে একটু দূরে দাঁড়াতে বলে লাশের পাশে হাঁটু গেড়ে বসলেন পোয়ারো।

ডান কপালে গুলির গর্ত দেখতে পেলেন তিনি, গুলিটা বাম দিক দিয়ে বেরিয়ে সম্ভবত অন্য পাশের দেয়ালে ঝোলানো একটা আয়নায় গিয়ে লেগেছে। আয়নাটা ভেঙে চুরমার। টেবিলের উপর এক টুকরো কাগজ পড়ে আছে, তাতে কাঁপা কাঁপা হাতে লেখা একটা মাত্র

রহস্যপত্রিকা

শব্দ-দুর্গন্ধিত।

দরজার দিকে চকিতে তাকালেন পোয়ারো। বললেন, ‘চাবিটা তালায় লাগানো ছিল না। তবে কি...’ লাশের পকেট হাতড়ালেন তিনি। ‘এই তো, পেয়েছি।’ কিনের দিকে ঘাড় ফেরালেন। ‘চাবিটা দরজায় লাগে কি না, একটু দেখবেন?’

‘নিশ্চয়ই।’ চাবি নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল কিন। কয়েক মুহূর্ত পর জানাল, ‘লেগেছে। এখানকারই চাবি।’

এবার হ্যারির দিকে ফিরলেন পোয়ারো। ‘জানালাটা দেখুন তো।’

কাছে গিয়ে দেখল হ্যারি। বলল, ‘বন্ধ।’ ‘আমিও একটু দেখি।’ উঠে দাঁড়ালেন পোয়ারো। হ্যারির পাশে চলে গেলেন। খুঁটিয়ে দেখলেন জানালাটা। লম্বা ফ্রেঞ্চ উইণ্ডো। পাল্লা খুলে বাইরের লনের উপর নজর বোলালেন। তারপর ফের আটকে দিলেন পাল্লাটা।

‘পুলিশে ফোন করতে হবে,’ সঙ্গীদের উদ্দেশে বললেন তিনি। ‘ওরা এসে সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখুক, নিশ্চিত হোক সত্যিই ব্যাপারটা আত্মহত্যা কি না। তার আগ পর্যন্ত কোনও কিছুতে হাত দেয়া ঠিক হবে না। যদূর বুঝতে পারছি, পনেরো থেকে বিশ মিনিট আগে মারা গেছেন মিস্যো লিচাম।’

‘জানি,’ শুকনো গলায় বলল হ্যারি। ‘আমরা গুলির আওয়াজ শুনেছি।’

‘তা-ই? তা হলে সঙ্গে সঙ্গে দেখতে আসেননি কেন?’

‘সত্যিই গুলির আওয়াজ কি না, সেটা শিয়ার হতে পারিনি।’

সংক্ষেপে নিজেদের অভিজ্ঞতা খুলে বলল হ্যারি আর কিন। ওদের কথা শেষ হতেই বারলিং উদয় হলেন। কিনকে পুলিশে ফোন করবার দায়িত্ব দিয়ে বারলিঙের সঙ্গে একান্তে কথা বলতে চাইলেন পোয়ারো। সম্মতি পেয়ে তাঁকে নিয়ে পাশের একটা ছোট কামরায় চলে গেলেন। ডিগবিকে পাহারায় রাখা হলো স্টাডির বাইরে, হ্যারি গেল মহিলাদের সঙ্গে দেখা করতে।

‘যদূর জেনেছি, আপনি মিস্যো লিচামের অন্তরঙ্গ বন্ধু,’ বারলিংকে বললেন পোয়ারো।

‘এ-কারণেই প্রাথমিকভাবে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছি। ভদ্রতার খাতিরে অবশ্য প্রথমে মাদাম লিচামের সঙ্গে কথা বলা উচিত ছিল, কিন্তু বর্তমান অবস্থাতে তাঁকে বিরক্ত না করাই ভাল।’

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলেন বারলিং।

পোয়ারো বলে চললেন, ‘দেখুন, পরিস্থিতিটা জটিল। তাই রাখঢাক না করে সবকিছু সরাসরি বলব আপনাকে। শুরুতেই জানিয়ে রাখি, পেশায় আমি একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ।’

মৃদু হাসলেন বারলিং। ‘সেটা বলার প্রয়োজন ছিল না। আপনার নাম কে না জানে, মসিয়ো পোয়ারো!’

পোয়ারোও হাসলেন। ‘এতই বিখ্যাত হয়ে গেছি? যাক গে, আসল কথায় আসি। ক’দিন আগে আমার লগনের ঠিকানায় মসিয়ো লিচামের একটা চিঠি আসে। সেই চিঠিতে তিনি আমাকে জানান, জালিয়াতির মাধ্যমে তাঁর অনেক টাকা চুরি করেছে কেউ। বিষয়টি পারিবারিক, মান-সম্মানের কথা ভেবে পুলিশকে জড়াতে চান না; তাই চাইছেন আমি এসে যেন ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখি। সে-কারণেই আমি আজ এখানে এসেছি। বলে রাখা ভাল যে, চিঠি পাওয়ামাত্র আসতে পারিনি। হাতে অনেক কাজ ছিল, সেগুলো শেষ করে আসতে হয়েছে। তা ছাড়া চিঠির মধ্যে একটা হামবড়া ভাব ছিল—যেন তিনি ইংল্যান্ডের রাজা, আমাকে হুকুম করছেন... ওঁকে বুঝিয়ে দেয়া দরকার ছিল যে বাস্তবে তিনি কিছুই নন।’

আবারও হাসলেন বারলিং। ‘হ্যাঁ, ওর মধ্যে অমন একটা ভাব ছিল বটে।’

‘আমি সেটা চিঠি পড়েই বুঝতে পেরেছি। ভদ্রলোক একটু পাগলাটে ধরনের মানুষ ছিলেন, তাই না? কিছুটা ভারসাম্যহীন?’

‘সে তো নিজের চোখেই দেখতে পেয়েছেন।’

‘মাফ করবেন, মসিয়ো, তবে পাগল বা ভারসাম্যহীন মানুষ আত্মহত্যা করে না। লোকে তা-ই বলে বটে, কিন্তু সেটা আসলে মৃতের আত্মীয়স্বজনকে সান্ত্বনা দেবার জন্য।’

‘যা-ই বলুন, হিউবার্ট স্বাভাবিক মানুষ

ছিল না,’ দ্বিমত পোষণ করলেন বারলিং। ‘মাথাগরম টাইপের লোক ছিল ও, ক্রোধ ছিল নিয়ন্ত্রণের বাইরে। পারিবারিক খ্যাতি, গর্ব... এসবের ব্যাপারে ছিল মাত্রাতিরিক্ত সচেতন। তার উপর ও ছিল ভীষণ চতুর স্বভাবের।’

‘হ্যাঁ, কেউ যে জালিয়াতির মাধ্যমে তাঁর টাকাপয়সা চুরি করেছে, সেটা ঠিকই বুঝে ফেলেছিলেন।’

‘কিন্তু টাকা চুরি হলেই কি লোকে আত্মহত্যা করে?’

‘প্রশ্নই ওঠে না, মসিয়ো। আর সে-কারণেই আপনার সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছি। চিঠিতে ঘটনাটা পারিবারিক বলে উল্লেখ করেছিলেন মসিয়ো লিচাম। আর আপনি নিশ্চয়ই জানেন, পারিবারিক কারণে মানুষ হরহামেশাই আত্মহত্যা করে।’

‘কী বলতে চাইছেন আপনি, মসিয়ো পোয়ারো?’

‘বলছি না, স্রেফ ধারণা করছি। হতে পারে ব্যাপারটা নিয়ে খোঁচাঝুঁচি করতে গিয়ে আরও গভীর কোনও কেলেক্সার আবিষ্কার করে বসেছিলেন মসিয়ো লিচাম। রাগে-ক্ষোভে-দুঃখে সে-কারণেই হয়তো আত্মহত্যা করেছেন। হতে পারে না? এখন আমার দায়িত্ব সত্যটা খুঁজে বের করা। হাজার হোক, আমাকে এ-কাজের জন্যই ডেকে এনেছিলেন তিনি। ব্যাপারটা পুলিশ পর্যন্ত গড়াতে দিতে চাননি।’

‘তারমানে আপনি পুলিশকে কিছুই জানাবেন না? যদি সেটার সঙ্গে হিউবার্টের মৃত্যুর সরাসরি সম্পর্ক থাকে... তবুও না?’

‘সে-ব্যাপারে আমি এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নিইনি। রহস্যটা ভেদ করবার পর ভেবে দেখব।’

‘হুম!’ সিগার ধরালেন বারলিং। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর বললেন, ‘আমি দুঃখিত, মসিয়ো পোয়ারো, আপনার তদন্তে আমি কোনও সাহায্য করতে পারব না। হিউবার্ট অত্যন্ত আত্মকেন্দ্রিক মানুষ ছিল, আমাকে কখনও কোনও গোপন কথা খুলে বলেনি। আমি ওর ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কোনও গোমর জানি না।’

পোয়ারো বললেন, 'আর কিছু না হোক, কার পক্ষে তাঁর টাকা চুরি করা সম্ভব, সেটা তো বলতে পারবেন।'

'সেটাও বলা কঠিন। তবে হ্যাঁ, এস্টেটের দেখাশোনার জন্য একজন এজেন্ট রাখা হয়েছে। লোকটা নতুন।'

'কে সে?'

'মার্শাল...ক্যান্টেন মার্শাল। চমৎকার মানুষ। যুদ্ধে একটা হাত হারিয়েছে। বছরখানেক হলো যোগ দিয়েছে এখানে। হিউবার্ট ওকে বেশ পছন্দ করত... বিশ্বাসও করত।'

'কিন্তু সে-ই যদি চোর হয়, তো চেপে রাখার মত কোনও পারিবারিক কারণ নয় ওটা।'

'ইয়ে... না।'

বারলিঙের ইতস্তত ভাবটা নজর এড়াল না পোয়ারোর। ভীষ্ণ গলায় বললেন, 'আপনি কিছু একটা এড়িয়ে যাচ্ছেন, মসিয়ো। প্রিজ, সব খোলাসা করে বলুন।'

করণ চোখে তাঁর দিকে তাকালেন বারলিং। 'কথাগুলো রটনার মত শোনাবে...'

'তাও বলুন, প্রিজ। আমি কাউকে কিছু বলব না।'

'বেশ,' কাঁধ ঝাঁকালেন বারলিং। 'ড্রইংরুমে সুন্দরী একটি মেয়েকে দেখেছিলেন?'

'একজন নয়, আমি দুজনকে দেখেছি।'

'ও হ্যাঁ, মিস অ্যাশবি। মিষ্টি মেয়ে। এবারই প্রথম এসেছে। হ্যারি ডেলহাউসের বান্ধবী। ও না, সাদা জামা পরা অন্য মেয়েটির কথা বলছি। ডায়ানা কিভস্।'

'হ্যাঁ, খেয়াল করেছি,' বললেন পোয়ারো। 'রূপ তো নয়, যেন আশুন।'

'ছোটখাট একটা ডাইনীও বলতে পারেন তাকে,' তিক্ত শোনালা বারলিঙের কণ্ঠ।

'পুরুষদের নিয়ে খেলতে ভালবাসে। খেপে গিয়ে কে যে কখন ওর ক্ষতি করে বসে...' কথাটা শেষ করলেন না তিনি। রুমাল বের করে কপাল মুছলেন। বুঝতে পারছেন, শেষ বাক্যটা একটু অন্যরকম হয়ে গেছে।

'মেয়েটি আসলে কে?' জিজ্ঞেস করলেন

পোয়ারো।

'হিউবার্টের পালিতা কন্যা। বাচ্চা হিচ্ছিল না লিচাম দম্পতির, তখন ডায়ানাকে দত্তক নেয় ওরা। মেয়েটা কেমন যেন ওদের দূর-সম্পর্কের আত্মীয়। হিউবার্ট খুবই পছন্দ করত ওকে, বলতে গেলে পূজো করত...'

'বয়স তো একেবারে কম নয় মেয়েটির। বিয়ে হয়নি কেন? মসিয়ো লিচামের কোনও আপত্তি ছিল?'

'না, না। উপযুক্ত পাত্রের ক্ষেত্রে আপত্তি থাকবে কেন?'

'মাফ করবেন... উপযুক্ত পাত্র বলতে কি আপনি নিজেকে বোঝাচ্ছেন?'

গাল লাল হয়ে উঠল বারলিঙের। তোতলাতে তোতলাতে বললেন, 'আ... আমি কখন সে-কথা...'

'না, বলেননি,' তাঁকে থামিয়ে দিলেন পোয়ারো। 'তবে আমার অনুমানটা সম্ভবত মিথ্যে নয়, তাই না?'

নিজেকে সামলে নিলেন বারলিং। গলা ঝাঁকারি দিয়ে বললেন, 'আমি ওর প্রেমে পড়েছিলাম। হিউবার্টেরও তাতে কোনও আপত্তি ছিল না।'

'আর মাদমোয়াজেল?'

'বলেছি তো, ও একটা ডাইনী। প্রেম কী জিনিস, তা ও জানে না।'

'হ্যাঁ, বলেছেন। ওর সঙ্গে ক্যান্টেন মার্শালের কী সম্পর্ক?'

'কিছুদিন ধরে খুব মেলামেশা করছিল দুজনে। লোকে কানাকানি করছিল এ-নিয়ে। তবে ওকেও নাচাচ্ছিল ডায়ানা, কোনও সন্দেহ নেই।'

'আপনার কি ধারণা, মেয়ের কথা ভেবে মার্শালের ব্যাপারে সাবধানে এগোতে চাইছিলেন মসিয়ো লিচাম?'

'হিউবার্টের ভিতরে এত সূক্ষ্ম অনুভূতি ছিল না,' বললেন বারলিং। 'আমার মনে হয় ঘটনা অন্য কিছু। নইলে আপনার মত বিখ্যাত একজন গোয়েন্দাকে খবর দিত না।'

'বোধহয় ঠিকই বলছেন,' একমত হলেন পোয়ারো। 'জালিয়াতি শুধু এস্টেট এজেন্ট কেন, যে-কেউ করতে পারে। যেমন ধরুন ঢেক

জালিয়াতি... ঘরেরই কেউ হয়তো সই নকল করে মসিয়ো লিচামের ব্যাক থেকে টাকা তুলে নিচ্ছিল।

‘অসম্ভব নয়।’

‘তা হলে ঘরের লোকের দিকেই নজর দেয়া যাক। হ্যারি ডেলহাউস। কে সে?’

‘হিউবার্টের ভাগ্নে।’

‘ধরে নিচ্ছি উত্তরাধিকারীও?’

‘বোনের ছেলে, পদবী সে-কারণে ভিন্ন, বললেন বারলিং। ‘হিউবার্টের উইলে ওর নাম থাকতে পারে, তবে আমি সেটা জানি না।’

‘না থাকার কোনও বিশেষ কারণ আছে?’

‘ঠিক তা নয়। আসলে আজ পর্যন্ত লিচাম পরিবারের সম্পত্তি শুধু লিচাম নামধারীরাই পেয়েছে। সেটাই রেওয়াজ। সেই হিসেবে হিউবার্টের স্ত্রীর সব পাবার কথা-তিনি তো স্বামীর পদবী রাখছেনই। কিছু অংশ ডায়ানাও পেতে পারে... মানে, ও বা ওর স্বামী যদি পদবীটা গ্রহণ করে আর কী।’

‘বুঝেছি,’ বললেন পোয়ারো। ‘আপনার সঙ্গে কথা বলে অনেক কিছু জানতে পারলাম, মসিয়ো। অসংখ্য ধন্যবাদ। এখন কি দয়া করে মাদাম লিচামকে একটু আসতে বলবেন? ওঁর সঙ্গে এবার কথা বলা দরকার।’

‘নিশ্চয়ই। আমি এখন পাঠাচ্ছি ওঁকে।’

বেরিয়ে গেলেন বারলিং। বেশ খানিকটা সময় কেটে গেলে দরজা ঠেলে কামরায় ঢুকলেন মিসেস লিচাম। মুখ ফ্যাকাসে, তবে নিজেই অনেকটাই সামলে নিয়েছেন বলে মনে হলো।

‘আসুন, মাদাম। বসুন।’

সোফায় বসে ভদ্রমহিলা বললেন, ‘মি. বারলিং আমাকে সব খুলে বলেছেন, মসিয়ো পোয়ারো। মানে এখানে আপনার আগমনের কারণ। আমি সব ধরনের সাহায্য করতে তৈরি

আছি, আমার স্বামীর মৃত্যুর পিছনে যদি কারও হাত থাকে, আমি তা জানতে চাই... যদিও আমার ধারণা এটা নিয়তি ছাড়া আর কিছু নয়। বিশেষ করে ওই ভাঙা আয়নাটা দেখার পর আর কিছু ভাবতে পারছি না।’

‘আয়না, মাদাম?’

‘হ্যাঁ। দেখামাত্র ওটাকে একটা সঙ্কেত বলে মনে হয়েছে আমার কাছে-অসুস্ত সঙ্কেত। পুরনো ঝান্ডানি পরিবারের উপর অনেক ধরনের অভিশাপ থাকে, জানেন নিশ্চয়ই? এটা নির্ধাত তেমন কোনও ঘটনা। অভিশাপের শিকার হয়েছিল আমার স্বামী... আমি নিশ্চিত!’

তর্কে গেলেন না পোয়ারো। প্রসঙ্গ পাষ্টে জিজ্ঞেস বললেন, ‘মাদাম, আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই। কিছু মনে করবেন না তো?’

‘না, না, মনে করার কী আছে? যা জানতে চান খোলাখুলি জিজ্ঞেস করুন।’

‘আর্থিক কোনও ধরনের অনটন নেই তো আপনার?’

‘টাকার কথা বলছেন? আমি ওসব নিয়ে কখনও মাথা ঘামাই না।’

একটু হাসলেন পোয়ারো। ‘লোকে কী বলে জানেন? যারা টাকা নিয়ে মাথা ঘামায় না, তাদেরই সবচেয়ে বেশি টাকার প্রয়োজন হয়।’

‘কী বলতে চান?’ ভুরু কঁচকালেন মিসেস লিচাম।

‘কিছু না। আমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই। আপনি আসতে পারেন, মাদাম।’

চলে গেলেন ভদ্রমহিলা। এবার বাটলার ডিগবিকে ডেকে আনলেন পোয়ারো।

‘তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করব, ডিগবি,’ বললেন তিনি। ‘আমি একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ; তোমার মনিবের অনুরোধে এখানে তদন্ত করতে এসেছিলাম।’

‘ডিটেকটিভ!’ বিস্ময় ফুটল বাটলারের

সেবা প্রকাশনী এবং প্রজ্ঞাপতি প্রকাশনের সব ধরনের বই-এর জন্য বণ্ডাডায়।

মুসলিম বুক ডিপো

আকবরিয়া মার্কেট, বণ্ডাডা।

ফোন: ৬৪২৬৪

মোবাইল: ০১৯১১৪০২৭৮২

চোখে। 'কীসের তদন্ত?'

'প্রিজ, কোনও প্রশ্ন নয়। যা জিজ্ঞেস করব তার জবাব দাও। গুলির আওয়াজ তুমি শুনেছিলে?'

'হ্যাঁ,' সায় দিল ডিগবি। তারপর ঘটনাটা খুলে বলল।

'তারমানে হলঘরে তখন তোমরা চারজন ছিলে?'

'জী, স্যার। মি. ডেলহাউস আর মিস অ্যাশবি দোতলা থেকে নেমে এসেছিলেন, মি. কিন বেরিয়ে এসেছিলেন ড্রইংরুম থেকে।'

'বাকিরা কোথায় ছিল?'

'বাকিরা, স্যার?'

'হ্যাঁ। মাদাম লিচাম, মাদমোয়াজেল ক্রিভস্ আর মসিয়ো বারলিং।'

'মিসেস লিচাম আর মিস্টার বারলিংকে আওয়াজ শোনার কিছুক্ষণ পরে উপর থেকে নামতে দেখেছি।'

'আর মাদমোয়াজেল?'

'বোধহয় ড্রইংরুমে ছিলেন। আমি দেখিনি।'

আরও কয়েকটা প্রশ্ন করে বাটলারকে ছেড়ে দিলেন পোয়ারো, মিস ক্রিভস্কে খবর দিতে বললেন।

খুব দ্রুতই হাজির হলো ডায়ানা ক্রিভস্। কামরায় ঢুকতেই তীক্ষ্ণ চোখে তাকে জরিপ করলেন পোয়ারো। অপরূপ সুন্দরীই বটে। সাদা সাটিনের একটা পোশাক পরেছে সে, হাতে ছোট্ট ইভনিং পার্স, ওটার গায়ে সিঁদ্ধ দিয়ে বানানো নকল গোলাপের কলি। পোশাকের কাঁধের কাছেও একটা বড়সড় গোলাপ গেঁথে রাখা হয়েছে, সেটা আসল।

নিজের পরিচয় জানালেন পোয়ারো, কেন এ-বাড়িতে এসেছেন তা-ও খুলে বললেন। ডায়ানাকে অবাক হতে দেখলেন তিনি, অভিযাজ্ঞিতে কোনও খুঁত পেলেন না। মার্শালের ব্যাপারে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কথা বলল সে, খেঁপল বারলিঙের প্রসঙ্গ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে।

'ও তো একটা বদমাশ!' সরোষে বলল মেয়েটা। 'বাবাকে কথাটা কতবার বলেছি, কিছুতেই কানে তোলেনি। বরং বারলিঙের লোকসানী ব্যবসায় দিনের পর দিন টাকা

ঢেলেছে।'

'মাদমোয়াজেল, বাবার মৃত্যুতে আপনি কি কষ্ট পাচ্ছেন না?'

'কান্দছি না বলে এই প্রশ্ন করছেন তো? মসিয়ো পোয়ারো, আমি আধুনিক মেয়ে। লোক দেখিয়ে কান্নাকাটি আমার স্বভাবে নেই। তার মানে এই নয় যে আমি কষ্ট পাচ্ছি না। বাবাকে আমি খুবই পছন্দ করতাম, মসিয়ো। মনকে সান্ত্বনা দিচ্ছি এই ভেবে যে, যা হয়েছে তা একদিক থেকে ভালই হয়েছে।'

'ভাল হয়েছে!' পোয়ারো অবাক হলেন।

'হ্যাঁ। আর কিছুদিন বাঁচলে তাঁর স্থান হতো পাগলাগারদে। দিনকে দিন পাগলামি বেড়েই চলছিল। এমন এমন সব কাণ্ড ঘটাতেন, যা বলার মত না। নিজেকে ভাবতেন সর্বশক্তিমান! মাথা পুরোই খারাপ হয়ে যেতে বসেছিল। এরচেয়ে মরে যাওয়াই কি ভাল নয়?'

'বুঝেছি। আপনি মসিয়ো লিচামের মানসিক বিকারের কথা বলছেন। কিছু মনে করবেন না, আপনার পার্সটা একটু দেখতে পারি? গোলাপের কলিগুলো খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।'

দ্বিধা না করে ব্যাগটা বাড়িয়ে ধরল ডায়ানা। হাতে নিয়ে ওটা পরখ করলেন পোয়ারো। তারপর প্রশ্ন করলেন, 'আপনি গুলির শব্দ শুনেছিলেন?'

'হ্যাঁ, তবে ওটা যে গুলির আওয়াজ বুঝিনি। ভেবেছিলাম অন্য কিছু।'

'কোথায় ছিলেন তখন? ড্রইংরুমে?'

'না, বাগানে হাঁটছিলাম।'

'ঠিক আছে। আর কিছু জানার নেই আমার। সময় দেয়ায় ধন্যবাদ, মাদমোয়াজেল। যাবার পথে মসিয়ো কিনকে একটু ডেকে দেবেন?'

'জেফরি? এখুনি পাঠাচ্ছি।'

একটু পর কামরায় উপস্থিত হলো জেফরি কিন। সতর্ক, সেইসঙ্গে একটু কৌতূহলী মনে হলো তাকে।

'মি. বারলিঙের মুখে আপনার সম্পর্কে সবকিছু শুনে এসেছি, মসিয়ো পোয়ারো,' বলল সে। 'কতটুকু সাহায্য করতে পারব জানি না,

তবে আমি আমার সাধ্যমত...'

হাত তুলে তাকে খামিয়ে দিলেন পোয়ারো। 'আপনার কাছে আমি শুধু একটা ব্যাপার জানতে চাই, মসিয়ো কিন। লাশ দেখার জন্য আমরা যখন স্টাডিতে ঢুকলাম, তখন আপনি যুঁকে হলঘরের মেঝে থেকে কিছু একটা তুলে নিয়েছিলেন। কী সেটা?'

মুহূর্তের জন্য মুখের ভাষা হারাল কিন। পরক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়ে প্রতিবাদ করে উঠল। 'কী বলছেন এসব? আমি আবার কখন কী তুললাম?'

'অস্বীকার করে লাভ হবে না, স্যার। ভেবেছেন আপনি আমার পিছনে ছিলেন বলে কিছু টের পাইনি? বন্ধুরা বলে, আমার মাথার পিছনে আরেকটা চোখ আছে... সবই দেখতে পাই। আমি নিশ্চিত, মেঝে থেকে কিছু একটা কুড়িয়ে নিয়েছেন আপনি। ডিনার জ্যাকেটের ডান পকেটে ঢুকিয়ে রেখেছেন ওটা।'

কয়েক মুহূর্তের নীরবতা বিরাজ করল। সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে কিন। শেষ পর্যন্ত মনস্তির করে সামনে ঝুঁকল। পকেট উল্টে যা যা আছে সব বের করে রাখল টেবিলের উপরে। ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, 'দেখুন কোন্টা আপনার পছন্দ।'

জিনিসগুলোর উপর চোখ বোলালেন পোয়ারো। একটা সিগারেট লাইটার, একটা রুমাল, সিক্কের তৈরি ছোট্ট একটা গোলাপ-কলি আর সোনালি রঙের একটা দেশলাইয়ের বাস্ক।

হাত বাড়িয়ে দেশলাইয়ের বাস্কটা তুলে নিল কিন। বলল, 'এই যে... এটাই কুড়িয়ে নিয়েছিলাম। জিনিসটা আমারই, সন্ধ্যায় কোনও এক সময় পকেট থেকে পড়ে গিয়েছিল।'

'দুঃখিত, আপনার কথা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না,' মাথা নাড়লেন পোয়ারো। 'মানে?'

'দেখুন মসিয়ো, আমি অত্যন্ত গোছানো স্বভাবের মানুষ। কাজের সময় চোখকানও খুব সজাগ রাখি। মেঝের উপরে এত বড় সাইজের একটা দেশলাইয়ের বাস্ক পড়ে থাকবে, আর আমি সেটা লক্ষ্য করব না, তা হতেই পারে না।

চোখ এড়াতে পারে আরও ছোট কোনও জিনিস... এই যেমন এটা।' সিক্কের গোলাপ-কলিটা হাতের তালুতে তুলে নিলেন পোয়ারো। 'এটা সম্ভবত মিস ক্লিভসের পার্স থেকে এসেছে, তাই না?'

বড় করে শ্বাস নিল কিন, তারপর হার মানার ভঙ্গিতে হাসল। বলল, 'হ্যাঁ। গত রাতে গোলাপটা ও আমাকে দিয়েছে।'

'সত্যি?'

জবাব দেবার সুযোগ পেল না কিন, তার আগেই দরজা খুলে হস্তদস্ত ভঙ্গিতে কামরায় প্রবেশ করল আরেক যুবক। সুদর্শন, লম্বা... মাথায় ঘন সোনালি চুল।

'এসব কী গুনছি, জেফরি?' বলে উঠল সে। 'মি. লিচাম নাকি আত্মহত্যা করেছেন? কী ভয়ঙ্কর কথা!'

'তুল শোনোনি,' বলল কিন। উঠে দাঁড়াল। 'এসো, পরিচয় করিয়ে দিই। মসিয়ো এরকুল পোয়ারো, এ হলো ক্যাপ্টেন জন মার্শাল... এস্টেটের এজেন্ট। জন, মসিয়ো পোয়ারো তোমাকে সব খুলে বলবেন। আমি আসি। অনেক কাজ পড়ে আছে।'

গটমট করে বেরিয়ে গেল সে। টেনে দিয়ে গেল দরজা।

তীক্ষ্ণ চোখে নবাগতকে জরিপ করলেন পোয়ারো। প্রথম দর্শনে যতটা অল্পবয়সী মনে হয়েছিল, মার্শালের বয়স তার চেয়ে অনেক বেশি-জুলফিতে পাকা চুল দেখা যাচ্ছে, মুখের এখানে-সেখানে বলিরেখাও ফুটতে শুরু করেছে। ছটফটে আচরণ দেখে যুবক মনে হচ্ছিল। একটা হাত কাঠের... ওটাই সম্ভবত যুদ্ধে হারিয়েছে সে।

'পুলিশ এসেছে কি না জানেন?' জিজ্ঞেস করলেন পোয়ারো।

'হ্যাঁ,' বলল মার্শাল। 'আমি ওদের সঙ্গেই এলাম। ওরা অবশ্য খবর পেয়ে খুব একটা অবাক হয়নি, মি. লিচামের মাথার যে ঠিক নেই সে-কথা এলাকার সবাই জানত। তারপরেও...'

'তারপরেও আপনি আত্মহত্যার ব্যাপারটা মেনে নিতে পারছেন না, ঠিক?'

'ঠিক। অহঙ্কারী মানুষ ছিলেন মি. লিচাম,

মনে করতেন তাঁকে ছাড়া দুনিয়া অচল। এমন লোকের আত্মহত্যা করার কথা নয়।’

‘টাকাপয়সার কোনও সমস্যা ছিল তাঁর?’

মাথা নাড়ল মার্শাল। ‘সিরিয়াস কিছু না। মি. বারলিঙের ব্যবসায় টাকা খাটিয়ে কিছুটা লস হয়েছিল।’

পোয়ারো বললেন, ‘তা হলে আপনাকে সরাসরিই জিজ্ঞেস করি—আপনাকে সন্দেহ করার কোনও কারণ কি ছিল মসিয়ো লিচামের? মানে... এমন কোনও সন্দেহ কি তাঁর মনে জাগতে পারে যে, আপনি তাঁর হিসাবপত্র জাল করে টাকা সরাজেন?’

হতভম্ব ভঙ্গিতে তাঁর দিকে তাকাল মার্শাল। চোয়াল ঝুলে পড়ল তার।

মুচকি হাসলেন পোয়ারো। ‘আপনি দেখছি একেবারে চমকে গেছেন, মসিয়ো।’

‘চমকাবো না?’ নিজেই সামলে নিয়ে বলল মার্শাল। ‘কী বলছেন আপনি! এ অসম্ভব!’

‘বেশ, তা হলে আরেকটা প্রশ্ন করি। আপনি যে মিস ক্রিভসের সঙ্গে মেলামেশা করছেন, সেটা কি মসিয়ো লিচাম জানতেন?’

নার্ভাস ভঙ্গিতে হাসল মার্শাল। ‘আমাদের ব্যাপারটা আপনি জানেন?’

‘তারমানে ওটা সত্যি?’

মাথা ঝাঁকাল মার্শাল। ‘হ্যাঁ। কিন্তু মি. লিচাম এর কিছুই জানতেন না। ডায়ানাও জানাতে চায়নি। শুনলে খেপে বোম হয়ে যেতেন উনি। নির্ঘাত আমার চাকরি খেতেন।’

‘কিন্তু কতদিন খবরটা গোপন রাখতেন আপনারা?’

‘নির্দিষ্ট কিছু ঠিক করিনি। আসলে... ব্যাপারটা ডায়ানার উপরে ছেড়ে দিয়েছিলাম। ও বলেছিল সব ম্যানেজ করে নেবে। আর আমি চেষ্টা করছিলাম আরেকটা কাজ জোগাড় করতে, যাতে এ-চাকরিটা ছেড়ে দিতে পারি।’

‘তা হলেই কি মাদমোয়াজেল আপনাকে বিয়ে করতেন? মসিয়ো লিচাম নিশ্চয়ই ওঁর মাসোহারা বন্ধ করে দিতেন। ওঁকে চালাতেন কী করে আপনি? আমি তো শুনেছি মাদমোয়াজেল অত্যন্ত বিলাসী জীবনযাপন করেন।’

অস্বস্তি ফুটল মার্শালের চেহারায়ে। ‘যেভাবে হোক একটা ব্যবস্থা করে নিতাম। তার মানে এই নয় যে আমি এখান থেকে চুরি করার কথা ভাবছিলাম।’

‘হুম।’

দরজায় টোকা পড়ল। পাল্লা একটু ফাঁক করে উঁকি দিল কিন।

‘পুলিশের কাজ শেষ, মসিয়ো পোয়ারো। যাবার আগে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন ওঁরা।’

‘ধন্যবাদ। আসছি।’ উঠে দাঁড়ালেন পোয়ারো।

স্টাডিতে সূঠামদেহী এক ইঙ্গপেট্টর এবং পুলিশ ডিপার্টমেন্টের এক মাঝবয়েসী ডাক্তার দাঁড়িয়ে আছেন। পোয়ারোকে অভিবাদন জানানলেন তাঁরা।

ইঙ্গপেট্টর বললেন, ‘শুভ সন্ধ্যা, মসিয়ো পোয়ারো। আমি ইঙ্গপেট্টর রিভস্। আপনার কথা অনেক শুনেছি, দেখা হওয়ায় খুব ভাল লাগছে।’

তাঁর সঙ্গে হাত মেলালেন পোয়ারো। বললেন, ‘আপনাদের তদন্ত শেষ? আমার কাছ থেকে কোনও ধরনের সাহায্যের প্রয়োজন নেই বোধহয়?’

‘জী না, স্যর। ব্যাপারটা জলবৎ তরলং। সাধারণ আত্মহত্যার কেস।’

‘আপনারা নিশ্চিত?’

‘অবশ্যই! ঘরের দরজা-জানালা ভিতর থেকে বন্ধ, তালার চাবি পাওয়া গেছে লাশের পকেটে, সুইসাইড নোটও আছে। তা ছাড়া বেশ কিছুদিন থেকেই মি. লিচামের মাথার ঠিক ছিল না।’

‘তারমানে সবকিছুই স্বাভাবিক?’

‘গুলিটা যেভাবে আয়নায় লেগেছে, সেটা একটু অস্বাভাবিক,’ এবার মুখ খুললেন ডাক্তার। ‘বিদঘুটে একটা ভঙ্গিতে না বসলে ওভাবে ওখানে লাগার কথা না। অবশ্য... যে-কোনও আত্মহত্যাই বিদঘুটে।’

‘বুলেটটা উদ্ধার করেছেন আপনারা?’ জানতে চাইলেন পোয়ারো।

‘জী, এই তো।’ হাতের তালুতে ওটা বাড়িয়ে ধরলেন ডাক্তার। ‘আয়নার তলায়,

মেঝেতে পেয়েছি। সংঘর্ষের পর নীচে পড়ে গিয়েছিল। পিস্তলটাও মি. লিচামের। সবসময় নিজের ড্রয়ারে রাখতেন ওটা। আত্মহত্যার কারণটা পরিষ্কার নয়, তবে মস্তিষ্কবিকৃতির ঘোরেও কাজটা করে বসতে পারেন তিনি।’

নীরবে সায় জানালেন পোয়ারো।

লাশটা ইতোমধ্যে আরেকটা কামরায় সরিয়ে নেয়া হয়েছে। আরেক দফা অভিবাদন জানিয়ে ইন্সপেক্টর আর ডাক্তার বিদায় নিলেন। তাদেরকে সদর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন পোয়ারো। তারপর উল্টো ঘুরতেই দেখা পেলেন হ্যারি ডেলহাউসের। সে-ও পুলিশকে বিদায় দিতে এসেছে।

‘ভাল একটা ফ্ল্যাশলাইট জোড়াড় করতে পারবেন?’ তাকে জিজ্ঞেস করলেন পোয়ারো।

‘নিশ্চয়ই,’ বলে চলে গেল হ্যারি। জিনিসটা নিয়ে যখন ফিরল, তখন তার সঙ্গে জোওন অ্যাশবিও রয়েছে।

সংক্ষেপে মেয়েটির সঙ্গে পরিচিত হলেন পোয়ারো। বললেন, ‘চাইলে আপনারা আমার সঙ্গে আসতে পারেন।’

দরজা খুলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন তিনি; হ্যারি আর জোওন অনুসরণ করল। ডানে মোড় নিয়ে স্টাডির জানালার দিকে এগিয়ে চললেন। জায়গামত পৌছে ফ্ল্যাশলাইট জ্বাললেন, নজর বোলালেন মাটিতে। বাগানের ওয়াকওয়ে থেকে জানালার নীচ পর্যন্ত প্রায় ছ’ফুট জায়গা ঘাসে ঢাকা। হাঁটু গেড়ে বসে অংশটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন তিনি। কিছু না পেয়ে ফের উঠে দাঁড়ালেন। ঘাসে ঢাকা অংশটার দু’পাশে দুটো ফুলের কেয়ারি, তাতে ফুটে রয়েছে ডেইজি আর ডালিয়া ফুল। একে একে দুটোর উপরেই আলো ফেললেন। ডানদিকে কেয়ারির কাঁচা মাটিতে ভেসে উঠল পায়ের ছাপ।

‘দু’জোড়া পায়ের ছাপ,’ বিড়বিড় করলেন পোয়ারো। ‘এক জোড়া গেছে জানালার দিকে, আরেক জোড়া ফিরে এসেছে।’

‘নিশ্চয়ই মালীর পায়ের ছাপ,’ বলল জোওন।

‘না, মাদমোয়াজেল। মালী নয়। ভাল করে দেখুন। জুতোজোড়া অনেক ছোট, সামনের দিকটা চোখা, পিছনে হিল আছে। সোজা কন্ঠায়, মেয়েদের জুতো। মিস ক্লিভস্ বলেছেন, ঘটনার সময় তিনি বাগানে হাঁটছিলেন। ছাপগুলো তাঁরই হতে পারে। আচ্ছা, উনি কি আপনার আগে দোতলা থেকে নেমেছিলেন, নাকি পরে?’

কাঁধ ঝাঁকাল জোওন। ‘কী জানি, ওসব খেয়াল করিনি। ডিনারের ঘটনা শোনামাত্র ছুটতে শুরু করেছিলাম, ভেবেছিলাম বুঝি দ্বিতীয় ঘটনা পড়ে গেছে। ওটা যে প্রথম ঘটনা জানতাম না। ডায়ানার কামরার সামনে দিয়েই সিঁড়ির দিকে গেছি, কিন্তু ওর দরজা খোলা না বন্ধ ছিল খেয়াল করিনি। তবে হ্যাঁ... মিসেস লিচামের দরজা বন্ধ ছিল—এটা মনে আছে বেশ।’

‘ঘণ্টার আওয়াজ নিয়ে ভুল করলেন কেন?’

‘কী জানি... আমার মনে হচ্ছিল আগে আরও একবার আওয়াজ শুনেছি।’

‘তাই নাকি?’

পোয়ারোর কণ্ঠে কীসের যেন আভাস... ঝট করে তাঁর দিকে তাকাল হ্যারি; কিন্তু বিখ্যাত গোয়েন্দাটির ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি ছাড়া আর কিছুই দেখল না।

বাড়িতে ফিরে এল তিনজনে। ভিতরে ঢুকতেই দেখা হলো ডায়ানা ক্লিভসের সঙ্গে।

‘কোথায় গিয়েছিলেন আপনারা?’ জিজ্ঞেস করল সে।

যশোরে সেবা প্রকাশনী ও প্রজাপতি প্রকাশনের যে কোন বইয়ের জন্য এখানে আসুন।

মেসার্স আনোয়ার আলম ব্রাদার্স

প্রো: এস এম খুরশীদ আনোয়ার

৭ নং মুজিব সড়ক, যশোর।

ফোন নং ০৪২১-৬৩৬৩৯।

মোবাইল ০১৭১৫ ০৬৭০১৬

‘বাগানে,’ পোয়ারো বললেন। ‘আপনার সঙ্গে আরেকবার কথা বলা দরকার, মাদমোয়াজেল। আমার সঙ্গে একটু আসবেন?’

শ্রাগ করে তাঁর পিছু নিল ডায়ানা। ওকে স্টাডির পাশের ছোট কামরাটায় নিয়ে গেলেন পোয়ারো।

‘কী বলবেন বলুন,’ দরজা ভেজিয়ে বলল ডায়ানা।

‘ছোট্ট একটা প্রশ্ন। আজ যখন আপনি বাগানে হাঁটছিলেন, তখন কি স্টাডির জানালার পাশের ফুলের কেয়ারিতে গিয়েছিলেন?’

‘গেছি তো। দু’বার। প্রথমবার সাতটার দিকে, দ্বিতীয়বার ডিনারের ঠিক আগে।’

‘ঠিক বুঝলাম না।’

‘বোঝাবুঝির তো কিছু দেখছি না,’ শীতল গলায় বলল ডায়ানা। ‘ফুল তুলতে গিয়েছিলাম। ডেইজি ফুল দিয়ে রোজই খাবারের টেবিল সাজাই আমি। সেজন্যেই সাতটার সময় ওখান থেকে ফুল তুলেছি।’

‘আর পরে?’

‘পরে? মেয়েলি একটা কারণে। আমার জামায়... কাঁধের কাছে একটু তেল লেগে গিয়েছিল। ছোট্ট দাগ... তার জন্য জামা বদলাতে ইচ্ছে করল না। মনে পড়ল কেয়ারিতে একটা বড়সড় গোলাপ ফুটতে দেখেছি। গিয়ে ওটাই ছিড়ে আনলাম, জামায় গেঁথে ঢেকে দিলাম দাগটা। এই দেখুন।’ কাঁধের কাছে লাগানো গোলাপটা একটু সরিয়ে দাগ দেখাল ডায়ানা।

‘এটা কখনকার কথা?’

‘এই ধরুন... আটটা বাজার দশ মিনিট পর।’

‘আপনি জানালার কাছে যাননি?’

‘গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম ওখান দিয়েই ঘরে ঢুকব। কিন্তু ধাক্কা দিয়ে দেখি পাল্লাটা ভিতর থেকে বন্ধ। ডিনারের সময় হয়ে যাচ্ছিল, তাই ওখানে আর দেরি করিনি। উঁকিও দিইনি।’

‘হুম,’ গম্ভীর গলায় বললেন পোয়ারো।

‘গুলির আওয়াজ যখন হলো, তখন আপনি কোথায় ছিলেন? ফুলের কেয়ারিতে?’

‘না, না। সেটা তো আরও তিন-চার

মিনিট পরের ঘটনা। আমি তখন বাড়িতে চোকোর জন্য পিছনের দরজার দিকে এগোচ্ছিলাম।’

পকেট থেকে মুঠোয় কিছু একটা বের করে আনলেন পোয়ারো। ‘এটা চেনেন?’

তাঁর হাতের তালুতে সিল্কের তৈরি একটা ছোট্ট গোলাপ-কলি দেখতে পেল ডায়ানা। বলল, ‘মনে তো হচ্ছে আমার পার্সে লাগানো অর্নামেন্ট। কোথায় পেয়েছেন এটা?’

‘মসিয়ো কিনের পকেটে,’ বললেন পোয়ারো। ‘এটা কি আপনি ওঁকে দিয়েছেন?’

‘ও কি তা-ই বলেনি?’

একটু হাসলেন পোয়ারো। ‘কখন দিয়েছেন এটা?’

‘গতকাল রাতে।’

‘মসিয়ো কিন কি আপনাকে তা-ই বলতে বলেছে?’

‘কী বলতে চান?’ একটু যেন রেগে গেল ডায়ানা।

জবাব না দিয়ে আরেকবার হাসলেন পোয়ারো। তারপর বেরিয়ে এলেন হলঘরে। ডিগবিকে বললেন বাড়ির সবাইকে স্টাডিতে ডেকে নিয়ে আসতে।

‘জী, স্যার।’

‘যাবার আগে একটা প্রশ্নের জবাব দিয়ে যাও। মাদমোয়াজেল ডায়ানা কি আজ সন্ধ্যায় টেবিল সাজাবার জন্য কোনও ফুল নিয়ে এসেছিলেন?’

‘এনেছিলেন, স্যার। ডেইজি ফুল। প্রায়ই আনেন।’

‘ধন্যবাদ, ডিগবি। ভূমি এবার যেতে পারো।’

দশ মিনিট পর স্টাডিতে সমবেত হলো সবাই। তাদেরকে উদ্দেশ্য করে পোয়ারো বললেন, ‘আপনাদের সবাইকে একটা বিশেষ কারণে এখানে ডেকেছি। পুলিশের মতে, মসিয়ো হিউবার্ট লিচামের মৃত্যুরহস্য চুকেবুকে গেছে। আত্মহত্যা করেছেন তিনি। কিন্তু আমি, এরকুল পোয়ারো বলছি... ঘটনা তা নয়।’

নড়েচড়ে বসল সবাই।

‘হ্যাঁ, ঠিকই শুনছেন,’ বলে চললেন পোয়ারো। ‘ব্যাপারটা সাধারণ কোনও

আত্মহত্যা ঘটনা নয়। মসিয়ো লিচামের চরিত্র বা মানসিকতার সঙ্গে ওটা একেবারেই মেলে না। দাঙ্গিক, আত্মভরী, অহঙ্কারী মানুষ ছিলেন তিনি; নিজেকে আপন জগতের রাজা বলে ভাবতেন। এ-ধরনের মানুষ আত্মহত্যা করে না। হ্যাঁ, লোকটা পাগল হয়ে যেতে পারে... মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটতে পারে তার। কিন্তু আত্মহত্যা? কখনোই নয়।

‘তা হলে কীভাবে মারা গেছেন উনি?’ জিজ্ঞেস করলেন বারলিং।

‘আমি বলব, খুন করা হয়েছে তাঁকে।’

যেন বোম ফটল, বিস্ময়ে ক্ষণিকের জন্য স্থবির হয়ে গেল সবাই। তারপরেই চোখে-মুখে ফুটে উঠল অবিশ্বাস।

‘খুন?’ মুখ বাঁকিয়ে বলল মার্শাল। ‘বন্ধ একটা কামরার ভিতরে? যেখানে আর কেউ ছিল না?’

‘ব্যাপারটা সে-রকমই মনে হতে পারে,’ বললেন পোয়ারো।

‘আপনি কি বলতে চাইছেন, গুলি খাওয়ার পরে খুনিকে বিদায় জানিয়ে দরজা-জানালা বন্ধ করে দিয়েছিলেন মামা?’ ঠাট্টা করল হ্যারি।

‘মোটাই না,’ অবিচল রইলেন পোয়ারো।

‘আসুন, আপনাদের একটা জিনিস দেখাই।’

জানালায় কাছে চলে গেলেন তিনি। ছিটকিনি তুলে পাল্লা একবার খুললেন, তারপর আবার টেনে দিলেন; তবে ছিটকিনি আটকালেন না, ওটা নিজের ঝাঁজে ঝাড়া অবস্থায় আটকে রইল।

‘দেখুন, জানালাটা বন্ধ হয়েছে, কিন্তু আটকানো অবস্থায় নয়। কিন্তু আমি যদি সামান্য ঝাঁকি দিই...’ পাল্লার একপাশে হালকা টোকা দিলেন পোয়ারো, সঙ্গে সঙ্গে ছিটকিনিটা খটাস করে নীচে নেমে এল। বসে গেল গর্তে। ধীরে ধীরে দর্শকদের দিকে ফিরলেন তিনি।

‘এ-কাজ বাইরে থেকেও করা যায়।’

‘খুনি এখান দিয়ে বেরিয়েছে?’ জিজ্ঞেস করল জোন্সন।

মাথা ঝাঁকালেন পোয়ারো। তারপর বললেন, ‘আটটা বেজে বারো মিনিটে শোনা

গিয়েছিল গুলির আওয়াজ। হলঘরে তখন

চারজন মানুষ ছিল। বাকি তিনজন কোথায় ছিলেন? মাদাম লিচাম? আপনার কামরায়? বেশ। মসিয়ো বারলিং? আপনিও কি নিজের কামরায় ছিলেন?’

‘হ্যাঁ।’

ডায়ানার দিকে ফিরল পোয়ারো। ‘আর আপনি হাঁটছিলেন বাগানে-নিজেই সে-কথা স্বীকার করেছেন। তাই না?’

‘দেখুন, মসিয়ো...’ কিছু বলার চেষ্টা করল ডায়ানা।

ওর কথায় কান না দিয়ে মিসেস লিচামের দিকে ফিরলেন পোয়ারো। ‘এক্সকিউজ মি, মাদাম। আপনার স্বামীর বিষয়-সম্পত্তি এখন কীভাবে ভাগ-বাটোয়ারা হবে, বলতে পারেন?’

‘হ্যাঁ। কিছুদিন আগে হিউবার্ট আমাকে ওর উইলটা পড়তে দিয়েছিল। বলেছিল ওটার বিষয়বস্তু আমার জ্ঞান থাকা দরকার,’ বললেন লিচাম-পত্নী। ‘উইল মোতাবেক এস্টেটের আয় থেকে বছরে তিন হাজার পাউণ্ড পাব আমি, আর পাব আমার পছন্দমত যে-কোনও একটা বাড়ি। সম্পত্তির বাকি সবকিছু পাবে ডায়ানা, তবে শর্ত হচ্ছে-ওকে বিয়ে করতে হবে, এবং ওর স্বামীকে লিচাম পদবী নিতে হবে।’

‘ইন্টারেস্টিং!’ মন্তব্য করলেন পোয়ারো।

‘ওটা পুরনো উইল,’ বলে চললেন মিসেস লিচাম। ‘কয়েক সপ্তাহ আগে উইলে সামান্য পরিবর্তন এনেছে হিউবার্ট। ওতে বলা হয়েছে, সম্পত্তি পাবার পূর্বশর্ত হিসেবে-মি. বারলিঙের সঙ্গে বিয়ে হতে হবে ডায়ানার। ও যদি অন্য কাউকে বিয়ে করে, সেক্ষেত্রে ওর ভাগের সব সম্পত্তি পাবে হিউবার্টের ভাগ্নে হ্যারি ডেলহাউস।’

‘পরিবর্তনটা যেহেতু সাম্প্রতিক, আমার ধারণা মাদমোয়াজেল ওটা সম্পর্কে সচেতন নন,’ বললেন পোয়ারো। ডায়ানার দিকে তাকালেন তিনি, ওর চেহারা দেখে বুঝলেন, অনুমান মিথ্যে নয়। কয়েক পা এগিয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, ‘মাদমোয়াজেল, আপনি তো মসিয়ো মার্শালকে বিয়ে করতে চান, তাই না? নাকি মসিয়ো কিনকে?’

জবাব না দিয়ে মার্শালের পাশে গিয়ে

দাঁড়াল ডায়ানা, ওর হাত ধরল। বলল, 'জবাব পেলেন?'

মাথা ঝাঁকালেন পোয়ারো। বললেন, 'এবার তা হলে আসল কথায় আসা যাক। মাদমোয়াজেল... মোটিভ, সুযোগ এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিবেচনায় সন্দেহটা সবার আগে আপনার উপরেই আসে। প্রাণ থাকতে মসিয়ো মার্শালকে মেয়েজামাই হিসেবে কিছুতেই মেনে নিতেন না আপনার বাবা; কিন্তু উনি মারা গেলে সমস্যাটার সমাধানই শুধু হচ্ছে না, আপনি বিশাল সম্পত্তিরও মালিক হতে পারছেন... মানে, আপনার ধারণামতে আর কী। উইলের পরিবর্তনের খবর যেহেতু আপনি জানতেন না। এরপর আপনি কী করতে পারেন, সেটা সহজেই অনুমেয়। মসিয়ো লিচামের ড্রয়ার থেকে পিস্তল চুরি করতে পারেন, সেটা নিয়ে বাগানের দিক থেকে জানালা গলে স্টাডিতে ঢুকতে পারেন, তাঁকে গুলি করতে পারেন, তারপর ফের জানালা দিয়ে বেরিয়ে পাল্লাটা লাগিয়েও দিতে পারেন। ঠিক?'

দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেল ডায়ানার। 'না... এসব মিথ্যে!' প্রায় চোঁচিয়ে উঠল সে। 'আমি বাবাকে গুলি করিনি!'

একদৃষ্টে ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন পোয়ারো। তারপর হাসলেন। 'আপনার কথা আমি বিশ্বাস করছি। আসলেই তা ঘটেনি। ব্যাখ্যাটা বেশ গ্রহণযোগ্য হলেও দুটো কারণে সেটা ধোপে টেকে না। প্রথম কারণটা হলো, আপনি সাতটার সময় ফুল তুলতে গিয়েছিলেন। আর দ্বিতীয় কারণ... সেটা উদ্ঘাটনের জন্য মাদমোয়াজেল অ্যাশবি আমাকে সাহায্য করেছেন।'

একসঙ্গে সবার চোখ ঘুরে গেল জোওনের দিকে। ও নিজেও খতমত খেয়ে গেল।

'আমি? আমি আবার কী সাহায্য করলাম?'

'এখুনি সেটা বুঝতে পারবেন,' পোয়ারো বললেন। লাশটা যে-চেয়ারে বসা ছিল, সেটার দিকে ইশারা করলেন তিনি। 'আপনারা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন মসিয়ো লিচাম কীভাবে বসে ছিলেন? টেবিলের পিছনে নয়, পাশে।

জানালায় দিকে মুখ করে। ওটা কি স্বাভাবিক ভঙ্গি? মোটেই না। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে টেবিলের পিছনেই বসা থাকতেন ভদ্রলোক। ওখানে বসে সুইসাইড নোট লিখতেন, তারপর কপালে পিস্তল ঠেকিয়ে ট্রিগার চাপতেন। জায়গা পরিবর্তন করতেন না। কিন্তু ভেবে দেখুন, ওখানে গুলি চালালে কী ঘটত? কপালের আরেক পাশ ফুটো করে বেরিয়ে আসত বুলেট... স্টাডির দরজা খোলা থাকলে ওটা চলে যেত বাইরে... সোজা গিয়ে আঘাত হানত পিতলের ঘন্টায়!

'এবার নিশ্চয়ই রহস্যটা পরিষ্কার হচ্ছে আপনারদের কাছে? মাদমোয়াজেল অ্যাশবি সত্যিই দু'বার ঘন্টাক্ষনি শুনেছেন। প্রথম যে আওয়াজ শুনেছিলেন, সেটা ছিল ঘন্টার গায়ে গুলির আঘাত... বেশ মৃদু। ওঁর কামরা দোতলায়, ঠিক ঘন্টার উপরে হওয়ায় একমাত্র তিনিই শুনেছেন ওটা, আর কেউ না।

'কাজেই বোঝা যাচ্ছে, টেবিলের পিছনে বসা অবস্থায় গুলি খেয়েছেন মসিয়ো লিচাম। ব্যাপারটা আত্মহত্যা হতে পারে না। কারণ মরার পর তাঁর পক্ষে চেয়ার ঘুরিয়ে টেবিলের পাশে এসে বসা সম্ভব নয়। কাজটা করেছে অন্য কেউ। সে-ই খুনি। চেয়ার ঘুরিয়েছে, যাতে ঘন্টাক্ষনির সূত্র ধরে গুলির সঠিক সময় কেউ বের করতে না পারে, সেটা নিশ্চিত করবার জন্য। নাটক সাজাবার জন্য সে ঘরের দরজায় তালা দেয়, চাবিটা চুকিয়ে রাখে লাশের পকেটে। নিজের ছাপ মুছে পিস্তলে মসিয়ো লিচামের আঙুলের ছাপ বসায়, ওটা এমনভাবে ফেলে রাখে যেন ভদ্রলোকের হাত থেকে খসে পড়েছে। সবশেষে জানালা গলে কামরা থেকে বেরিয়ে যায়। তবে সে ঘাসে নামেনি, নেমেছে ফুলের কেয়ারিতে। ঘাসে নামলে পায়ের ছাপ থেকে যেত, কিন্তু কেয়ারির নরম মাটি ঘষে ছাপ মুছে ফেলা যায়। এভাবেই... সবকিছু সাজিয়ে-গুছিয়ে বাড়িতে ফিরে আসে সে। আটটা বাজার কিছুক্ষণ পরে... যখন সে ড্রয়িংরুমে একা... ওখানকার জানালা দিয়ে বাইরে একটা ফাঁকা গুলি করে। এরপর হতদম্ব হয়ে হলঘরে বেরিয়ে এমন একটা ভাব দেখায়, যেন গুলিটা ঘরের ভিতরেই হয়েছে।

কী, মসিয়ো কিন, এভাবেই তো ঘটনাটা ঘটিয়েছেন আপনি... নাকি কোথাও ভুল করছি আমি?’

এক লাফে বসা থেকে উঠে দাঁড়ান জেফরি কিন। মুখ লাল হয়ে গেছে, কিছু বলার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো। খরখর করে কঁপে উঠল তার ঠোঁট।

‘নীরবতা সম্মতির লক্ষণ,’ বললেন পোয়ারো। ‘ওটাকেই স্বীকারোক্তি বলে ধরে নিতে পারি আমরা। কী বলেন?’

জবাবের প্রতীক্ষায় না থেকে দরজার দিকে ঘুরে গেল কিন। পালাবার জন্য দৌড়ানোর চেষ্টা করতেই পাশ থেকে তার চোয়ালে বিরাশি শিকার একটা ঘুসি হাঁকল হ্যারি। আধপাক ঘুরে গেল কিন, মুখ খুবড়ে আছড়ে পড়ল মেঝেতে। জ্ঞান হারাল সঙ্গে সঙ্গে।

‘ধন্যবাদ, মসিয়ো হ্যারি,’ পোয়ারো হাসলেন। ‘মসিয়ো মার্শাল, পুলিশে ফোন করবেন, প্লিজ? অপরাধীকে নিয়ে যাক।’

‘শেষ পর্যন্ত জেফরি?’ হতভম্ব গলায় বলল ডায়ানা। ‘কিন্তু কেন?’

‘সেক্রেটারি হিসেবে নানা কায়দায় মসিয়ো লিচামের টাকা চুরি করছিল ও,’ ব্যাখ্যা করলেন পোয়ারো। ‘সেটা তিনি টেরও পেয়ে গিয়েছিলেন। আমাকে খবর দিয়েছিলেন এর একটা সুরাহা করবার জন্য...’

‘পুলিশে খবর না দিয়ে আপনাকে কেন ডাকলেন?’ বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করল ডায়ানা।

‘তার জন্য আপনিই দায়ী, মাদমোয়াজেল। মসিয়ো মার্শালের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক গোপন করার আশায় কিনের সঙ্গে নির্লজ্জভাবে মেলামেশা করেছেন আপনি, মসিয়ো লিচামের দৃষ্টি ওদিকে ঘুরিয়ে

রেখেছিলেন। না, অস্বীকার করবার চেষ্টা করে লাভ নেই, ঘটনা সত্যি। আপনার বাবা সেই মেলামেশাকে গভীর প্রশ্নয় ভেবে খুব সাবধানে পদক্ষেপ নিতে চাইছিলেন। অন্যদিকে কিনও আপনার প্রেমের অভিনয়কে সত্যি ভেবে ভবিষ্যতের জাল বুনতে থাকে, ভাবে আপনাকে বিয়ে করে বিশাল সম্পত্তির মালিক হতে পারবে। উইলের পরিবর্তনের খবর সে-ও নিশ্চয়ই জানত না।

‘যা হোক, এ-অবস্থায় আচমকা সে গুনল, বিখ্যাত গোয়েন্দা এরকুল পোয়ারোকে খবর দিয়েছেন মসিয়ো লিচাম-তার টাকা চুরির রহস্য ভেদ করবার জন্য। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে কিনের। সে বুঝতে পারে, চুরির জন্য দোষী সাব্যস্ত হলে শুধু চাকরি যাবে না, সম্পত্তিও হারাবে সে। আমি পৌছানোর আগেই মরিয়া হয়ে মসিয়ো লিচামকে খুন করার ফন্দি আঁটে, যাতে তিনি ওর দিকে অভিযোগের আঙুল তুলতে না পারেন। তা ছাড়া তিনি মারা গেলে আপনাকে বিয়ে করে সম্পত্তির মালিক হবার পথ সুগম হবে বলে ভেবেছিল সে। চমৎকার প্ল্যান এঁটেছিল, ওকে খুনি হিসেবে সন্দেহ করবার কোনও অবকাশই ছিল না। এমনকী পুলিশও ভেবেছে মসিয়ো লিচাম আত্মহত্যা করেছেন।

‘ওর কাজে একমাত্র খুঁত দেখা দেয় পিস্তলের বুলেট কামরা থেকে বেরিয়ে যাওয়ায়। ঘন্টার গায়ে বাড়ি খেয়ে ওটা হলঘরের মেঝেতে পড়ে ছিল। কামরা থেকে দরজা দিয়ে বেরুলেই কেউ না কেউ ওকে দেখে ফেলত, কাজেই কিনের কোনও সুযোগ ছিল না ওটাকে তৎক্ষণাৎ উদ্ধার করবার। অগত্যা মসিয়ো লিচামের লাশটা টেবিলের পিছন থেকে সরাতে হয় তাকে, আয়না ভেঙে নতুন পজিশনকে আত্মহত্যার পজিশন হিসেবে

আলহাজ্ব মোঃ ইসহাক চট্টগ্রাম

এখানে মাসিক রহস্যপত্রিকা বিক্রি করা হয়
মোবাইল: ০১৮২৩২২৭২৫৬, ০১৭১৯২২৮৮১০
ফোন: ২৫৫৪৭৭

প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। পরে, আমরা যখন দল বেঁধে স্টাডির সামনে এলাম, পিছনে থাকে সে। সবার অলক্ষে চট করে মেঝে থেকে প্রথম বুলেটটা কুড়িয়ে নেয়। কিন্তু আমি সেটা টের পেয়ে পরবর্তীতে ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করি। সিন্ধের একটা গোলাপ-কলি দেখিয়ে ও আমাকে বুঝ দেবার চেষ্টা করে-স্টাটাই নাকি কুড়িয়ে নিয়েছিল। বড্ড ধুরন্ধর লোক এই জেকরি কিন! মাদমোয়াজেল ডায়ানা, ভাগ্যিস আপনি সন্ধ্যায় ফুল তুলতে গিয়েছিলেন, নইলে...

‘আমি এখনও বুঝতে পারছি না ওটার সঙ্গে জেকরির ধরা পড়ার সম্পর্ক কোথায়।’ জকুটি করল ডায়ানা।

‘এ তো বুঝ সহজ! ফুলের কেয়ারিতে মাত্র দু’জোড়া পায়ের ছাপ দেখছি আমি। ফুল তোলার সময় ওখানে আরও অনেক বেশি ছাপ পড়বার কথা... নিশ্চয়ই কেয়ারির ভিতরে হেঁটে হেঁটে ফুল ছিঁড়তে হয়েছিল আপনাকে, তাই না? দু’জোড়া ছাপ পড়তে পারে শুধুমাত্র আপনি যখন একটা গোলাপ তুলতে গিয়েছিলেন, তখন। এর মানে দাঁড়াচ্ছে, সন্ধ্যা সাতটায় আপনি ফুল তোলার পরে কেউ একজন কেয়ারির মাটি সমান করে দিয়েছে। বাগানের মালী হতে পারে না, দুনিয়ার কোথাও মালীরা সন্ধ্যার পরে বাগানে কাজ করে না। তারমানে কাজটা করেছে মসিয়ো লিচামের খুনি-নিজের পায়ের ছাপ মুছে দেবার জন্য। আর সেই ছাপগুলো মোছা হয়েছে আটটা বারোয় গুলির শব্দ শোনা যাবার বেশ আগে। তার অর্থ খুনটাও হয়েছে তার আগে। এবার পরিষ্কার হলো?’

‘কিন্তু কিন যখন হিউবার্টকে খুন করল, সে-সময় কেউ গুলির আওয়াজ শোনেনি কেন?’ জানতে চাইলেন মি. বারলিং।

‘সাইলেন্সার,’ সংক্ষেপে বললেন পোয়ান্নো। ‘কাজ শেষে বাগানেই কোথাও ফেলে দিয়েছে ওটা। ভালমত খোঁজ করলে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।’

‘তারপরেও... বেশ ঝুঁকি নিয়েছে বলতে হবে।’

‘ঝুঁকি কোথায়? ডিনারের আগে আপনারা

সবাই ঘে-বার কামরায় পোশাক বদলাচ্ছিলেন, তখন কারও নীচে আসার সম্ভাবনাই ছিল না। কাজের অজুহাতে স্টাডিতে মসিয়ো লিচামের সঙ্গে দেখা করে কিন। পিস্তলটা আগেই হাতিয়ে রেখেছিল, কথার ফাঁকে তাঁর পাশে গিয়ে গুলি চালায়। তারপর গ্যান মোতাবেক জানালা গলে পালায়। গুলিটার কারণে একটু সমস্যায় পড়লেও সেটা কিন্তু চমৎকার সামাল দিয়েছে। ঘন্টার পাশ থেকে কুড়িয়ে এনে আয়নার তলায় ফেলে দিয়েছে মসিয়ো হ্যারি আর আমার অলক্ষে। কপাল ভাল যে কুড়ানোটা খেয়াল করেছিলাম, ফেলবার সময় তো দেখতেই পাইনি। আরেকটু হলেই পার পেয়ে যেত।’

‘আমার আর এসব ভাল লাগছে না।’ মার্শালকে আঁকড়ে ধরল ডায়ানা। ‘আমাকে এখন থেকে নিয়ে চলো, প্রিজ!’

গলা ঝাঁকারি দিলেন বারলিং। বললেন, ‘ডায়ানা, মাই ডিয়ার, তোমার বাবার উইল মোতাবেক...’

‘উইলের নিকুচি করি,’ সরোষে বলল ডায়ানা। ‘সম্পত্তি চাই না আমি, চাই শুধু মার্শালকে। দরকার হলে বাকি জীবন ভিক্ষে করে বেড়াব।’

‘তার দরকার হবে না, ডায়ানা,’ বলে উঠল হ্যারি। ‘আমার অংশের অর্ধেক তোমাকে দিয়ে দেব। আমার মাথায় ছিট ছিল বলে আমি তাঁর মেয়েকে পক্ষে বসাতে পারি না।’

আনন্দে চিৎকার দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরল ডায়ানা।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন মিসেস লিচাম। পোয়ান্নোকে বললেন, ‘দেখলেন, আয়নার ব্যাপারে আমার কথাই সত্যি হলো?’

‘কোন কথা?’ পোয়ান্নো অবাক।

‘ওই যে... বলেছিলাম না, আয়না ভাঙা অতন্ত? আমার ধারণা, স্টাডির আয়না ভেঙেছিল বলেই দুর্ভোগ নেমে এসেছে জেকরির কপালে। ধরা পড়তে হয়েছে ওকে।’

অজ্ঞান খুনির দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন পোয়ান্নো। ‘আমার মনে হয় না আপনার সঙ্গে ও দ্বিমুখ পোষণ করবে।’ ■

কাজী সারওয়ার হোসেন



মেঘ

২১ মার্চ-২০ এপ্রিল

মাসের মাঝামাঝি সময়ে বেকারদের কারও কারও কর্মসংস্থান হতে পারে। কোনও আইনি সমস্যার সমাধান হতে পারে। এ মাসে সার্বিকভাবে আপনার আয় বৃদ্ধি পেতে পারে। ছাত্র-ছাত্রীদের কেউ কেউ মাসের শেষ সপ্তাহে বিদেশে অধ্যয়নের সুযোগ পেতে পারেন। নির্মাণ সামগ্রী, কাঠ কিংবা আসবাবের ব্যবসায়ে হাত দিলে সুফল পেতে পারেন। পেশাজীবীদের কারও কারও পসার বৃদ্ধি পেতে পারে। প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য মাসটি বিশেষ শুভ। বিশেষ শুভ তারিখ: ৫, ৯, ১৪, ১৮, ২৩, ২৭।



বৃষ

২১ এপ্রিল-২১ মে

এ মাসে ফটকা ব্যবসায়ে বিনিয়োগের মাধ্যমে লাভবান হতে পারেন। শিক্ষা কিংবা গবেষণার জন্য সম্মাননা পেতে পারেন। পাওনা আদায়ের জন্য মাসের প্রথম সপ্তাহে উদ্যোগ নিন। বিদেশ যাত্রার ক্ষেত্রে মাসের শেষ সপ্তাহে সুযোগ আসতে পারে। এ মাসে আয়-ব্যয়ের মধ্যে সমন্বয় করে চলা মুশকিল হতে পারে। মামলা-মোকদ্দমার রায় আপনার অনুকূলে যেতে পারে। চাকরিতে কারও কারও পদোন্নতির সম্ভাবনা আছে। প্রেমের ব্যাপারে ভেবেচিন্তে

সিদ্ধান্ত নিন। বিশেষ শুভ তারিখ: ৩, ৯, ১৫, ১৮, ২৪, ৩০।



মিথুন

২২ মে-২১ জুন

তৈরি পোশাক কিংবা রাসায়নিক পদার্থের ব্যবসায়ে হাত দিলে সুফল পাবেন। শিল্পকলায় অবদানের জন্য সম্মাননা পেতে পারেন। এ মাসে আকস্মিকভাবে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। বেকারদের কারও কারও বিদেশ যাত্রায় প্রক্রিয়া চূড়ান্ত হতে পারে। পাওনা আদায়ের জন্য মাসটি শুভ। যারা চাকরি পরিবর্তনের কথা ভাবছেন, তাদের জন্য মাসের তৃতীয় সপ্তাহ বিশেষ শুভ। কেউ আপনাকে প্রেমের প্রস্তাব দিয়ে থাকলে এ মাসে তা চূড়ান্ত হতে পারে। বিশেষ শুভ তারিখ: ১, ৫, ১১, ১৪, ২০, ২৮।



ককট

২২ জুন-২২ জুলাই

এ মাসে কারও প্রেমের আহ্বানে সাড়া দিতে হতে পারে। চাকরিতে কারও কারও বেতন বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। মাসের মাঝামাঝি সময়ে বেকারদের কেউ কেউ বিদেশ যাত্রার সুযোগ পেতে পারেন। এ মাসে মামলা-মোকদ্দমা থেকে দূরে থাকুন। পাওনা আদায়ে প্রভাবশালী কারও সহযোগিতার প্রয়োজন পড়তে পারে। এ মাসে একাধিক

উপকারী বন্ধুর যৌক্তিক পেতে পারেন। যন্ত্রপাতির ব্যবসায়ে হাত দিলে সুফল পেতে পারেন। প্রেমের ক্ষেত্রে ভুল বোঝাবুঝির অবসান হবে। বিশেষ শুভ তারিখ: ৪, ১০, ১৬, ১৯, ২৫, ২৯।



সিংহ

২৩ জুলাই-২৩ আগস্ট

শিল্পকলায় অবদানের জন্য সম্মাননা পেতে পারেন। সামাজিক কর্মকাণ্ডে ব্যস্ততা বৃদ্ধি পেতে পারে। শিক্ষার্থীদের কেউ কেউ এ মাসে শিক্ষা-সফরের সুযোগ পেতে পারেন। মাসের মাঝামাঝি সময়ে চাকরিতে কারও কারও পদোন্নতির সম্ভাবনা আছে। ফটকা ব্যবসায়ে বিনিয়োগের মাধ্যমে লাভবান হতে পারেন। মামলা-মোকদ্দমা থেকে দূরে থাকুন। পারিবারিক দ্বন্দ্বের অবসান হবে। প্রেমের ক্ষেত্রে আগের ব্যর্থতা ঘুচে যেতে পারে। দূরের যাত্রায় সতর্ক থাকুন। বিশেষ শুভ তারিখ: ১, ৭, ১৪, ১৯, ২৫, ২৮।



কন্যা

২৪ আগস্ট-২৩ সেপ্টেম্বর

ব্যবসায়ে আগের ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার সুযোগ পাবেন। পাওনা আদায়ের জন্য মাসের মাঝামাঝি সময়ে উদ্যোগ নিন। শিক্ষা কিংবা গবেষণার জন্য সম্মাননা পেতে পারেন। বৈদেশিক বাণিজ্যে শুভ যোগাযোগ ঘটতে পারে। সামাজিক কর্মকাণ্ডে ব্যস্ততা বৃদ্ধি পেতে পারে। জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের নিষ্পত্তি

হতে পারে। এমন কারও সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে যার সামাজিক অবস্থান আপনার চাইতে উঁচুতে। দূরের যাত্রা শুভ। বিশেষ শুভ তারিখ: ২, ৫, ১১, ১৬, ২৩, ৩০।



তুলা

২৪ সেপ্টেম্বর-২৩ অক্টো

মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তেজিভাব বিরাজ করবে। বেকারদের কেউ কেউ প্রত্যাশার চেয়েও ভাল চাকরি পেতে পারেন। পারিবারিক দ্বন্দ্বের অবসান হতে পারে। এ মাসে সার্বিকভাবে আপনার আয় বৃদ্ধি পেতে পারে। প্রেমের ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকলেও শেষ পর্যন্ত জয়ের মালা আপনার গলাতেই শোভা পাবে। এ মাসে একাধিক উপকারী বন্ধুর দেখা পাবেন। শিল্পকলা কিংবা সাহিত্যকর্মের জন্য সম্মাননা পেতে পারেন। দূরের যাত্রা শুভ। বিশেষ শুভ তারিখ: ৫, ৮, ১৫, ১৯, ২৪, ৩০।



বৃশ্চিক

২৪ অক্টো-২২ নভে

যে কোনও তরল পদার্থের ব্যবসায় হাত দিলে সুফল পেতে পারেন। বেকারদের কারও কারও জন্য মাসটি সাফল্যের বার্তা বয়ে আনতে পারে। বিদেশ যাত্রার ক্ষেত্রে নতুন সুযোগ পেতে পারেন। মাসের মাঝামাঝি সময়ে চাকরিতে কারও কারও পদোন্নতি হতে পারে। কোনও ঘনিষ্ঠ বন্ধু প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে পারে। প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য মাসটি বিশেষ শুভ। এ মাসে কোনও আইনি জটিলতায় জড়ানো উচিত হবে

না। দূরের যাত্রা শুভ। রাজনীতি থেকে দূরে থাকুন। বিশেষ শুভ তারিখ: ৫, ৯, ১৫, ১৮, ২৭, ৩০।



ধনু

২৩ নভে-২১ ডিসে

ব্যবসায়িক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে উদ্যোগ নিন। সজনশীল কর্মকাণ্ডের সুবাদে বিদেশ যাত্রার সুযোগ আসতে পারে। এমন কারও সঙ্গে রোমাঞ্চিক সম্পর্কের সূচনা হতে পারে যার সামাজিক অবস্থান আপনার চাইতে উঁচুতে। চাকরিতে কারও কারও পদোন্নতির সম্ভাবনা আছে। বেকারদের কেউ কেউ মাসের শেষ সপ্তাহে বিদেশ-যাত্রার সুযোগ পেতে পারেন। এ মাসে অস্থাবর সম্পত্তির মালিকানা প্রাপ্তি ঘটতে পারে। বিশেষ শুভ তারিখ: ৩, ৮, ১৪, ১৮, ২৪, ২৭।



মকর

২২ ডিসে-২০ জানু

মাসের শুরুতেই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তেজিভাব বিরাজ করবে। যে কোনও চুক্তি সম্পাদনের জন্য মাসটি শুভ। পারিবারিক দ্বন্দ্বের অবসান হবে। জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের নিষ্পত্তি হতে পারে। শিল্প-সংস্থাপন কিংবা প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য মাসটি শুভ। ফটিকা ব্যবসায় বিনিয়োগের মাধ্যমে লাভবান হতে পারেন। বেকারদের কেউ কেউ মাসের মাঝামাঝি সময়ে বিদেশ যাত্রার সুযোগ পেতে পারেন। এ মাসে প্রেমের ক্ষেত্রে আগের বার্ষতা ঘুচে যেতে পারে। বিশেষ শুভ তারিখ: ১, ৮, ১৪,

১৯, ২৫, ২৮।



কুন্ড

২১ জানু-১৮ ফেব্রু

এ মাসে কর্মস্থলে সার্বিক পরিস্থিতি আপনার অনুকূলে থাকবে। যৌথ বিনিয়োগ শুভ। খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসায় হাত দিলে সুফল পেতে পারেন। প্রেমের ব্যাপারে এ মাসে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। সম্ভাব্যক্ষেত্রে বিয়ের কথাবার্তা পাকাপাকি হতে পারে। এ মাসে আকস্মিকভাবে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। বিদেশ যাত্রার ক্ষেত্রে বিরাজমান জটিলতার অবসান হবে। নতুন চাকরিতে কেউ কেউ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পেতে পারেন। তীর্থ ভ্রমণের জন্য মাসটি বিশেষ শুভ। বিশেষ শুভ তারিখ: ৪, ১০, ১৬, ১৯, ২২, ২৮।



মীন

১৯ ফেব্রু-২০ মার্চ

যে কোনও তরল পদার্থের ব্যবসায় হাত দিলে সুফল পাবেন। এ মাসে কোনও আইনি সমস্যার সমাধান হতে পারে। কোনও ঘনিষ্ঠ বন্ধু প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে পারে। পারিবারিক সমস্যার সমাধানে আপনার উদ্যোগ ফলপ্রসূ হতে পারে। পরকীয়ার অপবাদ ঘুচতে পারে। চাকরিতে কারও কারও কর্মস্থল পরিবর্তনের সম্ভাবনা আছে। শিক্ষার্থীদের কারও কারও বিদেশে অধ্যয়নের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত হতে পারে। দূরের যাত্রায় বিশেষ কাউকে সঙ্গে নিন। বিশেষ শুভ তারিখ: ৩, ৭, ১৬, ১৯, ২৫, ২৯।

আপনার প্রশ্ন ও সমাধান

শামীমা পারভিন (শীমু)

জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা।

● জন্ম: ২৬-৭-৮৬। আমার

কবে নাগাদ বিয়ে হতে পারে?

● এ বছরের শেষাংশে বিয়ের

জোর সম্ভাবনা আছে।

● হাসনা হেনা

বারখরিয়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

● জন্ম: ১০-৯-৮৭। আমি কি

কখনও বিদেশ যেতে পারব?

●● এখন থেকে দু'বছরের

মধ্যে সুযোগ আসতে পারে।

ফারজানা করিম

সিদ্ধেশ্বরী, ঢাকা।

● জন্ম: ৫-১২-৯২। আমি কি

সংগীতে সুনাম অর্জন করতে

পারব?

●● এ ক্ষেত্রে মোটামুটি

সুনাম অর্জনের সম্ভাবনা আছে।

ফরিদ গাজী

মিরেরসরাই, চট্টগ্রাম।

● জন্ম: ১৫-১১-৭৫। প্রায়ই

শরীর অসুস্থ থাকে, প্রতিকার

কী?

●● ডান হাতের কনিষ্ঠায় ৭-

৮ রতি ওজনের রক্ত প্রবাল

(রূপোয়) পরলে উপকার

পেতে পারেন।

মৌমিতা

গ্রীন রোড, ঢাকা।

● জন্ম: ১৫-১২-৮৭।

ভবিষ্যতে আমি কি

লেখালেখিতে সুনাম অর্জন

করতে পারব?

●● চর্চা চালিয়ে গেলে

আগামী ৩-৪ বছরের মধ্যে

এক্ষেত্রে পরিচিতি লাভ করা

সম্ভব।

আসাদুর রহমান

কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

● জন্ম: ২৫-৭-৮০।

ব্যবসায়ে কেবলই লোকসান

হচ্ছে...

●● ডান হাতের মধ্যমা

৭-৮ রতি ওজনের ক্যাটস

আই (রূপোয়) পরলে উপকার

পেতে পারেন।

আইরিন সুলতানা

ভালুকা, ময়মনসিংহ।

● জন্ম ১৭-৮-৮৪। আমার

কবে নাগাদ বিয়ে হতে পারে?

●● বিয়েতে কিছুটা সমস্যা

বিরাজ করছে। ৪ ক্যারেট

ওজনের কাট রুবি ডান হাতের

অনামিকায় (সোনায়) পড়ন।

আশা করা যায় আগামী বছরের

প্রথমার্ধের মধ্যে এক্ষেত্রে

সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে।

রাফিদ

শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।

● জন্ম: ৮-১-৭৬। ব্যবসায়ে

কেবলই লোকসান হচ্ছে;

প্রতিকার কী?

●● ডান হাতের মধ্যমা

৭-৮ রতি ওজনের ইন্দ্রনীলা

(রূপোয়) পরলে উপকার

পেতে পারেন।

সায়মা সুলতানা

বকশীগঞ্জ, জামালপুর।

● জন্ম: ১১-২-৯০। যাকে

ভালবাসি তার জন্ম তারিখ

২৮-৫-৮৭। এক্ষেত্রে ফলাফল

কী হতে পারে?

●● এই সম্পর্ক বিয়েতে

গড়ানোর সম্ভাবনা আছে।

আলী আকবর

আখাউড়া, বি. বাড়িয়া।

● জন্ম: ২৭-৫-৮৩। আমার

জন্ম কোন ব্যবসা উপযোগী

হবে?

●● যে কোনও তরল পদার্থ

কিংবা রাসায়নিক দ্রব্যের

ব্যবসায়ে হাত দিলে সুফল

পেতে পারেন।

নাসরিন

কাঠালিয়া, ঝালকাঠি।

● জন্ম: ১৮-৯-৫। আগামী

বছর এইচ. এস. সি. দেব;

ফলাফল কেমন হতে পারে?

●● জিপিএ-৫ পাওয়ার

সম্ভাবনা আছে।

লামিয়া

রামগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর।

● জন্ম: ১৯-১-৮৯। যাকে

ভালবাসি তার জন্ম তারিখ

১৮-৮-৮৫; এক্ষেত্রে ফলাফল

কী হতে পারে?

●● প্রেমে সাফল্যের সম্ভাবনা

তেমন দেখা যাচ্ছে না; তবে

আপনার বিবাহিত জীবন সুখের

হবে।

রেজাউল হক

কানাইখালী, নাটোর।

● জন্ম: ২৭-১১-৮৬।

ভবিষ্যতে আমার কি বিদেশ

যাত্রা হতে পারে?

●● এখন থেকে বছর

দুয়েকের মধ্যে এক্ষেত্রে সুযোগ

আসতে পারে।

অর্পিতা

বিরল, দিনাজপুর।

● জন্ম: ১৬-২-৮৮।

ভবিষ্যতে কোন পেশায় গেলে

ভাল করব?

●● শিক্ষকতা কিংবা

গবেষণামূলক পেশায়

সাফল্যের সম্ভাবনা আছে।

সৈন্তুতি

লালমাটিয়া, ঢাকা।

● জন্ম: ৫-৬-৮৫। আমার

সার্বিক উন্নতির জন্য কী পথের

পরা উচিত?

●● ডান হাতের কনিষ্ঠায় ৭-

৮ রতি ওজনের ব্রাজিলিয়ান

পান্না (রূপোয়) পরলে উপকার

পেতে পারেন। ■

এ বিভাগে চিঠির উত্তর পেতে হলে ইংরেজিতে সঠিক জন্ম তারিখ,

পুরো ঠিকানা ও এক কপি ছবি সহ লিখতে হবে।

পিশাচবাড়ি

আফজাল হোসেন

উলঙ্গ
মূর্তিটির
উপরের
অংশ
মেয়েমানুষদের
মত
আর
নীচেরটুকু
পুরুষের।



বিকেল থেকেই ছাই রঙা মেঘে ঢেকে যাচ্ছিল আকাশ। সন্ধ্যা হয়েছে অনেকক্ষণ। গাড়ি অন্ধকারে ডুবে আছে চারদিক। একটু পর পর বিজলি চমকচ্ছে। সেই সঙ্গে গুড়গুড় করে মেঘ ডাকছে। দমকা হাওয়া ছেড়েছে।

অনীক মোহনপুরে তার মামাবাড়ির অন্ধকার বারান্দায় বসে আছে। তার হাতে ধোঁয়া ওঠা চায়ের মগ। সে চায়ের মগে চুমুক দিচ্ছে আর মুগ্ধ চোখে আশপাশটা দেখছে।

বারান্দা থেকে বাড়ির দিঘি আকৃতির পুকুরটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। পুকুরের টলমলে পানিতে বিজলির নীল আলোর ঝিলিক খেলে যাচ্ছে। মাঝে-মাঝে বড়-বড় মাছ ঘাই মারছে। ক্ষণিকের জন্য পানিতে আলোড়ন সৃষ্টি হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। পুকুর পাড়ের ফাঁকা-ফাঁকাভাবে বেড়ে ওঠা নারকেল-সুপারি গাছগুলো যেন দমকা বাতাসে ডানা মেলে দিয়েছে।

রাজপ্রাসাদের মত পুরানো প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ির পেছন দিক এটা। বাড়ির চারপাশ উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পূর্ব পাশে বাড়ির সামনের দিকটায় রয়েছে পাঁচিল সমান এক লোহার গেট। গেট দিয়ে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলে হাতের বাম পাশে অনেকখানি জায়গা জুড়ে ফুলের বাগান। আর ডান পাশে পাকা করে বানানো কুকুরের ঘর। বেশ কয়েকটা ব্লাড হাউণ্ড কুকুর রয়েছে এই বাড়িতে।

অনীকের মগের চা শেষ। খালি মগ হাতে ও রকিং চেয়ারে দোল খাচ্ছে। ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা

হাওয়ার ঝাপটা শরীর জুড়িয়ে দিচ্ছে। বোঝাই যাচ্ছে ভাল রকমের একটা ঝড়-বৃষ্টি হবে। প্রকৃতিতে সেই আগমনী ঝড়-বৃষ্টির সাজ-সাজ রব।

অনীকের কাছে মামা বাড়ি আসাটাই সার্থক মনে হচ্ছে। কী অদ্ভুত সুন্দর মায়াবী এক রাত! ঢাকায় বসে এমনভাবে প্রকৃতির সাথে নিবিড় হওয়া সম্ভব নয়।

সন্ধ্যার ঠিক আগ মুহূর্তে অনীক যখন এ বাড়িতে এসে পৌছল তখন গোধূলির স্নান আলো আর মেঘের ধূসরতার মাঝে প্রকাণ্ড এই বাড়িটা দেখে কেমন গা ছমছম লাগছিল। এখন ভীতি ভাবটা আর নেই।

অনীকের ইয়ার ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হয়েছে এক মাস আগে। গত এক মাস ঢাকায় ধানমণ্ডির নিজেদের বাড়িতে মনমরা হয়ে পড়ে রয়েছে সে। অথচ পরিকল্পনা ছিল পরীক্ষা শেষে দেশের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান ঘুরে বেড়ানোর। অনীকের দুই বন্ধু রাতুল আর সাগরকে নিয়ে কুয়াকাটায় যাবার প্রস্ততি যখন একেবারে চূড়ান্ত, হোটেল সেকতে রুম বুকিংও হয়ে গিয়েছে, তখন হঠাৎ রাতুলের দাদা মারা যান। সব পরিকল্পনা ভেঙে যায়। তাদের আর যাওয়া হয় না। শেষ পর্যন্ত অনীক সিদ্ধান্ত নেয় মামার এখানে বেড়াতে আসবে। মামার এখানে বেড়াতে আসার কথা শুনে অনীকের মা কঠিন গলায় নিষেধ করেন, 'না, মামার ওখানে তুমি বেড়াতে যেতে পারবে না। তোমার মামা একা মানুষ, বিয়ে-থা করেননি-শুধু-শুধু তাঁর উপর ঝামেলার সৃষ্টি করা। মামার ওখানে যাওয়ার চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলো।'

অনীকের মায়েরা তিন বোন এক ভাই। ভাই-বোনদের মধ্যে তাঁদের এই ভাই-ই সবার বড়। আর অনীকের মা হচ্ছেন সেজো।

অনীকের বড় খালারা সপরিবার দুবাই সেটেন্ড। ছোট খালার বাড়ি বরিশালে। আর মামা সেই কবে নাকি ইংল্যান্ড থেকে পড়াশোনা শেষে ফিরে এসে মোহনপুরের এই অজ পাড়াগাঁয়ে পড়ে আছেন। নিঃসঙ্গ একাকী জীবন তাঁর। পুরানো আমলের ভগ্নাথার রাজপ্রাসাদের মত এই বাড়িতে তিনি একা থাকেন। তবে তিনি একেবারে একা নন। তাঁর একজন

কেয়ারটেকার কাম মালি কাম বাবুচি রয়েছে। মামার এই সঙ্গীর নাম সোবাহান মিয়া।

সোবাহান মিয়াকে দেখে মনে হয় সে-ও মামার মত নিভৃতচারী। চেহারায় কেমন রুক্ষ বদমেজাজী ভাব। অসম্ভব গম্ভীর। বয়স কত তা ঠিক বোঝা যায় না। চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে হবে হয়তো। খুবই শক্ত-সমর্থ লোক। অনীকের ভারী-ভারী স্টকেস দুটো এক সঙ্গে কত সাবলীলভাবেই নিয়ে এল ওর থাকার কামরায়।

পূব পাশের বাড়ির সামনের দিকের লম্বা টানা বারান্দা ধরে আসার সময় অনীক লক্ষ করেছে এ বাড়ির অনেক কামরাই তালাবদ্ধ। এত বড় বাড়িতে মাত্র দু'জন লোক থাকলে অধিকাংশ কামরা তালাবদ্ধ থাকবে এটাই স্বাভাবিক। থাকার কামরায় এসে অনীকের মনটা ভরে যায়। কামরাটা দোতলার দক্ষিণ পশ্চিম কোণে। খুবই গোছানো রুচিশীল কামরা। কামরায় পুরানো আমলের বাহারি ডিজাইনের কারুকাজ করা বড় একটা কাঠের আলমারি। পাশেই বিভিন্ন বইয়ে ঠাসা তাক। বিশাল এক খাট। খাট না বলে পালঙ্ক বললেও ভুল হবে না। জানালার কাছে পুরানো আমলের হাতলওয়ালা চেয়ার-টেবিল। মুঝেতে সবুজ রঙের কাপেটি। দুর্বাঘাসের মত দেখতে। জানালায় ঝুলছে সবুজ ভেলভেট কাপড়ের পর্দা। জানালার ঘিলের সাথে পেঁচানো মানিপ্ল্যান্ট লতা। যেন অনীকের জন্যই কামরাটা যত্ন করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

কামরার সঙ্গে লাগোয়া পশ্চিমমুখী ছোট এক চিলতে বারান্দা। বারান্দায় একটা রকিং চেয়ার। সেই রকিং চেয়ারে বসেই অনীক প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য উপভোগ করছে।

অনীক বলতে গেলে মায়ের নিষেধ অমান্য করে মামার এখানে বেড়াতে এসেছে। তার মা কিছুতেই তাকে আসতে দিতে চাননি। অনেক পীড়াপীড়ি করে মায়ের নিষেধ উপেক্ষা করে অবশেষে এসেছে।

অনীকের কাছে একটা ব্যাপার অদ্ভুত লাগে। তার মামার সঙ্গে মা-খালাদের কারওই কোনও সম্পর্ক নেই। নেই কোনও যোগাযোগ। এমনকী মা-খালারা মামার নাম শুনলেও

এড়িয়ে যেতে চান।

অনীক রকিং চেয়ারে চোখ বন্ধ করে দোল খাচ্ছে। তার চোখে তন্দ্রা ভাব চলে এসেছে। হঠাৎ পেছন থেকে আসা ভারী ঝসঝসে কর্কশ কণ্ঠে তার তন্দ্রা ভাবটা ছুটে গেল। ভারী কণ্ঠটি বলল, 'নীচে খাবার ঘরে চলেন। সাহেব বসে আছেন। আপনাকে বেঁচে ডাকছেন।'

অনীক ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে সোবাহান মিয়া। সোবাহান মিয়া কখন এসে অন্ধকারে পেছনে দাঁড়াল সে একটুও টের পায়নি। লোকটা কেমন যেন বিড়ালের মত নিঃশব্দে হাঁটা-চলা করে। এর আগে যখন চা আর মোমদানি নিয়ে এল তখনও সে এভাবে নিঃশব্দে এসেছে।

অনীক চেয়ার ছেড়ে উঠতে-উঠতে বলল, 'চলুন।'

সোবাহান মিয়া অনীকের কামরার ভিতরে জ্বালানো মোমদানিটা নিয়ে সামনে-সামনে এগোতে লাগল। মোমদানিটায় তিনটা মোমবাতি জ্বলছে। কিন্তু সেই আলো অন্ধকারকে তেমন দূর করতে পারছে না। বরং যেন আশ-পাশের অন্ধকারকে আরও ঘন করছে। মাঝে-মাঝে হাওয়ার ঝাপটায় মোমবাতির আলো দুলে-দুলে উঠছে।

মামার সঙ্গে এখন পর্যন্ত দেখা হয়নি অনীকের। বিশ-একুশ বছর আগে একবার নাকি অনীকদের বাড়িতে গিয়েছিলেন মামা। তখন অনীকের বয়স এক কি দেড় বছর। ওই বয়সের স্মৃতি কারও মনে থাকার প্রশ্নই ওঠে না। বেশ উত্তেজনা অনুভব করছে অনীক। বড় হবার পর প্রথম মামাকে দেখবে। একটু ভয়-ভয়ও লাগছে। মামা হয়তো কিছু না জানিয়ে এভাবে হট করে চলে আসায় রাগ করতেও পারেন।

খাবার ঘরের টেবিলের উপর একটা মোমদানি। মোমদানিটায় এক সঙ্গে অনেকগুলো মোমবাতি জ্বলছে। মোট তেরোটা। ঘরটা বেশ আলোকিতই। খাবার টেবিলের এক কোণের চেয়ারে অসম্ভব সুদর্শন চেহারার এক লোক বসে আছেন। গায়ে ইত্রি করা কালো রঙের পাঞ্জাবি। পরিপাটি করে আঁচড়ানো চুল। চেহারায় অভিজাত্যের ছাপ।

লোকটা তাকিয়ে রয়েছেন জ্বলন্ত মোমবাতিগুলোর দিকে। মোমবাতির আলো পড়ে চোখ কেমন জ্বল-জ্বল করছে।

ইনিই কি অনীকের মামা? সেটা কী করে?! লোকটার চেহারায় তারুণ্যের জৌলুস। বলিষ্ঠ সূতাম দেহ। মাথার চুলগুলো ঘন কালো। গায়ের রং টকটকে কর্শা।

অনীকের মায়ের বয়স পঞ্চাশ ছুই-ছুই। এরই মধ্যে মাথার প্রায় সব চুল পেকে গেছে। মায়ের চেয়ে মামা নাকি দশ-বারো বছরের বড়। সেই হিসেবে মামার বয়স ষাট-বাব্বি হবার কথা। কিন্তু এই লোকটাকে দেখে মনে হচ্ছে তার বয়স পঁচিশ থেকে তিরিশের একটুও বেশি নয়। চুল কালো—এর কারণ হিসেবে ধরে নেওয়া যায় তিনি চুল কলপ করেছেন। কিন্তু চেহারায় যুবকসুলভ জেন্সা?!

লোকটা গলা ঝাঁকি দিয়ে কোমল গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'অনীক, তোমার পরীক্ষা কেমন হয়েছে?'

অনীক বুঝতে পারল এই লোকই তার মামা। সে ভুড়তি ভাব সামলে বলল, 'বেশ ভাল হয়েছে।' মনে-মনে বলল, মামা জানল কী করে যে সে ইয়ার ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছে! মামাকে তো কোনও কিছু জানিয়ে আসেনি।

'তোমার মা কেমন আছে?'

'মা তেমন ভাল নেই। কিছুদিন ধরে ডায়াবেটিসে খুব কান্না হয়ে গিয়েছে। ব্লাড-প্রেশারও ওঠা-নামা করে।' অনীকের মনে ভাবনা জাগল, মামা তাঁর চেহারা এবং শরীর এখনও এতটা অটুট রাখলেন কী করে?!

মামা টেবিলের উপর উণ্ডু করা প্লেট চিত করতে-করতে বললেন, 'সারাদিন জার্নি করে এসেছ, নিশ্চয়ই অনেক ঝিদে পেয়েছে—বেঁচে বসা যাক।'

অনীক মামার পাশে চেয়ার টেনে বসল। মামা গলার স্বর একটু উঁচু করে, 'সোবাহান' বলে ডাক দিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে সোবাহান মিয়া ভোজবাজির মত দরজার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। টেবিলে আগে থেকেই অনেক খাবার-দাবার ঢাকনা দিয়ে ঢাকা ছিল। ঢাকনা সরিয়ে সোবাহান মিয়া খাবার দিতে লেগে গেল। অনীকের প্লেটে প্রথমে সরু চালের খোঁয়া ওঠা

গরম ভাত দিল। এরপর এক-এক করে বেগুন ভাজা, শূটকি মাছের ভর্তা আর লালচে করে ভাজা আশ্র একটা কী মাছ যেন তুলে দিল। মাছটা বেশ বড়। সমস্ত প্লেট দখল করে নিয়েছে।

অনীক অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এটা কী মাছ?'

সোবাহান মিয়া বসবসে গলায় উত্তর দিল, 'সরগুটি মাছ। বাড়ির পুকুর থেকেই ধরা।'

অনীক লক্ষ করল মামা প্লেটে ভাত, বেগুন ভাজা, শূটকি ভর্তা বা সরগুটি মাছ কিছুই নিলেন না। শুধু ভুনা মাংসের বাটি থেকে বেশ কয়েক টুকরো মাংস পাতে নিলেন।

'মামা, আপনি ভাত নেবেন না?' কথাটা মুখ ফসকেই বেরিয়ে পড়ল অনীকের।

মামা তাঁর স্বভাবসুলভ শান্ত-কোমল গলায় বললেন, 'না, আমি রাতে ভাত খাই না-শুধু মাংস খাই। এটাই আমার প্রতি রাতের খাবারের মেনু।'

অনীকের বেশ অবাক লাগল, প্রতি রাতেই শুধু মাংস খান-এটা কেমন অভ্যাস!

সরগুটি মাছটা খেতে বেশ লাগছে। তবে কোনও ঝোলই নেই, একেবারে শুকনো করে ভাজা। অনীকের অভ্যেস ঝোল দিয়ে ভাত মাখিয়ে খাওয়ায়। সামনে আর একটা বাটিতে ঝোল-ঝোল কী একটা পদ দেখতে পেল। সেদিকে তাকিয়ে পাশে দাঁড়ানো সোবাহান মিয়াকে উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞেস করল, 'এটা কী রান্না?'

'কবুতরের বাচ্চার মাংস কাঁঠালের বিচি দিয়ে ঝোল-ঝোল করে রান্না হয়েছে। চিলেকোঠার ঘলঘলিতে বুনো কবুতর বাসা বেঁধেছে। সেই বাসা থেকেই বাচ্চা চুরি করে এনেছি।'

অনীক নিজেই বাটি টেনে নিয়ে কিছুটা পাতে নিল। খেয়ে দেখল অসাধারণ স্বাদ! যেন স্বর্গীয় খাবার!

মামা তাঁর প্লেটে নেওয়া মাংসের টুকরোগুলোই একটা-একটা করে অনেকক্ষণ ধরে তারিয়ে-তারিয়ে খাচ্ছেন। দেখে মনে হচ্ছে মামা খুবই ভুগি পাচ্ছেন।

অনীক কবুতরের বাচ্চার ঝোল দিয়ে খাওয়া শেষে নতুন করে প্লেটে ভাত নিয়ে ভুনা মাংসের বাটিটা সামনে টেনে আনল। তাই দেখে সোবাহান মিয়া বাধা দিয়ে বলল, 'আপনার এই মাংসটা খাওয়ার দরকার নেই। আপনি আরও খানিকটা কবুতরের বাচ্চার ঝোল নিয়ে খান। না হয় আর একটা মাছ ভাজা দেই, সেটা খান।'

অনীক অবাক হয়ে বলল, 'মাংস খেলে কী সমস্যা?'

সোবাহান মিয়া বলল, 'মাংসটা তেমন ভাল নয়, বাসি। এটা রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ করা মাংস। এখানে কারেন্ট নেই, ফ্রিজ নেই-এ ছাড়া উপায়ই বা কী! আপনার নাকে গন্ধ লাগতে পারে।'

অনীক বলল, 'দেখিই না অন্তত এক টুকরো পাতে নিয়ে-খেতে কেমন লাগে। মামা যেহেতু খাচ্ছেন, আমিও নিশ্চয়ই পারব।'

মামা আর সোবাহান মিয়া চোখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। যেন তাদের মধ্যে চোখে-চোখে গোপন অর্থপূর্ণ কোনও আলাপ হলো। এরপর মামা বললেন, 'অনীক, তোমার পেট খারাপ করতে পারে।'

অনীক তাদের নিষেধ উপেক্ষা করে মাংস পাতে নিতে-নিতে বলল, 'দেখিই না একটু খেয়ে, কেমন লাগে। ভাল না লাগলে আর নেব না।'

মামা এবং সোবাহান মিয়া দু'জনই একেবারে চুপ মেয়ে গেলেন। আর কিছুই বললেন না।

মাংস মুখে নিয়ে কয়েকটা চিবুনি দিতেই অনীকের চোখ আবেশে নিমীলিত হয়ে এল। এত সুস্বাদু মাংস বোধ হয় এর আগে জীবনে আর কোনও দিনও খায়নি সে।

অনীক ভুগি ভরা গলায় বলল, 'এটা কীসের মাংস? এত সুস্বাদু!!'

সোবাহান মিয়া প্রথমতঃ গলায় বলল, 'হরিণের মাংস। তিন মাস আগে পাখরঘাটা থেকে আনা হয়েছিল। রোদে শুকিয়ে এত দিন ধরে রেখে দিয়েছি।'

এর আগে কোনও দিনও হরিণের মাংস খাওয়া হয়নি অনীকের। অনেকের মুখেই

হরিণের মাংসের স্বাদের গল্প শুনেছে। গল্প শুনে-শুনে হরিণের মাংস খাওয়ার বাসনা তার অনেক দিনের। তাই মাংসটা হরিণের মাংস ছেঁকে মাংসের স্বাদ যেন আরও অনেকগুণ বেড়ে গেল। সে আরও বেশ কয়েক টুকরো পাতে ভুলে নিল।

মামার খাওয়া শেষ। তিনি প্লেটে হাত ধুতে-ধুতে বললেন, ‘অনীক, আমি এখন উঠছি। কাল আবার তোমার সাথে দেখা হবে। তোমার যা কিছু প্রয়োজন পড়ে সোবাহানকে বলবে।’

মামা আলো হাতে না নিয়েই গটগট করে খাবার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

দুই

মাঝ রাত্রে অনীকের ঘুম ভেঙে গেল। বাইরে ভয়ানক ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে। ঘুমোবার আগে দক্ষিণের জানালাটা খোলা রেখেই শুয়ে পড়েছিল ও। ঝিরঝিরে হাওয়া বইছিল তখন। এখন সেই খোলা জানালা দিয়ে বৃষ্টির ছাঁট আসছে আর এক-এক বার বিকট শব্দে বিদ্যুৎ চমকানোর নীল আলোতে সমস্ত ঘর আলোকিত করে দিচ্ছে।

ঝড়-বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়েও অন্য রকম অদ্ভুত একটা শব্দ কানে আসছে অনীকের। মনে হচ্ছে অনেকগুলো মেয়েমানুষ একসঙ্গে হিস-হিস করে শুভিয়ে-শুভিয়ে কাদছে। ঝড়ের শব্দ কি এটা?!

শব্দটা আরও স্পষ্ট হলো। অনীকের বুকটা টিপ-টিপ করে উঠল। শব্দটা খাটের নীচ থেকে আসছে।

অনীক বিছানায় শোয়া অবস্থায়ই উগুড় হয়ে মশারির ভিতর থেকে মাথা বের করে খাটের নীচে উঁকি দিল। বিজলি চমকানোর আলোয় সে যা দেখতে পেল তাতে তার শিরদাঁড়া বেয়ে ভয়ের ঠাণ্ডা একটা স্রোত বয়ে গেল।

খাটের নীচে অনেকগুলো কাটামুণ্ড। সবগুলো মেয়ে মানুষের। কাটামুণ্ডগুলো মেঝের উপর এলোমেলো লম্বা চুল ছড়িয়ে রক্তে মাখামাখি হয়ে কিলবিলিয়ে নড়াচড়া করছে। ওগুলোর ফ্যাকাসে চোখগুলো পলকহীন চেয়ে

রয়েছে।

সকাল নয়টা নাগাদ অনীকের ঘুম ভাঙল। রাতের কথা মনে পড়তেই সঙ্গে-সঙ্গে উপুড় হয়ে খাটের নীচে উঁকি দিল। নাহ, কিছুই নেই খাটের নীচে। ঝকঝকে, তকতকে পরিষ্কার মেঝে। নিশ্চয়ই ওটা দুঃস্বপ্ন ছিল! রাতে অনেক খাওয়া হয়েছিল তাই পেটে সমস্যা হয়ে দুঃস্বপ্ন দেখেছে!

মন থেকে ভীতি দূর করে উঠে পড়ল অনীক। আড়মোড়া ভেঙে বিছানা থেকে নেমে দরজা খুলে বাড়ির সামনে পূর্বপাশের টানা লম্বা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। ঝড়-বৃষ্টির পরে পরিষ্কার রোদ্রোজ্জ্বল সকাল। রোদের আলোটা মিষ্টি লাগছে। বারান্দার রেলিঙে হাত রেখে নীচের দিকে তাকাল। সোবাহান মিয়া কুকুরগুলোকে খাচার বন্দি করছে। রাতে কুকুরগুলোকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

অনীক শুনে দেখল মোট তেরোটা কুকুর। সবগুলোর গায়ের রঙই কালো। কুকুরগুলোকে খাচার বন্দি করার পর সোবাহান মিয়া কুকুরের খাবার নিয়ে এল। খাবার দেখে কুকুরগুলো চঞ্চল হয়ে উঠল। বাইরে থেকে সোবাহান মিয়া খাচার ভিতরে চিমসানো শুকনো খাবার ছুঁড়ে-ছুঁড়ে মারতে লাগল। ছোঁড়া খাবারের টুকরো কুকুরগুলো তৎক্ষণাৎ ঝাপিয়ে পড়ে হটোপুটি করে খেয়ে ফেলছে।

অনীক চোঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘সোবাহান কাকু, কুকুরকে কী খেতে দিচ্ছেন?’

সোবাহান মিয়া বিরক্তি ভরা চোখে অনীকের দিকে তাকিয়ে খসখসে গলার স্বরটা একটু তুলে বলল, ‘শুকনো মাংস।’

অনীক আবার চোঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘কীসের মাংস?’

সোবাহান মিয়া আগের মত বিরক্ত চোখে অনীকের দিকে তাকিয়ে অনীহা ভরা গলায় বলল, ‘গরুর মাংস। কুকুরের জন্য এক সাথে অনেকগুলো মাংস লবণ মাখিয়ে শুকিয়ে রাখা হয়।’

কুকুরদের খাওয়ানো শেষ। সোবাহান মিয়া বাড়ির ভিতরে ঢুকে গেল। অনীকের চোখ পড়ল দক্ষিণ পাশের ফুলের বাগানের দিকে।

আচর্য! সারা বাগান জুড়ে শুধু রক্ত জবা ফুলেরই গাছ। এলোমেলোভাবে বেড়ে ওঠা। অবহেলা আর অযত্নে জংলা হয়ে রয়েছে। ফুলে-ফুলে লাল হয়ে রয়েছে গাছগুলো। মাটিতেও বেশ কিছু ফুল ঝরে পড়ে রয়েছে। মনে হয় গত রাতের ঝড়ের তাগবে ফুলগুলো ঝরে পড়েছে।

মোটা তেরোটা গাছ!!!

বেলা এগারোটা। অনীক পচ্চিমের ছোট্ট বারান্দায় বসে অলস ভঙ্গিতে একটা পত্রিকার পাতা উল্টাচ্ছে।

হঠাৎ অনীকের চোখ পড়ল নীচে পুকুরের শান বাঁধানো ঘাটলায়। ঘাটলায় সোবাহান মিয়া বড়শি ফেলে ঝিম মেরে বসে আছে। কিছুক্ষণ যেতেই বড়শিতে একটা মাছ তুলল। ঝকঝকে রূপালী রঙের মাছ। দূর থেকে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না ওটা কী মাছ। তবে সাইজ দেখে মনে হচ্ছে, রাতে যে সরপুটি মাছ খেয়েছে এটাও সেই একই মাছ।

সোবাহান মিয়াকে মাছ ধরতে দেখে অনীক বেশ উত্তেজনা অনুভব করছে। বড়শি দিয়ে মাছ ধরা কী এক রোমাঞ্চকর ব্যাপার! এক মুহূর্তও আর দেরি না করে ঘাটলার উদ্দেশে যেতে লাগল সে।

ঘাটলায় পৌঁছে অনীক উত্তেজিত গলায় সোবাহান মিয়াকে বলল, 'কাকু, আপনি একা-একা বড়শি ফেলে মাছ ধরছেন-আমাকে ডেকে নিলেন না কেন!!'

সোবাহান মিয়া গম্ভীর গলায় বলল, 'আপনি নিজের হাতে মাছ ধরতে চান?'

'চাই মানে!! অবশ্যই চাই!!'

সোবাহান মিয়া আর একটা বড়শি এনে অনীকের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'এটা দিয়ে ধরুন।'

বাঁশের কক্ষির মাথায় নাইলন সুতা দিয়ে বাঁধা সাধারণ বড়শি। আর টোপ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে ময়দার গুলি। ময়দার গুলি বড়শিতে গেঁথে পানিতে ফেলা হয়।

সোবাহান মিয়া আরও একটা সরপুটি মাছ ধরল। অনীক একটিও ধরতে পারল না। তার বড়শির ফাটনাও কয়েকবার ডুবিয়ে নিয়েছিল কিন্তু সময় মত ছিপে টান দিতে পারেনি বলে মাছ বড়শিতে গেঁথে তুলতে পারেনি।

সোবাহান মিয়া বেশ বড় সাইজের একটা তেলাপিয়া মাছও ধরল। কমপক্ষে আধকেজি ওজনের।

অনীক উত্তেজিত ডগমগ গলায় বলে উঠল, 'পুকুরে আর কী-কী মাছ রয়েছে? নিচয়ই বড় মাছও আছে! সেগুলো ধরা যায় না?'

সোবাহান মিয়া তার স্বভাবসুলভ ঝসঝসে কর্কশ গলায় বলল, 'অনেক বছরের পুরনো কুই-কাতলা-মৃগেলসহ আরও বিভিন্ন জাতের মাছ রয়েছে। আপনি চাইলে বড় মাছ ধরার ব্যবস্থা করা যাবে।'

অনীকের চোখ-মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে ঝলমলে গলায় বলল, 'অবশ্যই চাই! অবশ্যই! আপনি ব্যবস্থা করুন।'

বড় মাছ ধরার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুকুরে চার ফেলা হয়েছে। অনীকের সামনে বসেই চার তৈরি করা হয়। চালের গুঁড়ো, খৈলের গুঁড়ো, মেথি গুঁড়ো, কয়েক ধরনের ফোড়ন, মিষ্টির সিরি-আরও কীসব যেন মশলা-টশলা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে বড়-বড় গোল চাকা করে পুকুরের ঘাটলার সামনে নির্দিষ্ট এক জায়গায় ফেলা হয়। এই চারের গন্ধেই নাকি বড় মাছ পুকুরের এই নির্দিষ্ট জায়গায় আসবে। বড়শির টোপের জন্যও ডেয়ো পিপড়ের বাসা, বোলতার বাসা

মেসার্স আমীর এণ্ড সন্স

এখানে মাসিক রহস্যপত্রিকা বিক্রি করা হয়

৫৯/৩/১, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

মোবাইল: ০১৭১১১৩৭৮৫১, ০১৬১১১৩৭৮৫১

ফোন: ৯৫৫৬৪৮৪, ৭১১১৩৭২

ডেঙে আনা হয়েছে। দুটো হুইল বড়শিও নামানো হয়েছে।

সবকিছু জোগাড়যন্ত্রের পর অনীক ও সোবাহান মিয়া বড়শিতে টোপ গেঁথে, চার ফেলা সেই নির্দিষ্ট স্থানে বড়শি ফেলে বসে পড়ল। গুরু হলো অপেক্ষার গ্রহর।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা পেরিয়ে যায় কিন্তু মাছের দেখা নেই। এমনকী একবারের জন্যও দুটো বড়শির একটিরও ফাতনা ডোবে না। অনীক অধৈর্য হয়ে ওঠে। সে ধৈর্যহারা গলায় বলে, 'একটা মাছও তো টোপ গিলছে না।'

সোবাহান মিয়া নির্বিকার কণ্ঠে বলল, 'টোপ হিসেবে আর একটা জিনিস ব্যবহার করে দেখতে পারি।'

'সেটা কী?'

'কঁচো। অনেক দিনের পুরনো বড় মাছ খুব ঢালাক হয়ে যায়, সহজে বড়শি খেতে চায় না। কঁচো মাছের খুব পছন্দের। কঁচো গেঁথে বড়শি ফেললে খেতে পারে।'

সোবাহান মিয়া মাটি খুঁড়ে কঁচো 'বের করে আনে। বড়শিতে গেঁথে বড়শি ফেলা হয়। তাতেও কোনও কাজ হয় না। এক পর্যায়ে সন্ধ্যা নেমে আসে। সোবাহান মিয়া আর অনীক বড়শি গুটিয়ে উঠে পড়ে।

রাতে খাওয়ার টেবিলে অনীকের মামা বললেন, 'অনীক নাকি পুকুরের বড় মাছ দেখতে চাও?'

অনীক মুখ ভর্তি খাবার নিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, মামা, আমি আর সোবাহান কাকু আজ সারা দিনটা পণ্ড করেছে বড় মাছ ধরার পেছনে। একটা মাছও ধরতে পারিনি।'

মামা অনীকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি এখন বড়শি নিয়ে মাছ ধরতে বসব। তুমি আমার পাশে বসে দেখতে পারো।'

অনীক অবাক গলায় বলল, 'মামা, আপনি এই রাতের বেলা মাছ ধরবেন?'

'হ্যাঁ, রাতেই বড় মাছ ধরতে সুবিধে। সহজে ধরা পড়ে।'

বেশ আয়োজন করে মামা মাছ ধরতে বসেছেন।

বড়শি ফেলে বড়শির ফাতনার উপর টর্চের আলো ফেলে রাখা হয়েছে। মামা সেদিকে তাকিয়ে ছিপ হাতে স্থির শান্ত ভঙ্গিতে ঘাটলার সিঁড়িতে বসে আছেন। মামার পাশেই অনীক বসে। ওর চোখও মামার বড়শির ফাতনার দিকে। একটাই বড়শি ফেলা হয়েছে। সোবাহান মিয়া বড় এক ফ্লাস্ক ভর্তি চা করে এনে পাশে রেখেছে। সে-ও মামার অন্য পাশে বসে।

ঘণ্টা দুই চলে গেল। সারা দিনের মত একই অবস্থা, বড় মাছের দেখা নেই। এরই মধ্যে মামা বেশ কয়েকবার ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে খেয়ে নিয়েছেন। মামাকে খেতে দেখে অনীকও একবার চা ঢেলে নিয়েছিল। অবশ্য সে খেতে পারেনি। সাংঘাতিক কড়া লিকারের চা, কালচে রং। চুমুক দিতেই বোঝা যায় প্রচুর চিনি দেওয়া হয়েছে, এরপরও তেতো সিরাপের মত তিতকুটে স্বাদ। অনীক মুখে নিয়েই 'ওয়াক-থু' বলে ফেলে দেয়।

মামা এবং সোবাহান মিয়া দু'জনেই খুব স্বল্পভাষী চুপচাপ স্বভাবের। প্রয়োজনাতিরিক্ত কোন কথাই বলেন না। অনীক বিভিন্ন প্রসঙ্গ তুলে গল্প করার চেষ্টা করেছে কিন্তু তাঁদের তরফ থেকে কোনও সাড়া না পেয়ে থেমে যেতে হয়েছে। মাছ ধরতে বসে তাঁরা দু'জন যেন অন্য সময়ের চেয়েও আরও বেশি চুপচাপ হয়ে গেছেন। বোধহয় মাছ ধরার সময় কথা বলা নিষেধ। হতে পারে কথা বললে, কথার শব্দে মাছ বড়শির কাছে আসে না।

অনীকের খুব ঘুম পাচ্ছে। একটার পর একটা হাই তুলছে। যেন সে ঘাটলার সিঁড়িতে বসে অবস্থায়ই ঘুমিয়ে পড়বে। কোনক্রমে চোখ দুটো মেলে রেখেছে। তার ঝাপসা চোখের দৃষ্টি এখনও বড়শির ফাতনার দিকে। এই বুঝি বড় একটা মাছ ফাতনা ডুবিয়ে নেবে। আজ সারাদিন এবং এখন এই রাতেও বড়শির ফাতনার দিকে তাকিয়ে থেকে-থেকে তার চোখ দুটি একেবারে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছে।

রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ অনীক তুলতে-তুলতে ঘুমাতে চলে গেল।

সকাল সাড়ে নটায় অনীকের ঘুম ভাঙল।

নান্তার টেবিলে সোবাহান মিয়া জানাল, রাতে বড় একটা কাতল মাছ ধরা পড়েছে।

কথাটা শুনে অনীক আনন্দে চোখ বড় করে বলল, 'কোথায় সেই মাছ?'

সোবাহান মিয়া নিরুত্তর গলায় বলল, 'রান্না ঘরে রাখা আছে। মাছটা এখন কাটতে বসব। এতক্ষণ আপনার ঘুম ভাঙার অপেক্ষাই করেছি। আপনার মামার হুকুম আপনি মাছটা না দেখার আগে যেন কুটা না হয়।'

রান্নাঘরে ঢুকে অনীক অবাক হয়ে গেল। রান্নাঘরের মেঝে জুড়ে বিশাল এক কাতল মাছ পড়ে রয়েছে। ছোট-খাট একটা মানুষের সমান লম্বায় মাছটা! তেমন চেষ্টা! মাছটার চোঁট দুটো এখনও নড়ছে। কানকো ফুলে-ফুলে উঠছে। ভিতরে দেখা যাচ্ছে লাল টুকটুকে ফুলকা।

অনীক অভিভূত গলায় বলল, 'মাছটার ওজন কত হতে পারে?'

সোবাহান মিয়া মাছ কাটার প্রস্তুতি নিতে- নিতে বলল, 'তিরিশ-বত্রিশ কেজির নীচে হবে না। এই পুকুরে এর চেয়েও অনেক বড়-বড় মাছ রয়েছে।'

সোবাহান মিয়া খুব দ্রুতই মাছটা কুটে ফেলল। দেখে মনে হলো, এরকম বড় মাছ তার প্রায়ই কুটেতে হয়। অনীক মোড়ায় বসে প্রবল আগ্রহ নিয়ে মাছ কাটা দেখল। তবে এক সময় তার কিছুটা মন খারাপ হলো। তার জন্যই আজ এই মাছটাকে প্রাণ দিতে হয়েছে-এই ভেবে।

মাছ কাটা শেষে সোবাহান মিয়া বলল, 'দুই পিস পেটির মাছ শুধু মাত্র হলুদ-লবণ মেখে কড়া করে ভেজে আপনাকে খেতে দেই, খেয়ে দেখুন কেমন লাগে।'

দুপুরে মাছের বিভিন্ন ধরনের পদ করা হলো। মাছের কালিয়া, দোপেয়াজা, কোফতা, কোরমা, ভুনা, টিকিয়া, মাছের সালাদ, মাখা দিয়ে মুড়িঘন্ট...খাবার টেবিলে মাছের এতগুলো পদ একসঙ্গে দেখে অনীক চোখ কপালে তুলে বলল, 'এত মাছ কে খাবে? বাড়িতে তো আমরা মাত্র তিন জন!'

সোবাহান মিয়া বলল, 'আপনি যা খেতে পারেন খান। বাকিটা পুকুরে ফেলে দেব।'

অনীক প্রচণ্ড অবাক হয়ে বলল, 'কেন, মামা খাবেন না? আপনি খাবেন না?'

'না, আমরা মাছ খাই না।'

অনীক আরও অবাক গলায় বলল, 'আপনাদের দু'জনের কেউই মাছ খান না?'

'না, গন্ধ লাগে।'

'মামা কোথায়? মামাকে যে দেখতে পাচ্ছি না! গত কালও সারা দিনে মামাকে দেখতে পাইনি!'

'আপনার মামার ঘুমের সমস্যা রয়েছে। রাতে ঘুম হয় না। তাই সারা দিন ঘুমিয়ে কাটান। সন্ধ্যার পরে তাঁর দেখা পাবেন।'

অনীকের কাছে ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগল, একটা লোক সারা রাত জেগে থাকেন আর সারা দিন ঘুমান-এটা কেমন অভ্যাস।

তিন

মাঝ রাতে হঠাৎ কেমন এক অস্বস্তিতে অনীকের ঘুম ভেঙে গেল। দক্ষিণের জানালাটা খোলাই রয়েছে। এর পরও ঘরের মধ্যে কেমন গুমোট ভাব। চারপাশটা জমট অন্ধকার গিলে রেখেছে। সেই অন্ধকারের বুক চিরে ঝাটের নীচ থেকে প্রথম দিনের মত সম্মিলিত নারী কণ্ঠের হিস-হিসে গোড়ানির শব্দ কানে আসছে।

অনীক প্রথমটায় বেশ ঘাবড়ে গেল। পরক্ষণেই নিজের মধ্যে সাহস সঞ্চয় করে উঠে বসল। সে শহরে ছেলে, তার এত ভয় পাওয়া চলে না। ভূত-প্রেত সে মোটেই বিশ্বাস করে না। নিশ্চয়ই সে ভুল শুনছে। গ্রাম্য পরিবেশে রাতের বেলা বিভিন্ন শব্দ শোনা যায়। ঝি-ঝি পোকের ডাক, শিয়ালের হাঁক, বাদুড়ের ডানা ঝাণ্টানো, বিড়াল-কুকুরের কান্না, ব্যাঙের কোলাহল...আরও কত কী! তেমনই কোনও শব্দকেই হয়তো তার কাছে মানুষের গোড়ানি বলে মনে হচ্ছে। নয়তো বা সেদিনের মত দুঃস্বপ্ন দেখছে।

বালিশের নীচে রাখা টর্চ লাইটটা হাতে নিল অনীক। সেদিনের মত মশারির ভিতর থেকে মাথা বের করে, উপুড় হয়ে ঝাটের নীচে উঁকি মেরে টর্চের আলো ফেলল। সেদিনের মত সেই একই দৃশ্য! কতগুলো নারীমুণ্ড! বুকের

ভিতরটা ছাঁৎ করে উঠল। সে ঝাট করে মাথা তুলে ফেলল।

আলো ফেলার পরমুহূর্তে গোড়ানির শব্দ থেমে গেছে। নেমে এসেছে সুনসান নীরবতা। অনীক নিজেকে কিছুটা ধাতস্থ করে নিয়েছে। মনে আরও সাহস এনেছে। এই ভীতিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে। কিছু দেখে ভয় পেয়ে ভয় মনের ভিতর পুষে রাখা কোনও কাজের কথা নয়। ভয়ের মুখোমুখি হতে হয়। ভয় পেয়ে পালিয়ে গেলে ভয়টা আর কোনও দিনও পিছু ছাড়ে না।

অনীক মাথা নিচু করে আবার খাটের নীচে উঁকি মেরে টর্চের আলো ফেলে দেখে কিছুই নেই। খাট থেকে নেমে টর্চের আলো ফেলে টেবিলের কাছে গিয়ে, জগ থেকে এক গ্রাস পানি ঢেলে ঢকঢক করে নিমিষে শেষ করে।

প্রচণ্ড ভাপসা গরম পড়েছে আজ। দরজা খুলে পুব পাশের টানা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায় অনীক। চারপাশ ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন। আজ বোধ হয় অমাবস্যা।

অনীক লম্বা টানা বারান্দা ধরে পায়চারী করতে লাগল। অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে-হাঁটতে এক সময় বারান্দার একেবারে উত্তর মাথায় পৌঁছে যায়। উত্তর মাথায় পৌঁছে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। উত্তর মাথার বন্ধ কামরার ভিতরে কারা যেন রয়েছে। মৃদুভাবে তাদের গলার স্বর শোনা যাচ্ছে। অনীক দরজায় টর্চের আলো ফেলে দেখল-দরজা বাইরে থেকে তালাবদ্ধ। টর্চ নিভিয়ে কান খাড়া করে বোঝার চেষ্টা করল সত্যিই কি ভিতরে কেউ আছে? খানিক বাদে লক্ষ করল, দরজার পাল্লার ফাঁক দিয়ে ক্ষীণ একটু আলোর রশ্মি চোখে পড়ছে। দরজার আরও কাছ ঘেঁষে আলো-আসা সেই ফাঁকে চোখ রাখল। কিছুটা চোখ সয়ে আসতেই তার দৃষ্টিতে কামরার ভিতরটা স্পষ্ট হয়ে উঠল।

খোলা একটা বিশাল কামরা। কোনও আসবাব নেই। চারদিকে অনেকগুলো বড়-বড় মোমবাতি জ্বলছে। গুণে দেখল মোট তেরোটা। কামরার চার দেয়ালে খোদাই করা উল্টো করে রাখা ক্রুশের মত চিহ্ন। উত্তর-পূর্ব কোণে রয়েছে বিশাল আকৃতির একটা পাথরের মূর্তি।

মূর্তিটা বেদির উপর বসানো। দেখতে বুবই অদ্ভুত। মূর্তিটার পা আর মাথা ছাগলের মত। কালো-কালো লোমে ভরা। খুতনিতে দাড়িওয়ালা ছাগলের মত দাড়ি আর মাথার উপরে দু'পাশে বড়-বড় দুটো শিং। কিন্তু শরীরের বাকি অংশ মানুষের মত। পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের সংমিশ্রণ যেন। উলঙ্গ মূর্তিটির উপরের অংশ মেয়েমানুষদের মত আর নীচেরটুকু পুরুষের। হাত দুটো গাবদা-গাবদা। বিশাল ভুড়িওয়ালা পেট। পায়ের কাছে দুটো সাপ দুর্ন্দিক থেকে ফণা তুলে থাকার ভঙ্গিতে। পিঠে প্রকাণ্ড দুটো বাদুড়ের ডানার মত ডানা দু'পাশে ছড়ানো। মাথার দুই শিং-এর মাঝখানে অদ্ভুত একটা ত্রিশূলাকার মুকুট।

মূর্তির সামনে মামা আর সোবাহান মিয়া। তাঁরা ছাড়াও মূর্তির সামনে বেদির উপর এক উলঙ্গ তরুনীকে শোয়ানো রয়েছে। মেয়েটা অচেতন। মেয়েটার গলায় জবা ফুলের মালা পরানো। কানের দুই পাশে চুলের মধ্যেও দুটো জবা ফুল গোঁজা।

মামা আর সোবাহান মিয়ার গায়ে আলকন্নার মত পা পর্যন্ত লম্বা কালো পোশাক। মামার মাথায় অদ্ভুত ধরনের একটা টুপি। টুপির সামনেটায় লেখা YHVH পিছনে লেখা ADONAI ডান দিকে লেখা EL আর বাম দিকে লেখা ELOHIM।

মামা বিভ্রিড় করে কী যেন মন্ত্রের মত আওড়াচ্ছেন। সোবাহান মিয়া মামার হাতে ছোট্ট একটা মাটির পাত্র তুলে দিল। সেই পাত্রে কিছু একটা তরল দ্রব্য রয়েছে। সেই তরল দ্রব্যে মামা মন্ত্র পড়ে-পড়ে ফুঁ দিচ্ছেন। এক সময় মন্ত্রপূত তরল মেয়েটার গায়ে ছিটিয়ে দিলেন। মেয়েটা যেন একটু নড়ে উঠল। অনীকের নাকে লাগল ঝাঁঝাল কটু গন্ধ। বোধ হয় মন্ত্রপূত ওই তরলের গন্ধ।

সোবাহান মিয়া মামার হাত থেকে মাটির পাত্রটি নিয়ে হাতে দিল মন্ত বড় এক চকচকে ছোরা। মোমের আলোতেও ছোরাটি ঝিকমিকিয়ে উঠছে।

অনীকের মনের ভিতর তোলপাড় হয়ে যেতে লাগল। এঁরা কী করতে যাচ্ছেন? প্রাচীন ভারতে ঠগি নামে এক দল ডাকাত সম্প্রদায়

ছিল। ঠগিরা মা কালীর মূর্তির সামনে কুমারী মেয়েদের বলি দিত। এঁরাও কি তেমন কিছু করতে যাচ্ছেন?!

সোবাহান মিয়া মেয়েটার মুখের চারপাশে ধূপের মত ধোঁয়ার কুণ্ডলি ভরা একটা পাত্র ঘুরিয়ে আনল। অচেতন মেয়েটা নির্বিকার পড়ে আছে।

মামা চকচকে ছোঁরা হাতে মেয়েটার আরও কাছে চলে গেলেন। এবার ছোঁরাটা দু'হাতে শক্ত করে চেপে ধরে পুব দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'ইউফাস মেটাহিম ফ্রুগেটিভি এট এপেলিভি...' পর পর তিনবার বলার পরে একটু থেমে গলার স্বর আরও উঁচু করে বলতে লাগলেন, 'প্রভু লুসিফার, প্রভু লুসিফার...আসুন প্রভু, আসুন...আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি...আসুন, প্রভু, আসুন, প্রভু লুসিফার...'

আচমকা ছোঁরা চালিয়ে দিলেন মেয়েটার গলায়। নিমিষেই মেয়েটার ধড় থেকে মাথাটা ছিন্ন হয়ে গেল। রক্তে ভেসে যেতে লাগল মূর্তির পায়ের নীচের বেদিটা। কিছুক্ষণ ধড়ফড় করে নিশ্বাস নিয়ে গেল মেয়েটার দেহ। পাশেই কাটামুণ্ডা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পড়ে রইল।

অনীক নিজের গায়ে চিমটি কাটল। এতক্ষণ যা দেখল তা কি সত্যি, নাকি স্বপ্ন, নাহ, সত্যি! চিমটি কাটায় ব্যথা লাগছে।

ভীত, আতঙ্কিত, বিস্মিত অনীক দেখতে পেল—মূর্তির পায়ের কাছে পাথরের সাপ দুটো জীবন্ত হয়ে উঠেছে। কালো কুচকুচে সাপ দুটো লক-লক করে বেয়ে চলে গেল বলি হওয়া মেয়েটার কাছে। সাপ দুটো মেয়েটার কাটা গলার দু'পাশে মুখ লাগাল। চুক-চুক করে রক্ত পান করছে।

বিশ্ময়ে আর আতঙ্কে অনীকের চোয়াল বুলে পড়ল। ওদিকে মামা আর সোবাহান মিয়ার চোখ আনন্দে চকচক করে উঠল। তাঁদের চেহারা আত্মতৃপ্তির ছাপ দেখতে পাওয়া গেল।

এক সময় সাপ দুটো সমস্ত রক্ত শেষ করে ফেলল। আবার মূর্তির পায়ের কাছে গিয়ে আগের মত পাথরের রূপ নিয়ে স্থির হয়ে গেল।

সোবাহান মিয়া মেয়েটার নিখর ধড়টা টেনে ঘরের মাঝ বরাবর নিয়ে এল। মামা কাটামুণ্ডার চুল মুঠি করে ধরে সেটাও এনে ধড়টার পাশে রাখলেন। মামা নিচু গলায় সোবাহান মিয়াকে কিছু নির্দেশ দিয়ে কামরার দক্ষিণ পাশের গুপ্ত একটা সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেলেন।

সোবাহান মিয়া একা রয়ে গেল। সে চাকু, ছোঁরা, চাপাতি, চাইনিজ কুড়াল নিয়ে বসে পড়ল মেয়েটার দেহটা কাটাকুটি করার জন্য। বড় কাতল মাছটা কাটার মত দ্রুততার সঙ্গে মেয়েটার শরীরের মাংস কেটে টুকরো-টুকরো করতে লাগল। পেটের মধ্য থেকে নাড়িভুড়ি বের করে আলাদা রাখল।

আর সহ্য করা যায় না। অনীকের সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছে। মাথা প্রচণ্ড চক্কর মারছে। পেটের ভিতর মোচড় দিয়ে বমি পাচ্ছে। সে যেন নিজের শরীরের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে। ঘোরাচ্ছেনের মত কোনক্রমে টলতে-টলতে নিজের কামরায় ফিরে, বিছানায় পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল।

খুব সকালে অনীকের চৈতন্য ফিরে এল। রাতের কথা মনে পড়তেই মুহূর্তে গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল। বুকের ভিতর এক ধরনের চাপ অনুভব করতে লাগল। যেন বুক ভরে শ্বাস নিতে পারছে না। গত রাতে সে যা দেখেছে তা কি সত্যিই ছিল? নাকি দৃঃস্বপ্ন? নাকি বিভ্রম?

অনেকক্ষণ ধরে চোখে-মুখে পানি ছিটিয়ে নিজেকে কিছুটা ধাতস্থ করল অনীক। যতটা সম্ভব নিজেকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছে।

সোবাহান মিয়া এসে অনীককে নাস্তা করার জন্য ডাকল।

প্রতিদিনের মত নাস্তার টেবিলে রয়েছে হরিণের ভূনা মাংস আর পরোটা। আরও একটা বাটিতে হলদেটে থকথকে কিছু একটা রয়েছে। সেদিকে তাকিয়ে পাশে দাঁড়ানো সোবাহান মিয়াকে অনীক ধমথমে গলায় জিজ্ঞেস করল, 'এটা কী?'

সোবাহান মিয়া আগের মত ভারী কর্কশ গলায় বলল, 'মগজ ভাজা, হরিণের মগজ

ভাজা। গত রাতে পাথরঘাটা থেকে আবার হরিণের মাংস এসেছে।’

অনীক বুঝতে পারল, এই ভুনা মাংস বা মগজ ভাজা কোনও কিছুই হরিণের নয়। গত রাতে বলি হওয়া মেয়েটার।

‘আমার খিদে নেই,’ বলে খাবার টেবিল থেকে উঠে পড়ল অনীক।

সোবাহান মিয়ার দিকে তাকাতেও অনীকের ভয় লাগছে। একটু আগে কুকুরদের খাবার দিতে দেখেছে। লবণ দিয়ে মাখানো কাঁচা মাংস। ওই মাংসও যে গত রাতে বলি হওয়া মেয়েটার তা যে কেউই বুঝবে। এই বাড়ির প্রতিটা প্রাণীই নরখাদক।

নিজের কামরায় এসে ঢাকায় ফিরে যাওয়ার জন্য ব্যাগ গোছাতে লাগল অনীক। আর এক মুহূর্তও নয় এই পিশাচপুরীতে। ঢাকা ফিরে, বাবা-মাকে জানিয়ে—তাদেরকে নিয়ে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তায় একটা ব্যবস্থা নিতে হবে। এই নারকীয় কাণ্ড বন্ধ করতে হবে। এখানে মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্ক নেই, থাকলে ফোনেই কোনও ব্যবস্থা নেওয়া যেত।

অনীক ব্যাগ কাঁধে বাড়ির প্রধান গেটের সামনে গিয়ে দেখে গেট ভিতর থেকে তালাবদ্ধ। গেটে বিশাল একটা তালা ঝুলছে।

অনীক সোবাহান মিয়াকে ডেকে তালা ঝুলে দিতে বলল।

সোবাহান মিয়া ক্রুদ্ধ চোখে অনীকের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘গেটের চাবি আপনার মামার কাছে। আপনার মামা জেগে ওঠার আগে আপনি যেতে পারবেন না।’

অনীক দৃঢ় গলায় বলল, ‘না, আমি এখনই যাব।’

সোবাহান মিয়া ঠোঁটের কোণে এক টুকরো জুর হাসির রেখা ফুটিয়ে বলল, ‘বললাম

না, আপনার মামা জেগে না ওঠা পর্যন্ত আপনি কোথাও যেতে পারবেন না।’

অনীক বুঝতে পারল জোর-জবরদস্তি করে কিছুই করা যাবে না। এরা সাধারণ মানুষ নয়, পিশাচ শ্রেণীর! এদের সঙ্গে জোর খাটালে উল্টো বিপদে পড়তে হবে। অগত্যা অনীক আবার নিজের কামরায় ফিরে গিয়ে সন্ধ্যা হবার অপেক্ষা করতে লাগল। কারণ সন্ধ্যার আগে মামা জেগে উঠবে না।

সন্ধ্যার পরে মামা নিজেই এলেন অনীকের ঘরে।

মামা মোলায়েম গলায় জিজ্ঞেস করলেন, ‘অনীক, আজ সারা দিনে তুমি নাকি কিছুই খাওনি?’

অনীক ভারাক্রান্ত ধমখমে গলায় জবাব দিল, ‘আমি চলে যেতে চাই।’

মামা বললেন, ‘যেতে চাও যাবে। তোমাকে কেউ আটকে রাখবে না। এত অস্থির হবার কী আছে! আজ রাতের ট্রেনেই সোবাহান গিয়ে তোমাকে উঠিয়ে দিয়ে আসবে।’

অনীক মামার কথা শুনে অবাক চোখে তাঁর দিকে তাকাল। এত সহজে মামা তাকে যেতে দিচ্ছেন! মামাও এক দৃষ্টিতে অনীকের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। চোখে চোখ পড়ল দু’জনার। মামার চোখ দুটি ভারী সুন্দর! ঘন কালো ছায়ায়। অনীক চোখ সরিয়ে নিতে পারল না। কী এক অমোঘ আকর্ষণে তাকিয়েই রইল। অনীকের মাথার ভিতরে ঝিম-ঝিম করতে লাগল। যেন তার প্রচণ্ড ঘুম পাচ্ছে।

দশ মিনিট বাদে অনীক সংবিৎ ফিরে পেল। পরক্ষণেই বলল, ‘মামা, খুব খিদে পেয়েছে। চলুন, রাতের খাওয়া সেরে ফেলি।’

মামা বললেন, ‘চলো, আমি আগেই সোবাহানকে খাবার গরম করতে বলে এসেছি।

কুমিল্লায় সেবা ও প্রজ্ঞাপতি প্রকাশন-এর গল্প, উপন্যাস, ওয়েস্টার্ন, ক্লাসিক, অনুবাদ,

ভিন গোয়েন্দা, কিশোর হরর, মাসুদ রানা ও যাবতীয় রিথ্রিক্ট বই বিক্রোতা।

হাসান ইমাম রেলওয়ে বুকস্টল, কুমিল্লা।

শ্রোঃ মোঃ রুবেল ইমাম

মোবাইল: ০১৬৭১৩৪৩১৭

গত রাতে পাখরঘাটা থেকে হরিণের মাংস এসেছে। টটকা মাংস! খেয়ে আগের চেয়েও অনেক মজা পাবে।’

অনীক খুশি-হওয়া গলায় বলল, ‘মামা, আজ কিন্তু আমি বেশি করে মাংস খাব।’

মামা বললেন, ‘খেয়ো, তেরো টুকরো খেয়ো। আমি রোজ রাতে তেরো টুকরোই খাই।’

অনীক বেমানুম ভুলে গেল গত রাতের নরবলি দেবার দৃশ্যের কথা। যেন কেউ তার মাথা থেকে শুধু সেই স্মৃতিটাই মুছে দিয়েছে। তবে আজ রাতের ট্রেনেই সে ঢাকার উদ্দেশে রওনা দেবে।

চার

অনীক তাদের খানমন্ডির বাড়ির প্রধান গেটের সামনে দাঁড়িয়ে। ভোর সোয়া পাঁচটা। চারদিক কোলাহলশূন্য, শান্ত নীরব। প্রকৃতি জুড়ে ভোরের সতেজ স্নিগ্ধতা।

অনীকের ট্রেন কমলাপুর এসে পৌছয় ভোর সাড়ে চারটা। ট্যাক্সিক্যাব ধরে খানমন্ডি পৌছতে সোয়া পাঁচটা বেজে যায়।

অনীকের কাছে একটা ব্যাপার অদ্ভুত লাগছে, মোহনপুরে তার মামা বাড়িতে বেড়িয়ে এসেছে মাত্র দশ দিন-অথচ ঢাকা শহরটাকে তার কাছে কেমন অপরিচিত-অপরিচিত লাগছে! যেন সে অনেক দিন পর ঢাকায় এসেছে। মনে হচ্ছে এই ক’দিনে ঢাকা শহরের রাস্তা-ঘাট, বাড়ি-ঘর, দোকানপাট, স্থাপনা... সব কিছুই যেন অনেক বদলে গেছে।

এখনও সূর্য ওঠেনি। ভোরের স্নান আলোর কারণেই কি অনীকের কাছে এমন লাগছে? সব কিছু অপরিচিত-অপরিচিত! সেটাই হবে হয়তো।

অনীক বেশ কয়েকবার কলিংবেল টিপল। ভিতর থেকে কোনও সাড়া-শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। বাড়ির কেউ বোধহয় এখনও জেগে ওঠেনি।

অনীক আরও কয়েকবার কলিংবেল টিপল। কোনও সাড়াই মিলছে না। সে গেটের উপর হাত দিয়ে দুম-দুম শব্দ করতে লাগল। সেই সঙ্গে গলা উচিয়ে, ‘এই বাবুল কাকা,

বাবুল কাকা...’ বলে ডাকতে লাগল।

তাদের ড্রাইভারের নাম বাবুল। বয়স তিরিশ-বত্রিশ। অনীক তাকে বাবুল কাকা বলে ডাকে। ড্রাইভার বাবুল গ্যারেজ লাগোয়া একটা ঘরে থাকে। গ্যারেজ ঘরটা গেটের কাছাকাছি হওয়ায় অনীক ড্রাইভার বাবুলকে ডাকছে। বাড়ির আর কেউ শুনতে না পেলেও তার শোনার কথা।

অনেকক্ষণ ধরে ডাকাডাকির পর ভিতর থেকে কারও আসার শব্দ শুনতে পাওয়া গেল। যে আসছে সে গলা উচিয়ে জিজ্ঞেস করতে-করতে এগোচ্ছে, ‘কে? কে? কে এল এত ভোর বেলায়?’

অনীক কোনও উত্তর দিল না। লোকটার গলাটা অপরিচিত লাগছে। মনে হচ্ছে ষাটোর্ধ্ব বয়স্ক কোনও লোক।

গেট খুলে গেল। অনীকের ধারণাই ঠিক-ষাটোর্ধ্ব এক লোক। পরনে লুঙ্গি আর বড় গলার হাফ হাতা পাতলা সাদা গেঞ্জি। মঙলানা বা গ্রাম-গঞ্জের বয়স্ক লোকেরা এই ধরনের গেঞ্জি পরে। লোকটার মুখ ভর্তি সাদা চাপ দাড়ি। মাথার চুলেরও বেশিরভাগেরই একই অবস্থা।

লোকটা জিজ্ঞেস করল, ‘কাকে চান?’

অনীক বিরক্ত গলায় পাণ্টা প্রশ্ন করল, ‘আপনি কে?’

‘আমি এই বাড়ির কেয়ারটেকার।’

অনীক অবাক গলায় বলল, ‘দশ দিন আগেও তো আপনাকে দেখে যাইনি! বাড়ির অন্য সবাই কোথায়?’

‘আপনি কাদের কথা বলছেন?’

‘কাদের কথা আবার! আমার বাবা-মা...ড্রাইভার বাবুল কাকা, তারা সবাই কোথায়?’

অনীকের কথা শুনে লোকটা যেন প্রচণ্ড চমকে গেল। চোখ রড় করে চমকানো গলায় বলল, ‘আগে বলুন তো আপনি কে?’

অনীকের বিরক্তি চরমে উঠেছে। স্বাভাবিক। নিজেদের বাড়িতে ঢুকতে যদি অপরিচিত কারও এত প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়!

অনীক বিরক্তি ভরা গলায় বলতে লাগল,

‘আমি এই বাড়ির ছেলে-আবার কে!! আমার নাম অনীক। দশ দিন আগে মোহনপুরে আমার মামার কাছে বেড়াতে গিয়েছিলাম। আপনি কোথা থেকে আমাদের বাড়িতে এসে জুটেছেন সেটাই বুঝতে পারছি না! সন্ধান তো, সন্ধান-বাবা-মাকে ডেকে জিজ্ঞেস করব আপনাকে কে কেয়ারটেকারের কাজে রাখল?...’

লোকটার চোখে-মুখে বিস্ময়, আনন্দ, উত্তেজনা সব একই সঙ্গে ফুটে উঠল। চোখ দুটো ছলছল করতে লাগল। ধরা গলায় বলল, ‘অনীক বাবা, আপনি?!! এতক্ষণে আপনাকে চিনতে পেরেছি!! এত দিন আপনি কোথায় ছিলেন?!! কত জায়গায়ই না খোঁজা হয়েছে আপনাকে!!’ অনীককে হতভম্ব চোখে তাকিয়ে থাকতে দেখে আরও বলল, ‘আমাকে চিনতে পারছেন না? আমি আপনার বাবুল কাকা, ড্রাইভার বাবুল কাকা।’

বিস্ময়ে অনীকের মুখ হাঁ হয়ে গেল। সত্যিই বাবুল কাকাই তো!! সেই একই মুখ! তবে দশ দিন আগে যে বাবুল কাকাকে দেখে গেছে সেই বাবুল কাকা নয়! দশ দিন আগে বাবুল কাকা ছিল তিরিশ-বত্রিশ বছরের জোয়ান-তাগড়া। ক্রিন শেইভ। এখন সেই বাবুল কাকারই মুখ ভর্তি সাদা দাড়ি! বয়সের ভারে পর্নদস্ত চোহারা! মুখে বলিরেখা! পান খাওয়া লাল দাঁত!...এটা কী করে সম্ভব?!!

অনীক বিস্ময়ে বুজে আসা গলায় বলল, ‘সত্যিই আপনি বাবুল কাকা?!! না বাবুল কাকার মতই চেহারার অন্য কেউ?’

‘হ্যাঁ, অনীক বাবা, আমিই আপনার বাবুল কাকা। আগে বলুন আপনি এত বছর কোথায় ছিলেন?!! সাহেব-বেগম সাহেবা কত খোঁজাই না বুজলেন আপনাকে!! কোথাও পেলেন না!! কোথায় ছিলেন আপনি?!! আপনার চিন্তায়-চিন্তায়ই তো তাঁরা দু’জন...’

অনীক বাবুল কাকাকে বলে শেষ করতে না দিয়ে বলে উঠল, ‘কিছুই বুঝতে পারছি না আমি!! আপনাকে, আপনার কথা-বার্তা-কোনও কিছুই আগা-মাথা বুঝছি না! সব কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে! দশ দিনে আপনি এমন বুড়ো হয়ে গেলেন কীভাবে?!

আমি এত বছর কোথায় ছিলাম, বার-বার এই প্রশ্ন কেন করছেন?!! কিছুই বুঝতে পারছি না আমি!! মাত্র তো দশ দিন বাড়ির বাইরে ছিলাম আমি!’

বাবুল কাকা অবাক বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে বলল, ‘কী বলছেন আপনি!! মাত্র দশ দিন আপনি বাড়ির বাইরে ছিলেন?!! তিরিশ বছর কেটে গেছে!! আজ থেকে তিরিশ বছর আগে আপনি নিখোঁজ হয়েছিলেন।’

অনীকের মাথা খারাপ হওয়ার অবস্থা হলো। কী বলছে এই লোকটা?!! এই লোকটা কি সত্যিই বাবুল কাকা? নাকি বাবুল কাকার মত চেহারার বয়স্ক অন্য কোনও লোক? তার সঙ্গে মজা করছে। তিরিশ বছর কেটে গেছে এটা কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য নয়!

অনীক চটে যাওয়া গলায় বলল, ‘আপনি আমার সামনে থেকে সন্ধান, আমাকে ভিতরে ঢুকতে দেন।’

‘আসুন, অনীক বাবা, আসুন। এত বছর ধরে বাড়িটাকে আগলে রেখেছি তো আপনার আসার অপেক্ষায়ই।’

ভিতরে ঢুকে অনীকের মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠল। বাড়ির ভিতরটা মোটেও দশ দিন আগে দেখে যাওয়া সেরকম নয়!! দশ দিন আগে বাড়িটাকে দেখে গেছে নতুন রং করা ঝাঁ-চকচকে। অথচ এখন বাড়িটা জীর্ণ, মলিন, ফিকে রঙের। যেন বহু বছর ধরে বাড়িটা অবহেলায় পড়ে আছে! বাড়ির কোনও যত্ন নেওয়া হয়নি! হয়নি রং করানো। বাইরের দেয়ালের কোথাও-কোথাও নোনাধরা আর পলন্তারা খসে পড়া। বাড়ির সামনে পাশাপাশি দুটো চারার নারকেল গাছ দেখে গিয়েছিল। সেই গাছ দুটো এখন বিশাল রূপ নিয়েছে। যেন আকাশ ছুঁতে চাইছে! সত্যিই কি তিরিশ বছর কেটে গেছে?!! নাকি ভুল করে অন্য কোনও বাড়িতে ঢুকে পড়েছে?!! নাকি দুঃস্বপ্ন দেখছে?!! ঘুম ভাঙলেই দেখবে সব ঠিকই আছে।

অনীক বসে-যাওয়া গলায় বলল, ‘আমার বাবা-মা কোথায়? তাদেরকে ডাকুন। আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না তিরিশ বছর কেটে গেছে! আপনার-আমার মধ্যে নিশ্চয়ই

কোনও ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে।’

বাবুল কাকা বাষ্পরুদ্ধ গলায় বলল, ‘সাহেব আর বেগম সাহেবা মারা গেছেন তাও তো প্রায় পনেরো-ষোলো বছর হতে চলল। প্রথম বেগম সাহেবা মারা গেলেন! তার তিন মাসের মাথায়ই সাহেবও মারা গেলেন! আপনাকে হারানোর শোকেই কষ্টে-কষ্টে পাথর হয়ে তাঁরা দু’জন পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন।’

অনীক পাগলের মত চিৎকার করে উঠল। তার মাথার ভিতরটা কেমন যেন ফাঁকা হয়ে গেল। চোখে জোনাকি পোকা দেখতে লাগল। এক পর্যায়ে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল।

অনীকের জ্ঞান ফিরল নিজের কামরার বিছানায়। এটাই তার থাকার কামরা ছিল। কামরার দেয়ালে তার নিজের বাঁধানো ফটো ঝুলছে। রয়েছে তার পড়ার টেবিল-চেয়ার, কম্পিউটার, বুক শেলফ, আলনা...

কামরার সমস্ত আসবাব আর দেয়ালে ঝোলানো ফটোর দিকে এক নজর চোখ বুলিয়ে যে কেউ-ই বুঝবে বহু বছরের পুরানো ওড়লো। কেমন রঙজ্বলা, ধুলো জমা, ময়লা, ফ্যাকাসে।

অনীকের মাথার কাছে বাবুল কাকা বসা। তার কাছে একটা বিষয় খুবই অদ্ভুত লাগছে, অনীক তিরিশ বছর পর ফিরেছে-অথচ ওর চেহারা সেই তিরিশ বছর আগেকার মত একই রকম!! যেন এই তিরিশ বছরে অনীকের বয়স একটুও বাড়েনি! বিষয়টা তার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু ওর যে মানসিক অবস্থা তাতে জিজ্ঞেস করতে সাহসে কুলাচ্ছে না।

অনীককে উঠে বসতে দেখে বাবুল কাকা বলল, ‘অনীক বাবা, এখন কেমন লাগছে?’

অনীকের সংক্ষিপ্ত জবাব, ‘ভাল।’

‘বাবা, আপনি জ্ঞান হারানোর পর বাড়ির সবাই মিলে ধরাধরি করে আপনার নিজের ঘরেই নিয়ে এসেছি। আপনি তো এই ঘরেই থাকতেন। এত দিন ধরে ঘরটা তালাবদ্ধ ছিল। মাঝে-মাঝে খুলে বাড়া-পোঁছ করা হত। আপনি নিখোঁজ হবার পর সাহেব-বেগম সাহেবা ঘরটাকে আপনি যে অবস্থায় রেখে গেছেন তেমন অবস্থায়ই রাখতে বলেন। আপনার স্মৃতি ধরে রাখার জন্য।’

অনীক কিছু বলল না। বাবুল কাকা আবার বলতে লাগল, ‘সাহেব-বেগম সাহেবার মৃত্যুর পর আমি আমার স্ত্রী-ছেলে-মেয়ে সবাইকে নিয়ে আপনাদের এই বাড়িতে উঠে আসি। কারণ সাহেব-বেগম সাহেবা মৃত্যুর আগে আমাকে বলে গিয়েছিলেন, তাঁদের অবর্তমানে আমি যেন এই বাড়িটা দেখে-শুনে রাখি। তাঁদের বিশ্বাস ছিল নিশ্চয়ই কোনও একদিন আপনি ফিরে আসবেন।’

অনীক বিড়বিড় করে বলল, ‘আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না, তিরিশ বছর যে কেটে গেছে! নিশ্চয়ই আপনি ভুল বোঝাচ্ছেন। না হয় সবই আমি ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখছি।’

বাবুল কাকা বলল, ‘চা-নাস্তা খেয়ে আপনি একটু রেস্ট নেন, ধীরে-ধীরে আপনি নিজেই সত্যিটা বুঝতে পারবেন।’

অনীক বলল, ‘আপনি আমার জন্য আজকের একটা পেপার নিয়ে আসতে পারেন?’

অনীক খবরের কাগজে সন্, তারিখ দেখে যাচাই করে নিতে চায় বাবুল কাকার কথা সত্যি কিনা।

বাবুল কাকা বলল, ‘আচ্ছা, আমি গিয়ে আপনার জন্য একটা পেপার নিয়ে আসছি। আর আপনাকে নাস্তা দিতে বলছি।’

বাবুল কাকা যাবার পর অনীক চোখ বুজে, দশ দিন আগে মোহনপুরে মামা বাড়ি বেড়াতে যাবার পর থেকে আজ পর্যন্ত যা-যা ঘটেছে তাই নিয়ে ভাবতে লাগল। কোথাও কোন অস্বাভাবিকতা খুঁজে পাচ্ছে না সে। তিরিশ বছর পার হয়ে গেছে এই হিসেব কিছুতেই মেলানো যাচ্ছে না।

পনেরো-বিশ মিনিটের মাথায় বাবুল কাকা খবরের কাগজ হাতে ফিরে এল। তার সঙ্গে অতি রূপবতী বিশ-একুশ বছর বয়সী একটা মেয়ে। মেয়েটার হাতে ট্রেতে নাস্তা। পরোটা, আলু ভাজি, ডিম পোচ, কলা আর এক গ্লাস ধোঁয়া ওঠা গরম দুধ।

মেয়েটার চোখে চোখ পড়তেই অনীক চমকে উঠল। মনে হলো এই মেয়েটা তার বহু দিনের পরিচিত। এর আগেও বহুবার সে

মেয়েটাকে কোথায় যেন দেখেছে। কিন্তু কোথায় দেখেছে কিছুতেই মনে করতে পারল না।

মেয়েটাও একদৃষ্টে কেমন ঘোর লাগা চোখে অনীকের দিকে তাকিয়ে রইল।

বাবুল কাকা বলে উঠল, 'এই আমার ছোট মেয়ে পারুল। আপনার জন্য নাস্তা নিয়ে এসেছে।'।

পারুল যেন তার বাবার কথায় সংবিত্ত ফিরে পেল। কোনক্রমে নাস্তার ট্রে অনীকের ডেড সাইড টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে ছুটে পালাল।

অনীক বাবুল কাকার হাত থেকে খবরের কাগজটা নিয়ে সন, তারিখ দেখল। বাবুল কাকার কথাই ঠিক-মামার বাড়িতে বেড়াতে যাবার দশ দিন পরের তারিখ নয়, তিরিশ বছর পরের তারিখ!

অনীকের মাথাটা আবার চক্কর দিয়ে উঠল। এ কী ঘটেছে তার সঙ্গে?!!

বাবুল কাকা বলল, 'বাবা, নাস্তা সেরে লম্বা একটা ঘুম দেন-দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে।'।

অনীকের খুব ঝিদে পেয়েছে। দৃষ্টিস্তা আর উন্মেষজনায মানুষের ঝিদে বেড়ে যায়। তাই নিজেকে যতটা সম্ভব সামলে নাস্তা করতে বসল। পরোটা ছিড়ে আলু ভাজি পুরে মুখে তুলে চিবুতেই তার বমি পেল। কেমন পচা মাটি-মাটি স্বাদ! খানিকটা ডিম পোচ মুখে দিল-একই স্বাদ! পরোটা, আলু ভাজি, ডিম পোচ আর খেল না। দুধের গ্লাসটা হাতে নিয়ে চুমুক দিল। সেই একই অবস্থা। স্বাদহীন কেমন দুর্গন্ধযুক্ত। যেন নর্দমার নোংরা, পচা পানি।

অনীক নাস্তার ট্রে সরিয়ে নিতে বলে বিছানায় শুয়ে পড়ল। শুয়ে-শুয়ে সে পুরো বিষয়টা নিয়ে আবার ভাববে।

পাঁচ

অনীক নিজেকে অনেকটাই সামলে নিয়েছে। বুঝতে পেরেছে কোনও এক অশুভ শক্তির প্রভাবে তার সঙ্গে এই অদ্ভুত কাণ্ডটা ঘটেছে। মামাবাড়িতে বেড়িয়ে আসা দশ দিনে পৃথিবীর

তিরিশ বছর সময় কেটে গেছে। কিন্তু কেন এমনটা ঘটল সেই রহস্যের কোনও কারণ খুঁজে পাচ্ছে না।

অনীক বাবুল কাকার সঙ্গে বনানী কবরস্থানে গিয়ে মা-বাবার কবর দেখে এসেছে। কবরের পাশে বসে পাগলের মত কান্নাকাটি করেছে। বাবুল কাকা অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্ত করে বাড়িতে নিয়ে আসে।

বাবুল কাকা অনীকের জন্য যথেষ্ট করছে। খাওয়ায় অনীকের অরুচি দেখে প্রতি বেলায় বিভিন্ন ভাল-ভাল খাবারের আয়োজন করছে। গলদা চিংড়ি, বড়-বড় পাকা কৈ-শিং-মাগুর, বাচ্চা মুরগি, ইলিশ মাছ, গরুর মাংস, খাসির মাংস...কী না ব্যবস্থা করছে! কিন্তু অনীক কিছুই খেতে পারছে না। সব কিছু তার কাছে বিশ্বাস লাগছে। এ ছাড়া শহরে জীবনও তার কাছে ভাল লাগছে না। বার বার মনে হচ্ছে মোহনপুরে মামার কাছেই ফিরে যাওয়া উচিত তার।

রাত সাড়ে বারোটা।

অনীকের হাতে লাল মলাটের একটা ডায়েরি। এটা অনীকের মায়ের লেখা ডায়েরি। মা-বাবার রুম থেকে এই ডায়েরিটা খুঁজে পেয়েছে সে।

ডায়েরিটা লেখা হয়েছে তিরিশ বছর আগে অনীক নিখোঁজ হবার পর। ডায়েরির পাতা জুড়ে অনীককে হারানোর পর তার মায়ের বুক ভাঙা কষ্ট, হাহাকাহ, বেদনা, হতাশা আর কান্না। ডায়েরিটা পড়তে-পড়তে অনীকের চোখ বেয়ে নামছে অঝোর ধারায় লোনা জলের বন্যা।

ডায়েরির একটা অধ্যায়ে অনীকের মামার কথা উঠে এসেছে। অধ্যায়টা অনীক গভীর মনোযোগে পড়তে লাগল।

সেই অধ্যায়ে লেখা—

'...আমার অনীক সোনাকে বার-বার নিষেধ করেছিলাম ওর মামার কাছে না যেতে। শুনল না ছেলেটা! ছেলেটা, আমার বড় ভাইয়ের কাছে বেড়াতে যাবার পর থেকেই নিখোঁজ। খোঁজ নিতে আমরা বড় ভাইজানের বাড়ি

মোহনপুরেও গিয়েছিলাম। কিন্তু সেখানে গিয়ে তাঁর বাড়ির চিহ্নমাত্র দেখতে পাইনি। যেন তাঁর বাড়িটা শূন্যে মিলিয়ে গেছে। সেই সঙ্গে আমার ছেলেটাও!

‘আমার বড় ভাই নিয়ামত হোসেন পঁয়ত্রিশ বছর আগে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে অর্থনীতিতে পি.এইচ.ডি করতে ইংল্যান্ড গিয়েছিলেন। ইংল্যান্ড থেকে দেশে ফেরার পর থেকেই তিনি যেন কেমন বদলে যান। স্বভাব, চরিত্র, কথাবার্তা... পুরো মানুষটাই যেন অন্য মানুষ হয়ে গেলেন। তিনি ছিলেন সর্বদা হাসি-খুশি আমুদে স্বভাবের। ফেরার পর তিনি হলেন গম্ভীর মেজাজের। কথা বলেন গুণে-গুণে। সারা দিন ঘুমান আর রাতে জেগে থাকেন। আমাদের তিন বোনের কাছ থেকে দূরে সরে গেলেন। মোহনপুরের অভয় পাড়ার কাছে এক পুরানো বাড়ি কিনে সেখানে বসবাস করতে শুরু করেন। ধীরে-ধীরে আমাদের তিন বোনের সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ বন্ধ করে দেন। যেন তিনি আমাদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখতে চাইছেন না। আমরা তিন বোন বুঝতে পারি না ভাইজান কেন এমন নির্বাসিত জীবন বেছে নিলেন।

‘একবার শেরাটন হোটেলের এক পার্টিতে ভাইজানের এক ক্লাসমেটের সাথে দেখা হয়। তিনিও ভাইজানের সঙ্গে ইংল্যান্ডে পি.এইচ.ডি করতে গিয়েছিলেন। তাঁর কাছ থেকে ভাইজান সম্পর্কে অদ্ভুত কিছু তথ্য জানতে পারি। ভাইজান পি.এইচ.ডি করতে গিয়ে নাকি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ডরমিটরিতে সিট পাননি। তিনি শহর থেকে দূরের শ্রমশাখার নামে এক গ্রামের ১৩ নং বাসা রজার ভিলায় পেয়িং গেস্ট হয়ে ওঠেন। সেই বাসার মালিক ছিলেন এক বৃদ্ধ। লোকটার নাম চার্লস টেনিংটন। লোকটা একাই থাকতেন। লোকটা একজন কালো জাদুকর। ভাইজান বোধহয় সেই বাসায় ওঠার আগে তা জানতেন না। পরে হয়তো ধীরে-ধীরে সব জানতে পারেন। সেই বৃদ্ধ ভাইজানকেও তাঁর দলে ভেড়ান। ভাইজানকে কালো জাদুর দীক্ষায় দীক্ষিত করে তোলেন।

‘কালো জাদু চর্চার এক পর্যায়ে নাকি

নির্দিষ্ট সময় পর-পর শয়তানের মূর্তির সামনে কুমারী মেয়েদের বলি দিতে হয়। কালো জাদুকররা ওই মূর্তিকে লুসিফারের মূর্তি বলে। বলির রক্ত পেয়ে-পেয়ে নাকি লুসিফার তার উপাসকদের উপর খুশি হয়ে পর্যায়ক্রমে অনেক অদ্ভুত-অদ্ভুত ক্ষমতা দান করে। প্রথমত তারা অমরত্ব লাভ করে। বয়স আটকে যায়। বিব্রম সৃষ্টি করতে পারে। নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে সময়কে থামিয়ে দিতে পারে। মানে, মনে হবে মাত্র এক দিন পার হয়েছে অথচ দেখা যাবে বাস্তবে এক যুগ পার হয়ে গেছে। যে কোন মানুষকে সম্মোহন করতে পারে। একবার মাত্র চোখের দিকে তাকিয়েই। এমনকী বহু দূর থেকেও স্বপ্নের মাধ্যমে। সম্মোহনের ক্ষমতা ব্যবহার করেই নাকি তারা বলির উদ্দেশ্যে কুমারী মেয়েদের তাদের আস্তানায় নিয়ে যায়। মেয়েটা এক ধরনের ঘোরের মধ্যে নিজেই লুসিফারের মূর্তির সামনে বলি হতে চলে যায়। আর বলি হওয়া মেয়েদের মাংস তারা তাদের প্রভু লুসিফারের দেওয়া ভেট হিসেবে খায়।

‘এসব জানার পর বুঝতে পারি ভাইজান যে আর সাধারণ মানুষ নেই। তিনি এখন একজন অসম্ভব ক্ষমতাধর কালো জাদুকর। তাই তো ছেলেটাকে বার-বার নিষেধ করেছিলাম তাঁর কাছে বেড়াতে না যাওয়ার জন্য...’

অধ্যায়টা পড়ার পর অনীকও বুঝতে পারে তার সঙ্গে কী ঘটেছে। কেন ঘটেছে, কীসের প্রভাবে আজ তার এই পরিণতি। বুঝতে পারে তার ঠিকানা এখন কোথায়, কোথায় গেলে সে নিজেকে খুঁজে পাবে।

গভীর রাতে সবার অজান্তে অনীক ব্যাগ গুছিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে মোহনপুরে তার মামার কাছে ফিরে যাবার উদ্দেশ্যে। ওটাই এখন তার ঠিকানা। ওটাই তার পরিচয়। ওখানাই সে ভাল থাকবে।

বাড়ির প্রধান গেট খুলে বাইরে পা ফেলতে যাবে ঠিক তখন পেছন থেকে খুবই মিষ্টি একটা মেয়েলী কণ্ঠ বলে উঠল, ‘আমাকেও আপনার সঙ্গে নিয়ে যান।’

অবাক চোখে অনীক পিছনে ফিরে দেখে

বাবুল কাকার ছোট মেয়ে পারুল ব্যাগ হাতে দাঁড়িয়ে। সে অনীকের সঙ্গে যাওয়ার জন্য একেবারে তৈরি হয়ে বের হয়েছে।

অনীক বলল, 'তুমি কেন আমার সঙ্গে যাবে?'

পারুল ঘোর লাগা গলায় বলতে লাগল, 'ছোট বেলা থেকেই প্রতি রাতে আমি আপনাকে স্বপ্নে দেখি। স্বপ্নে আপনি আমাকে ডাকেন। সেই ডাকের মধ্যে এমন কিছু আছে যে আমি আমার উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলি। মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার মত অবস্থা হয় আমার। ইচ্ছে করে পাগলের মত ছুটে চলে যাই আপনার কাছে। এত দিন আপনার খোঁজ পাইনি বলে যেভাবেই হোক নিজেকে আটকে রেখেছি। আর আমি আপনাকে ছেড়ে দূরে থাকতে পারব না...'

পরিশিষ্ট

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। পশ্চিমের আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে রক্তিম লালিমা।

অনীক আর পারুল মোহনপুরে অনীকের মামাবাড়ির পুকুরের বাঁধানো ঘাটলার সিঁড়িতে পাশাপাশি বসে আছে। পারুল খুব সেজেছে। গোলাপি রঙের শাড়ি পরেছে। চোখে কাজল দিয়েছে। শাড়ির সঙ্গে ম্যাচ করে কপালে গোলাপি টিপ, কানে গোলাপি পাথর বসানো দুল, হাত ভর্তি গোলাপি রঙের কাঁচের চুড়ি, ঠোঁটে গোলাপি লিপস্টিক...তার ফর্সা সুন্দর মুখটাতেও গোলাপি আভা। অপরূপ লাগছে তাকে! যেন স্বর্গের অঙ্গরা!

পলকহীন মুগ্ধ চোখে অনীক পারুলকে দেখছে। কুকুরের ঘরের সামনে দিয়ে আসার সময় কুকুরগুলোও অদ্ভুত মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছিল পারুলকে।

আজ অমাবস্যা। আজ রাতে অঙ্গরার মত রূপবতী পারুলকে লুসিফারের মূর্তির সামনে বলি দেওয়া হবে। বলি দেবার পর তার শরীরের মাংস এই বাড়ির প্রতিটা প্রাণী খাবে। অনীকের মামা, কেয়ারটেকার সোবাহান মিয়া, বাড়ির তেরোটি কুকুর-এরা সবাই পিশাচ শ্রেণীর। এদের কারও মৃত্যু নেই। অনীকও এই পিশাচবাড়ির নতুন বাসিন্দা।

০৮/০৬/১৪ তারিখে প্রকাশিত হচ্ছে
অনুবাদ

তিনটি বই একত্রে

দ্য গুড আর্থ/পার্ল এস. বাক/কাজী শাহনুর হোসেন: গরিব কৃষক ওয়াং লুং।

জমিতে কাজ করতেই পারঙ্গম।
কোনমতে কেটে যাচ্ছিল দিন। বিয়ে করল এক ক্রীতদাসীকে। তারপর শখ জাগল জমিদারদের জমি কিনবে। কিনেও ফেলল। কিন্তু শান্তি জুটল না। প্রচণ্ড লড়াই করে নিজের অবস্থার উন্নতি করল ওয়াং লুং। কিন্তু সুখ নামের সোনার হরিণের দেখা কি পেল?

মাস্টার জ্যাকারিয়াস/জুল ভার্ন/কাজী মায়মুর হোসেন: ঘড়িতে প্রাণের সঞ্চার করেছেন আশ্চর্য প্রতিভাবান ঘড়ির জাদুকর মাস্টার জ্যাকারিয়াস। এখন একটা একটা করে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তাঁর তৈরি নিখুঁত ঘড়িগুলো। আস্তে আস্তে প্রাণের স্পন্দন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে জ্যাকারিয়াসেরও। কী করবেন তিনি? কীভাবে বাঁচবেন? কল্পবিজ্ঞানের পথিকৃত জুলভার্নের এমনি বেশ কয়েকটি চমকপ্রদ গল্প নিয়ে এই সংকলন।

স্বর্ণকীট/অনীশ দাস অপু সম্পাদিত:
অনুবাদ গল্পপ্রিয় পাঠকদের জন্য এক অনবদ্য সংকলন স্বর্ণকীট। কী ধরনের গল্প পছন্দ আপনার? গোয়েন্দা, রহস্য, অ্যাডভেঞ্চার, সায়েন্স ফিকশন, কমেডি, হরর? সব, সবরকম গল্পের আনন্দ দিতেই এ উপহারের ঝুলি। আসুন, বিশ্বসেরা লেখকদের সেরা লেখাগুলোর ভুবনে প্রবেশ করুন এবং কিছুক্ষণের জন্য হারিয়ে যান তাঁদের বর্ণিত জগতে!

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
mail: alochonabibhag@gmail.com

শো-রুম

৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

রঙিন নদী

জলের রং হবে স্বচ্ছ। কিন্তু এমনও নদী রয়েছে যার জলের রং স্বচ্ছ তো নয়ই বরং রংধনুর মত বর্ণিল। নানা রঙের জল দিবিষ্যে যাচ্ছে এই নদীটি দিয়ে। এই নদীকে অনেকে চেনে দ্য রিভার অব ফাইভ কালার বলে। যদিও নদীটির অফিশিয়াল নাম হচ্ছে সায়ো থ্রিস্টাল, অনেকে বলে থাকেন এটি স্বর্ণ থেকে বহমান নদী। ১০০ কি.মি. দীর্ঘ নদীটি কলম্বিয়ার দুর্গম পাহাড়ি পথে বয়ে চলেছে। পাথর-শ্যাওলা-জলজ উদ্ভিদ ও নীল পানিতে লাল, হলুদ, সবুজ, কমলা, গোলাপি রঙের অসাধারণ এক সমারোহ ভেসে ওঠে এই নদীর পানিতে। প্রতিটা ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে এই নদীও সেজে ওঠে ভিন্ন রঙের সাজে। সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর মাসে রঙের এই খেলা সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ার মত। জলবায়ু ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য রক্ষায় এখানে পর্যটকদের যাতায়াত বেশ কয়েক বছর বন্ধ থাকলেও ২০০৯ সাল থেকে তা আবার উন্মুক্ত করা হয়।

হুইলচেয়ারে বিশ্বজয়

১৯৫৭ সালের ২৬ আগস্ট কানাডার ব্রিটিশ কলাম্বিয়ায় জন্ম নেয়া রিক হানসেনের স্বপ্ন ছিল অলিম্পিকে অংশ নেওয়া। প্রতিবন্ধী হয়েও স্নাতক সম্পন্ন করা এই অ্যাথলেটের

গুরুটা ছিল দারুণ। ১৯তম আন্তর্জাতিক হুইলচেয়ার ম্যারাথনসহ ছয়বার গলায় মোলান প্যারা-অলিম্পিকের মেডেল। হানসেনের বন্ধু টেরি ফক্স স্পাইনাল কর্ড ক্যান্সারের গবেষণা ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য 'হুইলচেয়ারে বসেই গোটা কানাডা ভ্রমণের জন্য বের হন। বন্ধুর দেখাদেখি হানসেনও সিদ্ধান্ত নেন, হুইলচেয়ারে বসেই তিনি গোটা দুনিয়া ভ্রমণ করবেন। আর তাঁর এ ভ্রমণ থেকে প্রাপ্ত সব অনুদানের টাকা পৌঁছে দেবেন ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীদের জন্য। ১৯৮৫ সালের ২১ মার্চ হানসেন ভ্যানকুভার থেকে রওনা হন এই ভ্রমণে। চারটি মহাদেশের প্রায় ৩৪টি দেশে ৪০ হাজার কিলোমিটারের বেশি পথ ভ্রমণ শেষে হানসেন ১৯৮৭ সালের ২২ মে ফেরেন ভ্যানকুভারে। সঙ্গে করে আনেন স্পাইনাল কর্ড ক্যান্সারে আক্রান্তদের জন্য প্রায় ২৬ মিলিয়ন ডলারের অনুদান। হানসেন ১৯৮৭ সালে প্রতিষ্ঠা করেন ম্যান ইন মোশন ফাউন্ডেশন, যেটা আজও হাড় ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীদের জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

সোনা ও রূপার সাবান

সোনা ও রূপার সাবান তৈরি হয় লেবাননে। এই সাবানের দাম ১২ লাখ ৫১ হাজার ১৭২ টাকা ৫০ পয়সা! সাবানটি কিন্তু খুব

মসৃণ নয়। দেখতেও আর পাচটা গায়ে মাখা সাবানের মত নয়। এতে ব্যবহার করা হয়েছে প্রাকৃতিক উপাদানের খাঁটি নির্যাস। সোনা-রূপার পাউডার দিয়ে তৈরি এই সাবানে রয়েছে অলিভ অয়েলসহ অন্যান্য তেল এবং ১১টি সুগন্ধি গাছের নির্যাস। সাবান তৈরিতে ব্যবহার হয় পাঁচ গ্রাম সোনা ও ১৭ গ্রাম রূপার পাউডার। ১৮৪০ সাল থেকে লেবাননে কয়েক পুরুষ ধরে সাবান তৈরি করে আসছেন আমিররা।

আমের দাম ২ লাখ ৩১ হাজার টাকা

একজোড়া আমের দাম ২ লাখ ৩১ হাজার টাকা। জাপানে সম্প্রতি একজোড়া আম বিক্রি হয় তিন হাজার ডলারে। এই দামে আমজোড়া বিক্রি করতে পেরে তো বিক্রেতা খুবই খুশি। এমনিতেই জাপানে ফলের দাম খুব বেশি।

সোনার বিস্কুট খেয়ে বিপত্তি

চৌরাসালানের জন্য ১২টি সোনার বিস্কুট গিলে ফেলেছিলেন এক ভারতীয় ব্যবসায়ী। এভাবে বিমানবন্দরের নিরাপত্তারক্ষীদের ফাঁকি দিয়ে সফলভাবেই সিঙ্গাপুর থেকে ভারতে ফেরেন তিনি। এরপরই ঘটে বিপত্তি। নয়াদিল্লীর চাঁদনী চকের বাসিন্দা ওই ব্যবসায়ী ভেবেছিলেন, মলভ্যাগের মাধ্যমে সোনার বিস্কুটগুলো

পেট থেকে বের করে ফেলতে পারবেন। কিন্তু কিছুতেই সেগুলো বের করতে পারেননি তিনি। একপর্যায়ে গুরু হয় তীব্র পেটব্যথা। সহ্য করতে না পেরে ৯ এপ্রিল চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন তিনি। চিকিৎসকদের জানান, রাগের মাথায় পানির বোতলের ছিপি গিলে ফেলেছেন। কিন্তু তার এই মিথ্যে ধরা পড়ে যায়। চিকিৎসকেরা অস্ত্রোপচার করে তার পেট থেকে সোনার ১২টি বিস্কুট বের করেন। প্রতিটি বিস্কুটের ওজন ৩৩ গ্রাম। ১২টি বিস্কুটের মোট ওজন ৩৯৬ গ্রাম। যার বাজারমূল্য প্রায় ১২ লাখ রুপি।

নয়াদিল্লীর স্যার গঙ্গারাম হাসপাতালের চিকিৎসক সি এস রামাচন্দ্রন বলেন, '১৯৮৯ সাল থেকে আমি ওই ব্যবসায়ীর চিকিৎসা করে আসছি। চাঁদনী চকের ধনাঢ্য ব্যবসায়ী হিসেবেই তাকে চিনতাম। তার দুই ছেলে দেশের বাইরে থাকে, তার মত একজন লোক এমন কাজ করতে পারে, জেনে একই সঙ্গে আমি বিস্মিত ও মর্মাহত।'

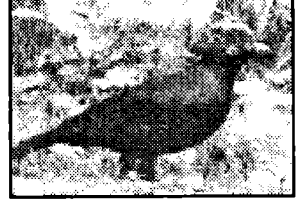
বিমানের চাকায় ৫ ঘণ্টা

উড়োজাহাজের চাকায় করে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া থেকে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে গেছে ১৬ বছরের এক কিশোর। ৫ ঘণ্টার এই যাত্রার পরও কিশোরটি স্বাভাবিক ও সুস্থ রয়েছে। বিবিসিতে প্রকাশিত খবরে জানা যায়, উড়োজাহাজটি

মাওই বিমানবন্দরে অবতরণ করার পর ওই কিশোরকে পাওয়া যায়। মাওই বিমানবন্দরে নেমে সে উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটছিল। এফবিআইয়ের জিজ্ঞাসাবাদে ওই কিশোর জানায়, সে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। হাওয়াই এয়ারলাইনস কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, কিশোরটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছে। উড়োজাহাজটি ভূমি থেকে ৩৯ হাজার ফুট উচুতে উড়ছিল। উড়োজাহাজে ছেলেটি অক্সিজেনের অভাব বোধ করে। তাপমাত্রাও অনুকূল ছিল না।

বাওয়ার বার্ড

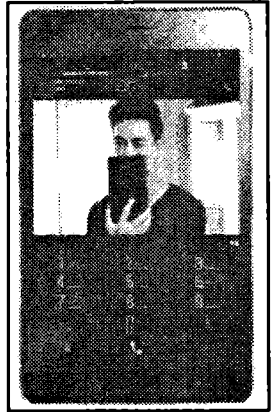
অস্ট্রেলিয়ায় দেখা মেলে বিশ্বের সবচেয়ে মজার বাসা বানানো পাখি বাওয়ার বার্ডের। এটিকে কুঞ্জপাখিও বলা হয়। দেখতে খুবই সুন্দর। অস্ট্রেলিয়ানদের খুব প্রিয় এই পাখিটি। এরা ঘর বানানোর কাজে খুব পটু। পাখির বাসা বানানোর অসামান্য দক্ষতা রয়েছে এদের। তারা সুন্দর ইউ আকৃতির বাগানবাড়ি বানায় বলে এই পাখি বেশি সখ্যাতি অর্জন করেছে। নীল রঙের পুরুষ পাখি লম্বা লম্বা চিকন গাছের ডাল মাটিতে পুঁতে উর্ধ্বমুখী ইংরেজি 'ইউ' আকৃতির ঘর বানায়। দুই পাশের ডালের সংযোগস্থলে ঋড়ুখুটো, নীল কাচ, নীল ফুলসহ বিভিন্ন নীল রঙের জিনিস কুড়িয়ে এনে এরা বাসা সাজায়। বাসা



সাজানোর ক্ষেত্রে এদের নীল রংপ্রীতি এতই বেশি যে, পাখি পর্যবেক্ষকরা বাওয়ার বার্ডের বাসায় নীল রঙের চশমা, চাবির রিংও খুঁজে পেয়েছে।

ওজন কমাতে স্মার্টফোন।

যারা ওজন বেড়ে যাওয়ায় দৃষ্টিভ্রান্তি রয়েছেন এবার



তাদের সাহায্য করবে স্মার্টফোন। সম্প্রতি এক গবেষণায় জানা গেছে, স্মার্টফোনের একটি অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে ওজন হ্রাস করা সম্ভব। কারণ এ অ্যাপ্লিকেশনে ব্যায়াম ও পুষ্টি সম্পর্কীয় সব ডাটাবেজ রয়েছে। ■

বি.এম. আসাদ
[বিভিন্ন পত্রিকা থেকে সংগৃহীত]

গোস্ট রাইটার

মূল ■ রবার্ট ব্লচ
রূপান্তর ■ অনীশ দাস অপু

‘আমি
বলেছি আমি
আর সে
এবং
ভায়োলেট
লিখতে
পারব না।
আমি যে
উপন্যাসটি
লিখতে চাই
তা হবে
অন্যরকম।



এ ডিসন ঠিকই বলেছিলেন।
জিনিয়াস বা প্রতিভা হলো এক পার্সেন্ট অনুপ্রেরণা, বাকি নিরানব্বই পার্সেন্ট হলো
পারসপিরেশন বা ঘাম।

রিও’র বিমানবন্দরে প্লেন অবতরণের অনেক আগে থেকেই ঘামছিল জেরি ক্রিবস। কাস্টমস
ইন্সপেকশনের সময়েও তার শরীরের ঘর্মাক্ত ধারা অব্যাহত রইল। কালো ব্যাগটিতে রয়েছে তার
সকল গোপনীয়তা, ওটি একমুহূর্তের জন্যেও হাতছাড়া করল না জেরি। এয়ারপোর্ট থেকে
কোতাকারানা হোটেলের দীর্ঘ ট্যাক্সি যাত্রায় ব্যাগটি কোলের মধ্যে আঁকড়ে ধরে রইল। রিও ডি
জেনিরোর বিশ্রী যানজট থেকে রেহাই মেলার পরে সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে কিন্তু জেরি নিজের
হোটেল রুমে ঢোকান পরেও ঘেমে চলছিল। ব্যাগ নিয়েই শাওয়ারে ঢুকল সে। কিন্তু গোসল করেও
লাভ হলো না। ঘেমেই চলল জেরি।

গা মুছল জেরি, পোশাক পরা এবং দাড়ি কামানো এই স্বল্প সময়টুকুর ব্যবধানেই ঘেমে নেয়ে
গেল আবার। বসে বসে ঘামতে লাগল আর অপেক্ষা করল কখন বেজে উঠবে ফোন। কালো
ব্যাগটি যথারীতি তার কোলে, জড়িয়ে ধরে রেখেছে তার গোপনীয়তাকে—তার জিনিয়াস ব্যাগটির

স্পর্শই তাকে পরম নির্ভরতা দিচ্ছে।

ফোন আসছে না কেন এখনও?

তার প্রশ্নের জবাব দিতেই যেন দরজায় কেউ কড়া নাড়ল। ওরা নিশ্চয় ফোন ব্যবহার করার ঝুঁকিতে যেতে চায়নি; ব্যক্তিগত যোগাযোগের ওপর ভরসা করতে চেয়েছে।

সত্যি কি তাই?

জেরি খাটের নীচে ব্যাগটি চালান করে দিল। এগোল দরজায়।

বাইরের হলওয়ে থেকে মৃদু স্বর ভেসে এল, 'মি. ক্রিবস?'

কঁকড়ে গেল জেরি। নীচতলায় রেজিস্টার খাতায় সে নিজের নাম সই করেছে মি. ব্রাউন, ইচ্ছে করাই ছদ্মনাম নিয়েছে কারণ নিজের উপস্থিতি জানান দেয়ার কোন আয়েশ তার নেই। কিন্তু দরজার পেছনের আগন্তুকটি তার আসল নাম জানে। একদিক থেকে ব্যাপারটা খারাপও নয় তবু সে নিশ্চিত হতে চাইল।

'কে আপনাকে পাঠিয়েছে?' ফিসফিস করল জেরি।

'বিগ বার্ড।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে দরজা খুলে দিল জেরি।

ঘরে প্রবেশ করল কামানো মাথার কৃষ্ণকালো এক দৈত্য। জেরির দিকে তাকিয়ে ভদ্রতাসূচক মাথা ঝাঁকাল। লোকটির পরনে অলংকার শোভিত ইউনিফর্ম, যেন একজন ব্রাজিলীয় জেনারেল কিংবা শোফার—তবে এতে কিছু এসে যায় না কারণ বিগ বার্ড যাকে খুশি পাঠাতে পারেন।

'আমার সঙ্গে আসুন, প্রিজ,' বলল দৈত্য।

ঘুরল জেরি, দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, একটা হাত চেপে ধরল তার কাঁধ।

'আপনি বোধহয় কিছু ভুলে যাচ্ছেন,' মন্তব্য করল কালো দানব।

'সরি।' দাঁড়িয়ে পড়ল জেরি, খাটের নীচে লুকানো ব্যাগটি টেনে বের করল। ওটা নেয়ার জন্য হাত বাড়ান দানব কিন্তু তাকে মাথা নেড়ে মানা করল ও। 'আমিই এটা নিতে পারব,' বলল সে।

কাঁধ ঝাঁকাল কালুয়া। 'আপনার যা ইচ্ছা।' সে জেরির পেছন পেছন দরজা দিয়ে

বেরিয়ে এল, চলল হলওয়ে ধরে। এলিভেটরে উঠে কিংবা নীচে লবিতেও সে কোন কথা বলল না, এবং তার 'এই নীরবতা বজায় থাকল হোটেলের এন্ট্রান্সের বাইরে, ফুটপাতে পার্ক করা প্রকাণ্ড লিমুজিনে জেরিকে নিয়ে উঠে বসার পরেও।

জেরি বসল পেছনের আসনে, তার এসকট দখল নিল হুইল।

কালো দানব শোফার কি না সে বিষয়ে জেরির কোন সন্দেহ থাকলেও তা শীঘ্রি দূরীভূত হয়ে গেল রিওঁর দুপুরের ব্যস্ত রাস্তায় লোকটার দক্ষ ড্রাইভিং দেখে—এ সত্যিকারের জেনারেলের মতই গাড়ি চালাচ্ছে।

জেটিতে লাঞ্চ সারার পরে লোকটি প্রমাণ করল সে একজন অ্যাডমিরালও বটে। জেটি থেকে বোট ছুটল তীর গতিতে এবং দেখতে দেখতে চলে এল খোলা সাগরে। জেরি তখন বো-তে তার দুই কম্পমান হাঁটুর মধ্যে কালো ব্যাগটি রেখে কুঁজো হয়ে বসে আছে।

সামনে ফুটে উঠল ঝাঁ চকচকে ইয়টের সারি, ডেডয়ের তালে দুলছে। একটি ইয়টের পশ্চাদভাগে ওরা এসেছে, জেরি দেখল সোনার পাতায় লেখা জলযানটির নাম The Water Closet।

ইঞ্জিন বন্ধ করল কৃষ্ণকায় দানব, দুই হাত গোল করে মুখের সামনে এনে হাঁক ছাড়ল, 'আহোয়া!'

ওপরের ডেকে আবিভূত হলো দাড়িঅলা এক নাবিক। 'মই নামাও,' বিড়বিড় করল কালো দৈত্য।

দাঁতের সারির ফাঁকে কালো ব্যাগের হাতল কামড়ে ধরে রেখে দড়ির মই বেয়ে ইয়টে ওঠা সহজ কাজ নয়। তবে জেরি পারল। ডেকে ওঠার পরে কালো দানবের পেছন পেছন এগোল। এক সারি অভিজাত স্টেটরুম, সাউনা (বাস্পীয় স্নানঘর), একটি ব্যক্তিগত প্রজেকশন রুম এবং একটি গলি পার হয়ে তারা দাঁড়িয়ে পড়ল একটি আউটডোর বারের পেছনে। এর সঙ্গে রয়েছে অলিম্পিক সাইজের একটি সুইমিং পুল। 'উনি আপনাকে আশা করছেন,' বলল কালো মানুষটা।

সুইমিংপুলের দিকে চোখ কুঁচকে তাকাল জেরি। পুল থেকে তারস্বরে রক মিউজিক

ভেসে আসছে, সূর্যের ঝলমলে আলোয় পানিতে হুটোপুটি করছে আধডজন সম্পূর্ণ নগ্ন সুন্দরী।

হোস্টকে চিনতে কষ্ট হলো না জেরির কারণ ছয় নারীর মধ্যে তিনিই একমাত্র পুরুষ।

‘মি. বায়ার্ড?’ অনুচ্চ গলায় বলল জেরি।

টাকমাথা, হাভিডসার, ছোটখাট গড়নের মানুষটি উঠে এলেন সুইমিংপুল ছেড়ে, চোখে রোদ পড়তে ঝঁকিয়ে উঠলেন, অপেক্ষমাণ এক অ্যাটেন্ডেন্ট সঙ্গে সঙ্গে সোনালি রঙের বহুমূল্য একটি রোব দিয়ে ঢেকে দিল তাঁর শরীর।

মাথা ঝাঁকালেন বিগ বার্ড। ‘আমি আল বায়ার্ড,’ বললেন তিনি। ‘আমার স্ত্রীর সঙ্গে তো আপনার আগাই পরিচয় হয়েছে।’ সুইমিংপুলের নগ্ন সুন্দরীদের দিকে আবছা ইংগিত করলেন।

‘ওহ শিওর।’

‘তা হলে আসুন,’ দু’হাত সামনে বাড়িয়ে দিলেন বায়ার্ড। সতর্ক অ্যাটেন্ডেন্ট তাঁর এক হাতে ঝাপসা কাচের গ্রাস ভর্তি মার্টিনি ধরিয়ে দিল, অপর হাতে গুঁজল জ্বলন্ত আতাম্যান সিগার। ঘুরলেন বায়ার্ড। জেরিকে নিয়ে জাহাজের পেছন দিকে পা বাড়ালেন।

স্টেটরুমে ঢুকে এটির আয়না ঘেরা দেয়াল এবং ছাদ, চিতাবাঘের চামড়া দিয়ে আবৃত কিংসাইজের গোলাকার বিছানা দেখে জেরি অনুমান করল সে ক্যাপ্টেনের কেবিনে এসেছে।

হাভিডসার মানুষটি বন্ধ করে দিলেন দোর। আকর্ষ দ্রুততার সঙ্গে এক ঢোকে গ্রাস বোঝাই ড্রিংক শেষ করে ওটা মিংক কার্পেটের ওপর রেখে দিলেন। বিছানায় গিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লেন এবং সিগার ফুঁকতে ফুঁকতে বেশ মুড নিয়ে তাকালেন তাঁর দর্শনার্থীর দিকে।

‘এমন সময় কি আপনার জীবনে কখনও এসেছে যে মনে হয়েছে কোনকিছুই ঠিকঠাক চলছে না?’ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। ‘ওটা দেখুন।’ খালি গ্রাসের দিকে ইংগিত করলেন।

‘ট্রিপল মার্টিনিতে মাত্র দুটো জলপাই দিয়েছে! আমরা আন্তর্জাতিক জলসীমায় প্রবেশ করা মাত্র

আমাকে মনে করিয়ে দেবেন যে বারটেগারটাকে পানিতে ফেলে দেব।’

‘কিন্তু, মি. বায়ার্ড, এটা কি লঘুপাপে গুরু দণ্ড...’

‘হাহ্, থামুন তো!’ নাক সিটকালেন বায়ার্ড। উঠে বসলেন বিছানায়। ‘আপনি দেখছি বারাবাসের মত কথা বলছেন।’

‘বারাবাস?’

‘আমার প্রকাশক। গত সপ্তাহে এখানে এসেছিল। আনন্দ-উৎসবের সময় সে আমাকে বলে কী, ‘একটু হাওয়া বদলের জন্য আপনি জীবনের উজ্জ্বল দিকটির দিকে তাকাচ্ছেন না কেন? শত হলেও আপনি কনওয়ে ম্যানের পরেই বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখক। আপনার ঝুলিতে রয়েছে দশটি অল টাইম বেস্টসেলার, আটটি ব্লকবাস্টার মুভি, একটি হিট টেলিভিশন সিরিজ যা গত একটা পুরো সিজন ধরে চলছে—আপনার আর কী চাই? ড্রানো এবং সানি ফ্লাশের মত আপনিও এখন ঘরে ঘরে উচ্চারিত একটি নাম।’

‘তো, উনি তো ঠিকই বলেছেন।’

‘না-ঠিক বলেনি। মিথ্যা বলেছে। আমি কনম্যানের চেয়ে অনেক বেশি জনপ্রিয়। সে এবং তার সেক্সি রোমান্সগুলো—’

‘কিন্তু আপনি তো ধনী এবং বিখ্যাত,’ আয়নাঘেরা দেয়ালে ইংগিত করল জেরি। ‘আপনি এত বড় একটা ইয়টে থাকছেন, এমন সুন্দরী একটি স্ত্রী আছে আপনার—’

শ্রাগ করলেন বায়ার্ড। ‘বোট আমাকে সি সিক করে তোলে। তবু ইয়টেই থাকতে হচ্ছে কারণ যে মুহূর্তে মাটিতে পা রাখব সঙ্গে সঙ্গে I.R.S আমার বিরুদ্ধে পর্যট্রিশ মিলিয়ন ডলারের কর ফাঁকির মামলা তুলে দেবে। আর আমার বউ অত সুন্দরী নয়—প্রথম নয়জন ওর চেয়ে অনেক বেশি আকর্ষণীয় ছিল। মুশকিল হলো, ওরা কেউ আমাকে বুঝতে পারেনি। বর্তমানেরটাও না। এমনকী আমার কোন রক্ষিতাও বোঝে না আমি কী চাই। এরা বলে আমার সঙ্গে এদের কেমিস্ট্রি নাকি ঠিক মেলে না। কেমিস্ট্রি না মিললে আমি কী করব?’

ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বায়ার্ড, সিধে হলেন, পোর্টহোল দিয়ে টুসকি মেরে ফেলে দিলেন হাতের সিগার। যখন ফিরে

এলেন তখন একদম ভিন্ন মানুষ। সোনালি রোবের নীচে তাঁর কাঁধজোড়া সোজা হয়ে আছে, পুঁতির মত ছোটছোট চোখজোড়া জ্বলজ্বল করছে। 'এখন কাজের কথায় আসুন,' বললেন তিনি। 'জিনিসটা এনেছেন?'

'ব্যাগের মধ্যে আছে।'

জেরি কালো ব্যাগটি এগিয়ে দিল। বাযার্ডের বাঁকা আঙুলগুলো চেপে ধরল হাতল। তিনি ওটা বিছানায় নিয়ে গেলেন, তালা খোলার জন্য হাতড়াতে লাগলেন।

'চাবি! হাঁপাতে-হাঁপাতে বললেন তিনি। 'চাবি কোথায়?'

জেরি প্যান্টের পা গুটিয়ে নিয়ে গোড়ালিতে আ্যডহেসিভ টেপ দিয়ে অটকানো চাবিটি বের করল। বাযার্ডকে দিল। তিনি তালায় চাবি ঢুকিয়েই জোরে একটা মোচড় দিলেন। ফট করে খুলে গেল ব্যাগ, ভেতরের জিনিসপত্র ছড়িয়ে পড়ল চিতাবাঘের চামড়ার চাদরে।

বাযার্ড বিছানার দিকে পলকহীন চোখে তাকিয়ে রইলেন। হাতে হাত ঘষছেন।

'কত পৃষ্ঠা?' জানতে চাইলেন তিনি।

'তিনশো।'

'সব আছে?'

'শেষ চ্যান্সারটা বাদে সবই আছে। আগামী হুগায় কাজটি শেষ করে ফেলব ভেবেছিলাম, এমন সময় আপনার তার বার্তা এল—'

'ফিরে গিয়েও আপনি কাজটা শেষ করতে পারবেন,' বললেন বাযার্ড। 'আমি এমাসের শেষের দিকে পুরোটাই প্রকাশকের হাতে ভুলে দেব ভেবেছি। কনওয়ে ম্যানের আগেই আমরা বইটি বাজারে বের করে ফেলব। শুনেছি সে নাকি দারুণ একটা জিনিস নিয়ে এবারে আসছে তবে তার আগেই আমরা কাজ হাসিল করে ফেলব।' বিরতি দিলেন তিনি, সন্দেহের চোখ বুলালেন জেরির ওপর। 'ওই লেখাটা ভাল হয়েছে, তো?'

'আমার তো তাই ধারণা।'

'ধারণা? আপনাকে তো ধারণা করার জন্য টাকা দিই না আমি—লেখার জন্য দিই।' বিশ্রী মুখভঙ্গি করলেন বাযার্ড। 'ভাল হতেই হবে। কারণ লেখক হিসেবে আমার একটা

সুনাম আছে বাজারে।'

'চিন্তা করবেন না, মি. বাযার্ড। আপনি এতে একবার চোখ বুলান তা হলেই বুঝতে পারবেন মানের প্রশ্নে কোন আপস করা হয়নি।'

'আচ্ছা-আচ্ছা, পরে দেখবখন।' আল বাযার্ড কাগজগুলো একত্রিত করছেন। 'এখন একটু স্বস্তিবোধ করছি যাহোক। বারাবাসের আশা করি পছন্দই হবে।' কপালে ভাঁজ পড়ল। 'কার্বন কপি কই?'

'বাড়িতে, নিরাপদ স্থানে।'

'গুড,' মাথা ঝাঁকালেন বাযার্ড। 'বাড়ির কথায় মনে পড়ে গেল এখন থেকে পরবর্তী ফ্লাইটে আপনাকে তুলে দেব। আপনাকে লাঞ্চ পর্যন্ত থেকে যেতে বলতাম কিন্তু যেহেতু এখনও একটা চ্যান্সার লেখা বাকি, তাই আর আপনার সময় নষ্ট করব না। তা ছাড়া, প্রেনে বসেই স্যাণ্ডউইচ বা এ ধরনের কিছু একটা খেয়ে নিতে পারবেন।'

'আ—একটা কথা বোধহয় আপনি ভুলে যাচ্ছেন, মি. বাযার্ড।'

খেকিয়ে উঠলেন বাযার্ড। 'মনে আছে আমার। আমার মত একজন সৃজনশীল মানুষের সঙ্গে আপনার মত একজনের এখানেই পার্থক্য। আপনারা, লেখকরা টাকা ছাড়া কিছু ভাবতেই পারেন না।'

ফোসফোস শ্বাস ফেলতে ফেলতে তিনি একটি বন্ধ ধাতব বাস্র বের করলেন। 'এই নিন আপনার জিনিস।'

কমবিনেশন মেলাতেই খুলে গেল তালা, বিছানার ওপর ছড়িয়ে পড়ল একরাশ উজ্জ্বল পাথর।

'যাশুশালা!' বিভ্রিবিড় করলেন বাযার্ড। 'বললাম না আজকের দিনটা আমার খুব খারাপ যাচ্ছে। ভুল বাস্র—ভুল করে হীরের বাস্রটি খুলে ফেলেছি!'

বাযার্ড সামনে ঝুঁকে বাস্র হাতড়ে প্রথমটির মত দেখতে আরেকটি ধাতব কন্টেইনার বের করলেন। ওটার টাম্বলার ক্লিক করে উঠল, খুলে গেল ঢাকনি। ভেতরে অনেকগুলো নোটের তাড়া দেখে চোখ চকচক করে উঠল জেরির।

'নগদ টাকা,' বললেন বাযার্ড। 'শুধু

পঞ্চাশ আর একশো ডলারের নোট।' তিনি এক তাড়া নোট তুলে নিয়ে গুনতে লাগলেন। 'হিসাব করে দেখি। তিনশো পৃষ্ঠার বই। প্রতি পৃষ্ঠা দশ ডলার করে হলে...'

'এবারে আপনি পনেরো করে দেবেন বলেছিলেন, মি. বায়ার্ড।'

'ওহ-হ্যাঁ,-পনেরো ডলার করে তিনশো পৃষ্ঠায়-'

'চার হাজার পাঁচশো ডলার,' বলল জেরি।

'আমি কি গুনতে জানি না নাকি?' খেঁকিয়ে উঠলেন বায়ার্ড। জেরির হাতে বেশ কতগুলো নোট গুঁজে দিলেন। 'অনেক টাকা দিলাম। বলা যায় অনেক বেশিই দিয়েছি।'

'কিন্তু বইটি লিখতে আমার প্রায় ছয় মাস সময় লেগেছে, মি. বায়ার্ড। আজকাল একজন জুতোর মিস্ত্রিও তিন সপ্তাহে এরচে' বেশি টাকা আয় করে।'

'তা হলে টাকাটা নিয়ে জুতোর মিস্ত্রির কাজ দেখুন গে,' বললেন বায়ার্ড। 'আগে শেষ চ্যাপ্টারটা শেষ করবেন। সঙ্গে কাগজ কলম থাকলে প্রেনে বসেই লেখা শুরু করে দিন।'

কিন্তু প্রেনে উঠে জেরি একটা লাইনও লিখল না। বসে বসে ঝিমাল।

উঁচু উঁচু পাহাড়ের মাঝ দিয়ে উড়ে চলল বিমান, ল্যাটিন আমেরিকার আকাশে বার কয়েক এয়ার পকেটে পড়ে ঝাঁকি খেল, তারপর চোরের মত ছুটে পালাল অটলান্টিক কোস্ট ধরে। কেনেডি এয়ারপোর্টে যখন অবতরণ করল বিমান, তখনও ঝিমাচ্ছে জেরি।

'ডার্লিং-কী হয়েছে?'

টার্মিনাল এক্সিটের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল জেরি, অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল অ্যান রেমিংটনের চিত্তিত মুখশ্রীর দিকে। তারপর ওকে চুমু খেল। 'তোমাকে পরে বলব,' বলল সে।

কাস্টমসের ঝামেলা পার হয়ে আনের গাড়িতে চড়ে বসল জেরি। এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে এল ওরা, রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল।

গাড়িতে বসে নিজেকে যেন বন্ধনযুক্ত করল জেরি। 'দেখতে পাচ্ছ না?' দীর্ঘশ্বাস

ছাড়ল সে। 'সেই একই গল্প।'

'কিন্তু গল্পটা তো ভাল,' বলল অ্যান। 'গতরাতে তোমার একটি কার্বন কপি পড়ছিলাম। তোমার হিরো ল্যান্স পুস্টুলকে আমার বেশ পছন্দ হয়েছে। মাত্র আট বছর বয়সে সে তার বাবা-মা'কে হত্যা করে- পাঠকদের সমবেদনা উত্থলে উঠবে তার জন্য। এতিমদেরকে সবাই খুব মায়্যা করে।'

'অ্যান, গ্লিজ-'

'যে দৃশ্যে ছেলেটাকে তার দাদীমা রেপ করে ওটা তো সাংঘাতিক! টেলিভিশন নেটওয়ার্কের কর্তৃত্ব পেতে সে যেসব হত্যাকাণ্ড ঘটায়, টর্চার করে-দারুণ! ড্রাগস, ভায়োলেঞ্চ এবং সেক্সের মিশেলটা তো অসাধারণ! ভাল কথা, বইটির কী নাম দিয়েছ?'

'দ্য অ্যারিস্টোক্রেটস।'

'পারফেক্ট!'

মাথা নাড়ল জেরি। 'আল বায়ার্ডের জন্য আমি সাড়ে চার হাজার ডলারে বই লিখে দিছি অথচ ওটা বিক্রি করে সে কোটি কোটি টাকা কামাবে। এরমধ্যে পারফেক্টের কী দেখলে? ব্যাটা শুধু তার বিরটি ইয়টে বসে থাকে, বউদেরকে ডিভোর্স দেয়, আর মুক্তি তারকা এবং উঠতি ফ্যাশন মডেলদের সঙ্গে স্মৃতি করে-'

'এ জন্যই তো সে টাকা পায়,' বলল অ্যান। 'ওসব করে সে সেলিব্রিটি বনে গেছে। তার লাইফস্টাইল খবরের কাগজের প্রথম পাতায় ছাপা হয়, কাজেই সে যখন বই লেখে ওটাও কাগজে চলে আসে।'

'কিন্তু সে যা করে না তা হলো একটি বইও নিজে লেখে না। আমি লিখি এবং এ থেকে যা পাই তা দিয়ে তোমাকে বিয়ে করার সাহসও পাই না,' সশব্দে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল জেরি। 'যদি আমার নিজের নামে বইগুলো লিখতে পারতাম-'

'লিখছ না কেন?'

'কারণ সে সময়টা আমি পাই না আর টাকাও তো পাই না।'

হাসল অ্যান। 'আমরা ম্যানেজ করে নেব। ট্রান্সেল এজেন্সিতে আমার সেক্রেটারির কাজটা তো আছেই।'

'আমি তোমার বেতনের টাকা দিয়ে

রহস্যপত্রিকা

সংসার চালাতে চাই না।’

অ্যানের মুখের হাসিটি ম্লান হয়ে গেল, সে সজোর মুঠিতে চেপে ধরল স্টিয়ারিং হুইল, গাড়টাকে ঘোরাল ভাঙাচোরা, জীর্ণ চেহারার একটি অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের ফুটপাথের সামনে। এখানেই হতচ্ছাড়াদের মত জীবনযাপন করে জেরি।

‘আমি আসলে তোমাকে বুঝতে পারি না,’ বিড়বিড় করল অ্যান। ‘সেকেলে ধ্যান ধারণা নিয়ে বেঁচে থাকা একটা মানুষ কী করে এমন চালু আধুনিক পর্নো উপন্যাস লেখে?’

‘কারণ আমি সেকেলে টাইপেরই মানুষ,’ গাড়ি থেকে ব্যাগট্যাগগুলো বের করল জেরি। ‘আর আমি যখন বই লিখি তখন চালু ফ্যাশনের কথা মনে রাখি না। একটি ভাল উপন্যাসের সস্তা সুড়সুড়ির দরকার হয় না।’ অ্যানও গাড়ি থেকে নামতে যাচ্ছিল, তাকে হাত ইশারায় মানা করল ও। ‘তোমাকে আসতে হবে না। বইয়ের শেষ চ্যাপ্টারটা আমার এখন লিখতে হবে। বিশাল আইডেন্টিটি ক্রাইসিসের দৃশ্য যেখানে ল্যাস অবশেষে আবিষ্কার করে—সে তার স্ত্রী এবং গার্লফ্রেন্ডকে ত্যাগ করে এবং শিশু নির্ধাতনকারীতে পরিণত হয়।’

‘তোমার সঙ্গে কবে দেখা হবে?’

‘কাল রাতের মধ্যে সমস্ত কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। কাল সন্ধ্যার পরে এসো। এক সঙ্গে ডিনার করব। সাতটার দিকে চলে এসো।’

ওরা এক মুহূর্ত একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে থাকল তারপর অ্যান গাড়ি নিয়ে চলে গেল এবং জেরি সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত ওপরে উঠতে লাগল লেখার কাজটা শেষ করার জন্য।

দু’জনের কেউই খেয়াল করেনি অ্যাপার্টমেন্ট হাউজের প্রবেশপথের একটি পিলারের আড়ালে লুকিয়ে ছিল ছোটখাট একটি

মানুষ। ওদের ওপর নজর রাখছিল। ‘সাতটা, ফিসফিসিয়ে বলল সে। ‘কাল রাতে।’

কাজটা খারাপ হয়নি, মনে মনে বলল জেরি। তিন হাজার শব্দ, এর মধ্যে বেশিরভাগ জুড়ে রয়েছে চার অক্ষরের কথাটি, বারো পৃষ্ঠা জুড়ে সলিড হার্ডকোর সেন্স এবং ভায়োলেন্স। আল বায়ার্ড এবং তার পাঠকরা খুব খুশি হবে আর লেখাটি শেষ করতে পেরে জেরিও সন্তুষ্ট।

সে গোসল করল, দাড়ি কামাল এবং সাতটা বাজার একটি আগে যখন ডোরবেল বেজে উঠল ততক্ষণে সে রেডি।

ছটিকিনি তুলে দরজা খুলল জেরি।

‘অ্যান—’ বলল সে।

‘ভুল,’ বলল দোরগোড়ায় দাঁড়ানো ছোটখাট মানুষটি, জেরির দিকে কটমট করে তাকিয়ে আছে।

কপাল কোঁচকাল জেরি, হতভম্ব। ‘কে আপনি?’

‘দুঃখিত, পরিচয় দেয়ার সময় নেই,’ ক্ষুদ্রকায় লোকটি ওকে পাশ কাটিয়ে ঢুকে পড়ল ঘরে। ‘আপনি আমার সঙ্গে যাচ্ছেন।’

‘আপনার সঙ্গে যাচ্ছি মানে?’

‘বললাম তো ব্যাখ্যা দেয়ার সময় নেই,’ অনুপ্রবেশকারী হুমকির ভঙ্গিতে একটি আঙুল তুলল। ‘চলুন।’

‘প্রশ্নই ওঠে না,’ আগন্তকের চোখে চোখ রেখে বলল জেরি। এ লোক যে-ই হোক কিংবা যা-ই চাক না কেন, এই বাঁটকুলের চোখ রান্ধানিতে কোথাও যাচ্ছে না সে।

ঘুরল জেরি এবং ভুলটাও করল।

কারণ দোরগোড়ায় তার পেছনে রাবারের একটা গদা উঁচিয়ে হাজির হয়েছে বিশালদেহী এক লোক।

গদাটা দুম করে নেমে এল জেরির খুলি

বুক ভিলা

এখানে সেবা প্রকাশনীর সমস্ত বই ও রহস্যপত্রিকা বিক্রি করা হয়
১৯, সদর রোড (হোটেল গুলবাগ এবং সিটি ব্যাংকের নীচে)

বরিশাল।

ফোন: ০৪৩১-৬৩৭৭০

বরাবর, ছোটখাট মানুষটি তার কজিতে বাঁধা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সম্ভ্রষ্টচিত্তে মাথা ঝাঁকাল। 'ছ'টা উনপঞ্চাশ,' বলল সে। 'ঠিক সময়েই এসে পড়েছে।'

'হুঁ,' বলল প্রকাণ্ডদেহী। সে অজ্ঞান জেরিকে একটা চটের বস্তার মধ্যে পুরল। বস্তুটা কাঁধের ওপর ফেলে হুলুয়ে ধরে চলল ভবনের পেছন দিককার সিঁড়ি অভিমুখে।

বেঁটে লোকটি তাকে অনুসরণ করল। দু'জনে মিলে একসঙ্গে নামতে লাগল সিঁড়ি বেয়ে।

বিরাত মানুষ বেঁটে মানুষটির দিকে উৎকণ্ঠা নিয়ে তাকাল। 'Mach Schnell' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সে। 'কেউ আমাদেরকে দেখে ফেলতে পারে।'

'ও নিয়ে চিন্তা করো না,' বলল ছোটখাট লোকটি।

'মাল তো বস্তার মধ্যে।'

চটের বস্তার মধ্যে জ্ঞান ফিরে গেল জেরি। গুনগুন একটা শব্দ আসছে কানে, তারপর দূরগত বহুপাতের আওয়াজ। ক্রমে মিলিয়ে গেল শব্দগুলো।

তারপর একটা ছুরি দিয়ে কেটে ফেলা হলো তার মাথার ওপরের কাপড়। ভাঁজ হয়ে কাঁধের ওপর পড়ল কাটা চটের বস্তু। সিঁখে হলো জেরি। কাঁধ থেকে খসে পড়ল বস্তু। চারপাশে চোখ পিটপিট করে তাকাতে লাগল।

সে একটি প্রাইভেট প্লেনের সুপারিসর কেবিনে দাঁড়িয়ে আছে। এটি একটি লিয়ার জেট, চেহারা দেখে বোঝা যায়। দেয়ালে বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা ছবি। খুব ধনী মানুষ ছাড়া এত বড় বিমান এবং এত দামী দামী চিত্রশিল্পের মালিক হওয়া সম্ভব নয়।

ছবিগুলোর মধ্যে রেনোয়াঁ, পিকাসো এবং মোদি গ্রিয়ানির কাজ চিনতে পারল জেরি। ঘুরে দাঁড়াতেই কেবিনের শেষ প্রান্তে ছবিগুলোর মালিককে দেখতে পেল ও।

কারুকাজ করা চিপন ডেল ডেস্কের পেছনে হ্যাট মাথায় বসে থাকা দাড়িঅলা লোকটিকে চিনতে মোটেই ভুল করল না জেরি। টিনটেড গ্রাসের ফাঁক দিয়ে তিনি ওর দিকে তাকিয়ে আছেন। টেক্সিভিশনের

সাক্ষাৎকার প্রোগ্রামগুলো যারা একবার দেখেছে, এ লোককে চাক্ষুষ করার সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারবে।

'কনওয়ে ম্যান!' হাঁপিয়ে ওঠার মত শব্দ করল জেরি।

দাড়িঅলা লেখক মাথা দোলালেন। হেসে তাঁর ডেস্কের সামনে রাখা হেপেলহোয়াইট চেয়ারে বসার জন্য ইংগিত করলেন জেরিকে।

'আমার আস্তানায় স্বাগতম,' বললেন তিনি। 'আশা করি আমার স্থূল আমন্ত্রণের ধরনটি ক্ষমার চোখে দেখবেন, মি. গিবস। তবে আপনার সঙ্গে দেখা করা খুবই দরকার ছিল।'

'ক্রিবস।'

'ও হ্যাঁ,' মোটা একটা হাত দিয়ে তিনি ডেস্কের ড্রয়ার হাতড়ালেন, হলুদ কতগুলো বড়ি উদয় হলো তাঁর তালুতে, পরক্ষণে ওগুলো অদৃশ্য হয়ে গেল দাড়িঅলা মুখের মধ্যে। বড়িগুলো গিলে নিয়ে বললেন, 'আপনি হয়তো ভাবছেন কেন আপনাকে এখানে ধরে নিয়ে আসা হলো।'

'সে আমি বুঝতে পেরেছি,' বলল জেরি। 'দুই গুণ্ডা এবং একটা চটের বস্তু।'

'মাই ডিয়ার হিবস—'

'ক্রিবস।'

'ও, হ্যাঁ,' আবার ড্রয়ারে ফিরে গেল হাত, এবারে এক তাড়া কাগজ এগিয়ে দিলেন তিনি। 'পাবলিশার্স উইকলিতে এ বিজ্ঞাপনটি যাবে। অনুগ্রহ করে একটু চোখ বুলান। আপনি আগ্রহ বোধ করতেও পারেন।'

পূর্ণপৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনটির বড়বড় অক্ষর-গুলোর দিকে চোখ বিক্ষারিত করে তাকিয়ে রইল জেরি।

মর্মস্পর্শী।

অবিখ্যাস্য কেলেকারি।

দারুণ উত্তেজনাকর।

মাথা খারাপ করা সেক্স...ভয়ঙ্কর ভায়োলেন্স...দুর্দান্ত সুডুড়ি... এ এমন এক উপন্যাস যা আমেরিকার ক্ষমতালোভী প্রভুদের দরজার আড়ালে লুকিয়ে থাকা সমস্ত গোপন অভিশাপ এবং লালসাকে উন্মুক্ত করে দেবে... নিজেদের নিষিদ্ধ আনন্দ উপভোগ করতে যখন তাঁরা বুদো জন্তুর মত ছুটে চলেন এক

শয়নকক্ষে থেকে আরেক শয়নকক্ষে! এ বই
কিছুতেই মিস করবেন না যেন!

THE TASTMAKERS

লিখেছেন

কনওয়ে ম্যান

SCRIBBLERS N SONS-এর
বেস্টসেলিং ব্লকবাস্টার লেখক।

ডেস্কটপের ওপর বিজ্ঞাপনটি নামিয়ে
রাখল জেরি। 'আপনার নতুন উপন্যাস?'

'তা তো বটেই।'

'ভাল?'

কাঁধ ঝাঁকালেন কনওয়ে ম্যান। 'সেটা
নির্ভর করবে আপনার ওপর। আপনি এ বইটি
লিখে দেবেন।'

'থামুন, থামুন-'

'আমি থেমেই আছি, মি. ড্রিবস। তবে
বেশিক্ষণ থেমে থাকতে পারব না। এমাসের
শেষ নাগাদ উপন্যাসটি প্রকাশককে দেয়ার
কথা।'

'একটা ব্যাপার আগে পরিষ্কার হয়ে নিই।
আপনি বলছেন যে আপনার বইগুলো নিজে
লেখেন না?'

'তাতে অবাক হওয়ার কী আছে? ওই
হারামী আল বাযার্ডও তো নিজে লেখে না।'

'আপনি তা হলে ব্যাপারটা জানেন?'

'অবশ্যই জানি। তা হলে কেন আপনাকে
এখানে নিয়ে এলাম? ডানে-বামে মাথা
নাড়লেন কনওয়ে ম্যান। 'আমাকে ভুল বুঝবেন
না। এ কাজ আমি নিজেই করতে পারি কিন্তু
সম্প্রতি আমি রাইটারস ব্লকে ভুগছি। কিছু
লিখতে পারছি না।'

'কবে থেকে এর শুরু?'

'১৯৫৯ সাল থেকে,' লাল ক্যাপসুল মুখে
পুরলেন লেখক। 'সামনে অনেকগুলো কাজ
পড়ে আছে আমার। সে কমিটমেন্টগুলো রক্ষা
করতে হবে। বড়বড় লেখকদের তাদের দায়িত্ব
পালন করতেই হয়। এজন্য সৃষ্টিশীলতাকেও
অনেক সময় কোরবানি দিতে হয়। সে যাকগে,
এজন্যই আপনাকে এখানে নিয়ে আসা
হয়েছে।'

'এবং এজন্যই আমি এখান থেকে বেরিয়ে
যাব,' বলল জেরি।

'চলিশ হাজার ফুট উঁচু থেকে?' আবার

কাঁধ ঝাঁকালেন কনওয়ে ম্যান। 'বেশ তো,
আপনার যেমন অভিশ্রায়।'

'দেখুন,' চোঁচিয়ে উঠল জেরি। 'আপনি
আমাকে কিডন্যাপ করেছেন। এটা একটা
দণ্ডনীয় অপরাধ। আমি আপনার বিরুদ্ধে
মামলা করব।'

'আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে
আপনাকে আর পৃথিবীর আলো-বাতাস ভোগ
করতে হবে না।'

'কিন্তু আমি কেন?' বলল জেরি।
'আপনার নিশ্চয় কোন গোস্ট রাইটার আছে যে
আপনার নামে গল্প-উপন্যাস লিখেছে। তার কী
হয়েছে?'

'সে আর লিখবে না বলেছে,' বিড়বিড়
করলেন কনওয়ে ম্যান। 'ওকে কোথায় কবর
দেয়া হয়েছে দেখতে চান?'

কনওয়ে ম্যান, যার খ্যাতি এবং সম্মান
ধূসিৎ হতে চলেছে তিনি নিশ্চয় মিথ্যা কথা
বলছেন না। তাঁর মোটা হাতটা আবার ডেস্ক
ড্রয়ারের দিকে এগোতে দেখে জেরি আশঙ্কা
করল এখন নিশ্চয় ওই হাতে ঝলসে উঠবে
রিভলভার।

বদলে উঠে এল এক তাড়া ডলার।

'ছয় হাজার,' বললেন দাড়িঅলা,
'অ্যাডভান্স।'

'ছয় হাজার?'

'কিপটুস বাযার্ড এল এর চেয়ে
আপনাকে কম দেয় বলেই আমি আমার
গুণ্ডচরদের কাছে গুনেছি,' মোটা হাতখানা
বাড়িয়ে দিলেন তিনি। 'টাকাটা নিয়ে কেটে
পড়ুন-কবে লেখাটা দিতে হবে জানেনই তো।'

'কিন্তু এক মাসের মধ্যে আমি গোটা
একটা উপন্যাস লিখতে পারব বলে মনে হয়
না,' বলল জেরি।

'পারবেন এবং আপনাকে পারতেই হবে,'
বললেন কনওয়ে ম্যান। 'নইলে কপালে কী
আছে জানেনই তো।'

কম্পিত হাতে টাকাগুলো পকেটে রাখল
জেরি। 'আমি চেষ্টা করব,' বলল ও। 'তবে
বইটি কী নিয়ে হবে তা কিন্তু আপনি আমাকে
বলেননি।'

'উনিশ হাজার শব্দের মধ্যে বইটি
লিখবেন,' টেবিলের ওপরে রাখা কাগজটির

দিকে ইঙ্গিত করলেন কনওয়ে ম্যান। 'এ বিজ্ঞাপন দিয়ে গল্পের পুঁট তেমন কিছু বোঝা যায় না। কাজেই আপনি আপনার মত করে লিখবেন। আপনি তো জানেনই পাঠক কী ধরনের লেখা পছন্দ করে। রাজনীতির অন্তরালে কী ঘটছে, সমাজের রাষব বোয়ালরা কী করছে, ইত্যাদি। সম্ভব হলে স্যানফ্রান্সিসকোতে নেক্রেফিলিয়ার (জাদুবিদ্যার সাহায্যে মরা মানুষের সঙ্গে আলাপচারিতা-অনুবাদক) একটু ছোয়া দেবেন, জাতিসংঘে প্রেতপূজার ঘটনা থাকবে, হোয়াইট হাউসে হবে উন্মত্ত যৌনাচার-আপনার ওপর সব ছেড়ে দিলাম।'

গভীর দম নিল জেরি। 'আমি যথাসাধ্য ভালটা দেয়ার চেষ্টা করব।'

'আপনার যথাসাধ্য ভালটা দিলে হবে না,' বললেন কনওয়ে ম্যান। 'আপনার সবচেয়ে জঘন্যাটা দেবেন।'

চেয়ার ছাড়লেন তিনি, ডেস্ক ঘুরে এলেন, তাকালেন ঘড়ির দিকে। 'আমি পাইলটকে বলছি আপনাকে নামিয়ে দিতে। তারপর আমার ছেলেরা আপনাকে নিরাপদে বাড়ি পৌঁছে দেবে।'

'তার প্রয়োজন নেই।'

'প্রয়োজন আছে,' টিনটেড লেপের পেছনে সরু হয়ে এল কনওয়ে ম্যানের চাউনি। 'বই লেখা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওরা আপনার ওপর নজর রাখবে।'

'যদি বই লেখা শেষ না হয়?'

'তা হলে ওরা আপনাকে শেষ করে দেবে।'

'আপনার হুমকিতে আমি ডরাই না,' বলল জেরি। 'আমি পুলিশে ফোন করব-'

'পারবেন না। আপনার ফোনের লাইন কেটে দেয়া হয়েছে। আমার প্রকাশকের কাছে যদি বইটা ঠিক সময়ে পৌঁছে দিতে না পারি তা হলে আপনাকেও কেটে ফেলব।' জেরির কাঁধে হাত রেখে হাসলেন কনওয়ে ম্যান। 'বেঘোরে প্রাণটা হারাবেন কেন, ভাই? যা বলছি তাই করুন।'

সদুপদেশটি মাথায় নিল না জেরি। বাড়ি ফিরে দেখে তার অ্যাপার্টমেন্টের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে অ্যান।

'রাত নটা বাজে,' বলল অ্যান। 'আমি দু'ঘণ্টা ধরে তোমার জন্য অপেক্ষা করছি। কোন চুলোয় গিয়েছিলে শুনি?'

'আমি আসলে একটা চুলোর মধ্যেই ছিলাম এতক্ষণ,' বলল জেরি, তাকাল গাড়ির দিকে যেটি থেকে এইমাত্র নেমে এসেছে ও। ওটার হেডলাইটজোড়া জ্বলজ্বল করে জ্বলছে, গর্জন ছাড়ছে মোটর, লাফিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত প্যাছারের মত মসৃণ শরীর নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে রয়েছে ফুটপাথের ওপর।

ওর চোখ অনুসরণ করে তাকাল অ্যান। হুইলের পেছনে বিরাটদেহী এক লোককে দেখতে পেল। তার পাশে বসে আছে ক্ষুদ্রকায় একজন মানুষ।

'প্রিজ, ডার্লিং, ভেতরে এসো,' অ্যানের হাত ধরে ওকে দরজার মধ্যে টেনে নিল জেরি। 'আমি সব ব্যাখ্যা করছি।'

'ভাই ভাল।'

কিন্তু ঘরে ঢুকে যা শুনল তা মোটেই ভাল মনে হলো না অ্যানের কাছে।

'একী বলছ তুমি!' জেরির সন্ধ্যার অভিজ্ঞতা শুনে মন্তব্য করল অ্যান। 'বাঘাডের জন্য উপন্যাস লিখতে তোমার কয়েক মাস সময় লেগেছে। আর ম্যান আশা করছে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তুমি তাকে উপন্যাস লিখে দেবে!'

'এটা কিছুতেই সম্ভব নয়,' সায় দিল জেরি। 'কিন্তু ও থেকে বেরুবার রাস্তাও নেই।'

'সে তুমি বেরুতে পারবে না,' বলল অ্যান। 'কিন্তু আমি যখন খুশি যেতে-আসতে পারব।'

'মানে?'

'মানে সহজ,' হাসল অ্যান। 'আমি এখন চলে বাচ্ছি। আমি বাড়ি পৌঁছেই পুলিশে ফোন করব। ওরা এখানে চলে আসবে এবং যা ঘটেছে তুমি ওদেরকে বলবে। ব্যস, তুমিও তখন ফ্রি।'

'বাহ, চমৎকার!'

অ্যান হাসতে হাসতে দরজায় পা বাড়াল এবং খুলল। সঙ্গে সঙ্গে তার হাসিটা নিভে গেল দপ করে। দোড়গোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই ছোট মানুষটি, স্কীত চক্ষু। সে তার কোটের পকেটে যেখানে হাত রেখেছে, সেই জায়গাটিও

ক্ষীত।

‘আপনার কথা আমি শুনে ফেলেছি, লেডি। কেউ পুলিশে খবর দিচ্ছে না।’

বিস্ফারিত হলো অ্যানের চোখ। ‘তার মানে আপনারা আমাকে এখানে জেরির সঙ্গে আটকে রাখবেন?’

মাথা নাড়ল লোকটি। ‘আমি তা বলিনি। যে কেউ যদি দোকানে যেতে পারে, সে আপনিও হতে পারেন। তবে যখনই বেরুবেন, আপনার সঙ্গে আমি থাকব। আর আমার সঙ্গী নীচতলায় বসে আপনার বয়ফ্রেণ্ডের ওপর নজর রাখবে। বসের অর্ডার।’

জেরি চলে এসেছে। দুই ডুপ্ল কোঁচকানো। ‘আপনাদের বস সবকিছুর ওপর খেলায় রাখেন, না?’

‘হম,’ বিস্তী হাসল ছোট মানুষটা। ‘আপনার এখন চিন্তা করার সময়, বন্ধু। ভুলে যাবেন না আপনাকে একটি বই লিখতে হবে।’

পরের কয়েকটি দিন যেন ঝড়ের গতিতে কেটে যেতে লাগল। অ্যান বেশিরভাগ সময় লিভিংরুমে কাটায়, জেরির টাইপ-রাইটার বেডরুমের দরজার ওপাশে খটখট শব্দ তুলতে থাকে। মাঝেমাঝে বই পড়ে অ্যান, কখনও টিভি দেখে, আবার কখনও জানালা দিয়ে কালো লিমুজিনটির দিকে ঠায় তাকিয়ে থাকে। মাঝেমধ্যে সে রাস্তায় একটু আধটু ইঁটাইটি করে, সুপারমার্কেটে যায় কেনাকাটা করতে, কিন্তু সর্বদা তার সঙ্গে একজন পাহারায় থাকে। অ্যান ছোট মানুষটির সঙ্গে কথা বলে না, খর্বাকৃতির লোকটিও অ্যানের সঙ্গে বাতচিত করার প্রয়োজন বোধ করে না। জেরি যখন শোবার ঘর থেকে খাওয়ার জন্য বেরিয়ে আসে তখন তার সঙ্গে কদাচিৎ কথা হয় অ্যানের।

জেরির বিধ্বস্ত চেহারা দেখলেই সব বোঝা যায়। সে ডেডলাইনের বিরুদ্ধে ছুটছে, নিজের জান বাঁচানোর জন্য ছুটছে, এসময় তাকে প্রশ্রুত বিন্দু করে বিরক্ত করতে চায় না অ্যান।

কিন্তু মাসের শেষের দিকে, যখন সময় প্রায় একদমই নেই, একটি মুহূর্ত এল যে অ্যান আর নীরব থাকতে পারল না।

কিচেন টেবিলে বসে কফি পান করছিল দু’জনে, জেরির কংকালসার দেহ আর চকচকে চোখের চাউনি সহ্য করতে পারছিল না অ্যান। তার ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বিস্ফারিত হলো প্রশ্নটি, যে প্রশ্ন সকল লেখককেই ভীত করে তোলে।

‘লেখা কেমন চলছে?’ জিজ্ঞেস করল অ্যান।

মাথা নাড়ল জেরি। ‘চলছে না,’ বিড়বিড় করল সে।

‘তার মানে নির্ধারিত সময়ে শেষ করতে পারবে না?’

‘শুরুই করিনি এখনও।’

‘শুরু করনি?’ অ্যানের কপালে ভাঁজ।

‘কিন্তু ভূমি তো দিনরাত টাইপ করছ।’

‘রাতে টাইপ করি কারণ ঘুম আসে না। আর দিনের বেলা ছাইপাশ কী লিখছি সে চিন্তায় রাতে ঘুমাতে পারি না। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা নতুন নতুন শুরু হচ্ছে—কিন্তু একটারও কোন মাথামুণ্ড নেই, সবগুলোর জায়গা হবে ময়লাফেলার বুড়িতে। আমার ভয় লাগছে ভেবে অবশেষে এটা ঘটছে, যেভাবে ঘটছে আল বায়ার্ড এবং কনওয়ে ম্যানের জীবনে।’

‘মানে?’

‘তারা যখন লেখা শুরু করেন, নিজেদের গল্প নিজেরাই লিখতেন। তারপর ধীরে-ধীরে ওটা তাঁদেরকে পেয়ে বসে। একই জিনিস নিয়ে সারাজীবন কেউ চলতে পারে না—প্রতিদিন দুর্নীতি, নিষ্ঠুরতা, মারামারি কাটাকাটি, অনাচার, ভোয়েরিজম (যে লোক নুকিয়ে মানুষের যৌনমিলন দেখে মজা পায়—অনুবাদক), ধর্ষকাম। এসব লিখে লিখে তাঁরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাই তাঁরা গোস্ট রাইটার ভাড়া করেন, আমার মত লেখকদের দিয়ে লেখাতে শুরু করেন। সমস্যা হলো সেই একই জিনিস এখন আমার জীবনেও ঘটছে।’ জেরি তার যন্ত্রণাকাতর মুখখানা তুলল। ‘ওই ধর্ষণ আর খুনের কথা লিখে লিখে আমিও বেজায় ক্লান্ত। আমার কলম আর চলতে চাইছে না। এমনকী জ্যাক দ্য রিপার হলেও শেষে সে খুনাখারাবী ছেড়ে দিত।’

চেয়ার ছাড়ল অ্যান, চলে এল পরিচিত মানুষটির কাছে। ‘আমার কথা শোনো,’ নরম

গলায় বলল সে। 'এত হতাশ হলো না। তোমাকে যা করতে হবে তা হলো বায়ার্ডের শেষ চ্যাপ্টারটা শেষ করা। তুমি যদি আরেকটু এগোতে পারো—'

'তুমি আমার কথা বুঝতে পারছ না?' টেবিলের ওপর দুম করে ঘুঘি মারল জেরি। 'এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমি চব্বিশ ঘণ্টা টাইপ-রাইটার নিয়ে পড়ে থাকলেও ডেডলাইন অনুযায়ী কিছুতেই শেষ করতে পারব না লেখা। হাতে একদমই সময় নেই।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে লিভিংরুমে হেঁটে গেল অ্যান। পেছন পেছন গেল জেরি। দু'জনে মিলে জানালা দিয়ে তাকাল বাইরে, ফুটপাথে হামাগুড়ি দিয়ে রয়েছে কালো গাড়িটি। অপেক্ষা করছে। ওরা দু'জন কেউ কোন কথা বলছে না। কথা বলে এখন কোন লাভও হবে না—যদি না আগামী তিনদিনের মধ্যে জেরি উনিশ হাজার শব্দ ফুটিয়ে তুলতে পারে কাগজের গায়ে।

নীরবতা ভঙ্গ করল অ্যান। চেহারা এবং কণ্ঠস্বর দুটোতেই চিন্তার ছাপ।

'মনে হয় এটাই সবচেয়ে ভাল হবে,' বলল সে।

'বুঝলাম না।'

'তুমি সময়মত কাজটা শেষ করতে পারলেও খুব একটা লাভ হতো না। প্রথমে ভেবেছিলাম এটা বুঝি ঈশ্বরের একটা অনুগ্রহ। আর বায়ার্ডের কাছ থেকে পাওয়া সাড়ে চার হাজার ডলার, আর কনওয়ে ম্যানের দেয়া অ্যাডভান্স ছয় হাজার—সব মিলিয়ে সাড়ে দশ হাজার ডলার। অনেক টাকা। এ টাকা দিয়ে তুমি অবশেষে নিজের নামে একটি বই লিখতে পারতে। কিন্তু এখন কিছু আসে যায় না, তাই না? তুমি তো বললেই আর লিখতে পারবে না—'

'আমি কক্ষনো তা বলিনি!' জেরি শক্ত করে চেপে ধরল অ্যানের হাত। 'আমি বলেছি আমি আর সস্পেন্স এবং ভায়োলেন্স লিখতে পারব না। আমি যে উপন্যাসটি লিখতে চাই তা হবে অন্যরকম। কোন যৌন সুড়সুড়ি থাকবে না, সস্তা অ্যাণ্ডি হিরো থাকবে না, সেলিব্রিটিরা ছদ্মনামে কাউকে প্রতারণা করবে না। আমার

বইয়ের পাত্র-পাত্রীরা হবে সাধারণ মানুষজন, আমরা নিত্যদিন যেসব সমস্যার মুখোমুখি হই তাদেরকেও সেসব সমস্যা মোকাবেলা করে চলতে হবে।'

'কিন্তু এরকম বই কি বিক্রি হবে?'

অ্যানের গলায় সন্দেহের সুর থাকলেও জেরির কণ্ঠে তা নেই। 'কেন বিক্রি হবে না? অন্তত পাঠকদেরকে আমি বাস্তব কিছু দিতে পারব, তারা বিষয়টি নিয়ে ভাববে, চিন্তা করবে। বায়ার্ড এবং ম্যান যেসব পূর্ণাঙ্গ রূপকথা তৈরি করেছেন ওতে শুধু গণ্ডাধা কাহিনিই আছে—একটা থেকে আরেকটাকে আলাদা করার উপায় নেই। আমি প্রকৃত সাহিত্যের কথা বলছি।'

অ্যানের চাউনি থেকে সন্দেহ যায় না। 'তুমি তোমার বইটা প্রমোট করবে কীভাবে?'

'একটি সৎবই চালানোর জন্য ঢাকঢোল পেটানোর দরকার নেই,' বলল জেরি। 'একজন ভাল লেখক কখনও অপযশ চান না। থ্যাকারের কথা চিন্তা করো—তার কি ইয়ট ছিল? হেনরি জেমস কি মাথায় হাস্যকর টুপি চাপিয়ে লিয়ার জেটে ঘুরে বেড়াতেন? জেন অস্টেন কি ব্যাভিচার করতেন? শেক্সপীয়ারকে কি কোনদিন লেটনাইট টকশোতে দেখা গেছে?'

'ভাবছি বিষয়টি নিয়ে,' অ্যান বলল ওকে। তার গলার স্বর কেমন অদ্ভুত শোনা। 'জেরি, আমার একটা কাজ করে দাও। আমার সঙ্গে এক মিনিটের জন্য বেডরুমে চলো। তোমার ফাইলপত্র কোথায় থাকে একটু দেখিয়ে দেবে।'

ওরা দু'জনে মিলে শয়নকক্ষে প্রবেশ করল। 'এই কেবিনেটটিতে থাকে।'

'ও আচ্ছা,' তবে ফাইল কেবিনেট নয়, অ্যানের চোখ ঘুরছে জেরির টেবিলে—দেখছে টাইপ-রাইটার, কাগজ, ভারী পেপারওয়েটের নীচে চাপা দিয়ে রাখা কার্বন পেপার। তার চাউনি সঙ্গ হয়ে এল। 'জেরি—তোমার নিজের বইটা। সত্যি তুমি ওটা লিখতে চাও?'

'পৃথিবীর যে কোন কিছুর চেয়ে বেশি চাই।'

'এবং তুমি নিশ্চিত বইটি বিক্রি হবে?'

মাথা ঝাঁকাল জেরি। ঘুরল। 'আমার অনুমান ভুল প্রমাণিত হলে আমি হয়তো হার্ট-

অ্যাটাকেই মারা যাব।’

আর ঠিক তখন অ্যান ওর মাথার পেছনে পেপারওয়েট দিয়ে বাড়ি মারল...

‘মারা গেছি,’ গোড়াচ্ছে জেরি। ‘আমি মরে গেছি—’

‘উঠে পড়ো,’ অ্যান ওর কাঁধ ধরে ঝাঁকোচ্ছে। ‘তুমি মারা যাওনি।’

চোখ মেলে চাইল জেরি। অন্ধকার ঘর। শুধু অ্যানের ছায়াছায়া মুখখানা দেখা যাচ্ছে। উদ্ভিগ্ন চেহারা নিয়ে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। ‘তুমি আমাকে মারলে কেন?’ উঠে বসল জেরি, মাথার পেছনে গজিয়ে ওঠা আলুটা ডলছে।

‘পরে ব্যাখ্যা দেব। এখন কথা বলার সময় নেই। এখান থেকে বেরুতে হবে।’

‘গুণাগুণো?’

‘নিজেই দেখো।’

টলতে টলতে লিভিংরুমে ঢুকল জেরি। চলে এল জানালার সামনে। তাকাল নীচে।

কালো লিমুজিনটা নেই। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে অ্যানের গাড়ি।

‘চলো,’ বলল অ্যান। ‘এয়ারপোর্টে যাব। গাড়িতে তোমার ব্যাগ গুছিয়ে রেখেছি।’

‘আমরা কোথায় যাচ্ছি?’

‘কোস্টারিকা।’

‘ভুরু কৌচকাল জেরি। ‘বুঝলাম না।’

‘পরে বুঝবে।’

প্লেন আকাশে ওড়ার পরে বুঝতে পারল জেরি।

‘তুমি নিজের উপন্যাস লিখতে চাও শুনে আমি খুব অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম,’ অ্যান বলল ওকে। ‘তখন মাথায় আইডিয়াটা চলে আসে। তোমাকে পেপারওয়েট দিয়ে মারার জন্য দুঃখিত কিন্তু আমি জানতাম নিজে থেকে কাজটি করতে কিছুতেই তুমি রাজি হতে না।’

‘কীসে রাজি হতাম না?’

‘কনওয়ে’ ম্যানের নতুন উপন্যাস তাঁর প্রকাশককে পৌছে দিতে।’

‘কিন্তু কোন নতুন উপন্যাসই তো লেখা হয়নি।’

‘এখন হয়েছে। আমি আল বায়ার্ডের

পাণ্ডুলিপির একটা কার্বন কপি নিয়েছিলাম। ওটা পড়ার পরে শুধু চরিত্রগুলোর নাম বদলে দিয়েছি।’

‘তার মানে তুমি দুই প্রকাশককে একই বই দিয়েছ?’

‘শেষ অধ্যায়টিসহ,’ মাথা দোলাল অ্যান। ‘তুমি নিজেই বলেছ ওদের দু’জনের কাহিনির ধরন একইরকম।’

‘এজন্যেই কনওয়ে ম্যানের গুণারা আমাদেরকে ছেড়ে দিয়েছে।’

‘হঁ। জিবলারস অ্যাণ্ড সপ্পের অফিসে পাণ্ডুলিপি পৌছার পরে ওরা চলে গেছে। আমরাও চলে এসেছি।’

• ‘কিন্তু কোস্টারিকা কেন?’

‘এদেশে কোন এক্সট্রাডিশন ল নেই।

ম্যান এবং বায়ার্ড আমাদের সন্ধান পেলেও কেউ তোমার টিকিটিও স্পর্শ করতে পারবে না। তোমার কাছে নগদ টাকা আছে, এ দিয়ে বছরখানেক আমরা দিব্যি চলতে পারব। তুমি এই ফাঁকে তোমার বইটি লিখে ফেলতে পারবে।’ হাসল অ্যান। ‘তা ছাড়া, ডার্লিং, তুমি যা বলেছ তা যদি সত্যি হয়, কেউ কিছু বুঝতেই পারবে না। বায়ার্ড, ম্যান, কিংবা প্রকাশক কেউ নয়, পাঠকদের তো প্রশ্নই আসে না।’

গুণিয়ে উঠল জেরি। ‘হয়তো ঠিকই বলেছ তুমি।’

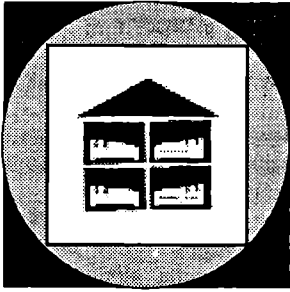
ওর হাত চাপড়ে দিল অ্যান। ‘আমি জানি আমি ঠিক বলেছি।’

এবং অ্যানের কথাই শেষমেশ ফলল।

মাসখানেক বাদে দ্য অ্যারিস্টোক্রাটস এমন হিট করল যে আল বায়ার্ড নতুন একটি ইয়ট কিনে ফেললেন, তাতে দু’টি সুইমিংপুল, একটিতে পানির বদলে শুধু শ্যাম্পেন দিয়ে ভরে রাখলেন তিনি। আর দ্য টেস্ট-মেকারস আরও বেশি সাফল্য পেল। কনওয়ে ম্যান কিনলেন জ্যাকসন পোলক, ভ্যান গগ এবং রেমব্রান্টের তিনটি অরিজিনাল ছবি, সে সঙ্গে আরেকটি নতুন হ্যাট।

জেরি ক্রিবস অবশেষে তার নিজের উপন্যাসটি লিখে ফেলল। নিজের নামেই বের হলো সে বই। বইটি হয়তো আপনি পড়েছেন। আবার না-ও পড়তে পারেন।

বইটি মাত্র ১৪৮ কপি বিক্রি হয়েছে! ■



খ্রীষ্টের মেক-আপ ও ত্বকের যত্ন

প্রিয় বোনেরা,

সবাইকে অনেক শুভেচ্ছা। গরম এখন একদম জেঁকে বসেছে। প্রকৃতিতে পরিবর্তনের ফলে আমাদের দেশে এখন প্রায় ন'মাসই গরমকাল। গরমকালে যারা রূপচর্চার বিষয়ে বরাবরই খানিকটা উদ্বিগ্ন থাকেন তাদের আশ্বস্ত করতেই এবারের এই আলোচনা। গরমে সাজগোজ কিংবা মেক-আপ অল্প সময়েই নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে। গলে যাওয়া ফন্ডেশন, মাখামাখি আই লাইনার আর ফ্যাকাসে লিপস্টিক নিয়ে একেবারে বেহাল দশা হয়ে যায় কারও কারও। এই অবস্থা থেকে অব্যাহতি পাওয়া যেতে পারে বেশ সহজেই, যদি আপনার জানা থাকে কিছু সামার মেক-আপ টিপস। কয়েকটি সহজ পদ্ধতি রপ্ত করে নিতে পারলে এই প্রখর খ্রীষ্টের দাবদাহকে অনায়াসে পরাস্ত করতে পারবেন। আমরা জানি গরমে ফাউন্ডেশন গলে যায়। ফাউন্ডেশন গলে যাওয়া গরমের সময় মেক-আপের অন্যতম সমস্যা। এই সময়ে পুরু ফাউন্ডেশনের পরত দেখতে মোটেও ভাল লাগে না। কারণ তা গলে গিয়ে কখনও থকথকে দেখায়। আর তাই এই সময়ে ফাউন্ডেশনের বদলে ব্যবহার করতে পারেন টিনটেড ময়েচারাইজার। এতে ত্বক অনেকটাই হালকা থাকে। ত্বকে স্বাভাবিকভাবে বাতাস চলাচল করতে পারে। ঔজ্জ্বল্যও কোনো ঘাটিতি দেখা দেয় না। ভেজা স্পঞ্জ দিয়ে ময়েচারাইজার লাগান। যদি মনে হয় শুধু ময়েচারাইজার ত্বকের দাগছোপের জন্য যথেষ্ট নয়, সেক্ষেত্রে ময়েচারাইজার লাগানোর পর তার উপরে ব্যবহার করতে পারেন পাউডার ফাউন্ডেশন। ভালভাবে ব্রেণ্ড করার পর ব্রাশ দিয়ে ভাল করে ডাস্ট করে নিতে কিন্তু ভুলবেন না। যাদের চোখের তলায় ডার্ক সার্কেল আছে তারা টিনটেড আই ক্রিম লাগিয়ে তার উপর হালকা হাতে ব্রাশ করে নিতে পারেন ট্রান্সলুসেন্ট পাউডার। এক্ষেত্রে পুরু কনসিলার ব্যবহার না করলেও চলবে। ফাইন লাইনস ঢাকতে ব্যবহার করতে পারেন কোনো ভাল ব্র্যাণ্ডের প্রাইমার বা ইলিউমিনেটর। রাতে কোনো অনুষ্ঠানে বা পার্টির জন্য যদি ত্বকে একটু বাড়তি ঔজ্জ্বল্য চান তা হলে ব্রঞ্জারের কয়েকটি স্ট্রোকই যথেষ্ট। পাউডার ব্রঞ্জার ব্যবহার করুন মুখের হাই পয়েন্টগুলোতে, যেমন কপাল, নাকের ডগা, চিকবোন এবং খুঁতনিতে। পাউডার ব্রঞ্জার খুব সহজেই চেহারাকে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারে। ব্রঞ্জার ব্যবহার করার জন্য নরম ব্রিসল দেওয়া ব্রাশ ব্যবহার করুন যাতে কোনো এক জায়গা বেশি পরিমাণে জমাট বেঁধে না থাকে। ব্যবহার করার পর অবশ্যই হালকা হাতে ব্রাশ করে দেবেন। যাদের ছোট চুল, তারা কানের লতি এবং ঘাড়ের ব্রঞ্জার ব্রাশ করে নিন

ঘর-সংসার

শামীমা আক্তার

রোদে বেরুনের আগে

অবশ্যই লাগান সঠিক এসপিএফ

যুক্ত সানস্ক্রিন। যতক্ষণ বাইরে

থাকবেন, কয়েক ঘণ্টা অন্তর অন্তর

অবশ্যই সানস্ক্রিন লাগাবেন।

বার্ভাতি ওজ্জ্বল্যের জন্য। ফাউন্ডেশন হালকা, তার উপর সামান্য ব্রঞ্জার, তা হলেও কিন্তু মনে হতে পারে পাটির মেক-আপের জন্য কী যেন ঘাটতি রয়ে গেল। সেই ঘাটতি পূরণ করতে পারে উজ্জ্বল ও আকর্ষণীয় ঠোঁট। গরমে মুখের মেক-আপ হালকা রেখে ঠোঁটের লিপস্টিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতেই পারে। দিনে ব্যবহার করতে পারেন টিনটেড লিপগ্লস। আর রাতের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখুন গাঢ় ও উজ্জ্বল রঙের লিপস্টিক। পোশাকের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে লাল, গোলাপি, কোরাল কিংবা অন্য যে কোনো উজ্জ্বল রং বেছে নিন। এবার চোখের মেক-আপের কথা বলছি। গরমের দিনে হালকা নিউট্রাল শেডের আই শ্যাডো খুবই মানানসই হতে পারে। তবে খুব গরমের দিনে কমাণ্ট আই মেক-আপের বদলে সুন্দর করে আঁকা আই লাইনার এবং মাসকারার ছোঁয়াই আপনার চোখকে আকর্ষণীয় দেখাবার জন্য যথেষ্ট। গরমের সময় সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মব্যস্ততার কারণে রূপচর্চার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। দিনের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রকম রূপচর্চা করলে ত্বকের ওজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পায়, ত্বক থাকে সজীব। আর এজন্য যেটা প্রয়োজন তা হলো নিয়মিত বিরতিতে ত্বকের যত্ন নেওয়া। এটা কিন্তু মোটেই একতরফা পরিশ্রম নয়, এর পরিবর্তে আপনার ত্বকও আপনাকে ফেরত দেবে অসাধারণ এক ওজ্জ্বল্য যা দেখে আপনি নিজেই চোখ সরাতে পারবেন না। সকালে উঠেই মাইল্ড ফেস ওয়াশ দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন। এতে রাতে মুখে জমে ওঠা অতিরিক্ত তেল ধুয়ে যাবে। যাদের অতিরিক্ত শুষ্ক ত্বক তাঁরা ক্রেনজিংয়ের পর ওয়াটার বেসড ময়েশ্চারাইজার মেখে নিতে পারেন। যাদের পাকি আইজের সমস্যা আছে তাঁরা আই ক্রিম দিয়ে চোখের চারপাশ একবার মাসাজ করে নিন। অফিসে যাওয়ার আগে হালকা মেক-আপ করেন অনেকেই। কিন্তু তার আগে অবশ্যই ক্রেনজিং, টোনিং, ময়েশ্চারাইজিং রুটিন ফলো করুন। ক্রেনজার ব্যবহার করার আগে হাত খুব ভাল করে ধুয়ে নিন যাতে হাতের ব্যাকটেরিয়া মুখ অবধি না পৌঁছায়। সবসময় সার্কুলার মুভমেন্ট এবং আপওয়ার্ড স্ট্রোকে মাসাজ করুন। এতে ত্বক ঝুলে যাবে না। ক্রেনজার ব্যবহার করার পর সঙ্গে সঙ্গে মুছে ফেলবেন না; কয়েক মিনিট রেখে তারপর ধুয়ে ফেলুন। তুলোর প্যাডে টোনার লাগিয়ে

হালকা হাতে পুরো মুখটা মুছে নিন। তারপর ময়েশ্চারাইজার লাগান। রোদে বেরুবার আগে অবশ্যই লাগান সঠিক এসপিএফ যুক্ত সানস্ক্রিন। যতক্ষণ বাইরে থাকবেন, কয়েক ঘণ্টা অন্তর অন্তর অবশ্যই সানস্ক্রিন লাগাবেন। সপ্তাহে দু'বার ক্রেনজারের বদলে ব্যবহার করুন ডিপ এক্সফোলিয়েটিং স্ক্রিম। এতে ত্বকের উপর জমে থাকা ময়লার স্তর ও মরা কোষ পরিষ্কার হয়ে যাবে। ত্বক হয়ে উঠবে আরও উজ্জ্বল। দুপুরবেলা অফিসে বা বাড়িতে যখনই মনে হবে ত্বক অতিরিক্ত শুষ্ক বা তৈলাক্ত লাগছে, তখনই ভাল করে মুখ, গলা পরিষ্কার করে হালকা ময়েশ্চারাইজার সার্কুলার স্ট্রোকে মাসাজ করে নিন। যাদের ত্বক অতিরিক্ত তৈলাক্ত তাঁরা হাতের কাছে শুকনো টিস্যু পেপার রাখুন যাতে মাঝে মাঝেই মুখের বার্ডাতি তেল মুছে নিতে পারেন। অফিস কিংবা বাইরে থেকে বাড়ি ফিরে আসার পর স্বাভাবিকভাবেই ক্লান্তি বোধ হয়। একইভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়ে আপনার ত্বকও। মধু, দই আর কুরানো আলু মিশিয়ে ঘরোয়া মাস্ক তৈরি করে মুখে লাগিয়ে রাখতে পারেন ১০ মিনিট। চোখের উপর লাগিয়ে রাখতে পারেন গোলাপজলে ভেজানো তুলোর প্যাড। কিছুক্ষণ এভাবে থাকার পর লক্ষ্য করবেন, ক্লান্তি অনেকটাই দূর হয়েছে। কিছুটা সময় কুসুম গরম পানিতে কয়েক ফেঁটা শ্যাম্পু ফেলে পা ডুবিয়ে বসে থাকতে পারেন। এই ফাঁকে ব্রাশ দিয়ে ঘষে নিন পা দুটো। মেখে নিন ফুট ক্রিম। পা পরিষ্কার হওয়ার পাশাপাশি পায়ের ত্বকের মসৃণতা বজায় থাকবে। এবার রাতে শুতে যাওয়ার আগে কী কী করা উচিত তা জানাচ্ছি। বিছানায় যাওয়ার আগে আরও একবার ক্রেনজিং, টোনিং, ময়েশ্চারাইজিং রুটিন ফলো করুন। তার আগে মুখে কোনো মেক-আপ লেগে থাকলে সেটা অবশ্যই পরিষ্কার করে নিন। রাতে অ্যান্টি অক্সিডেন্টসহ ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করতে পারেন। হাতে ও পায়েও মেখে নিন হাইড্রেটিং লোশন, সকালে উঠে তাহলে ত্বক শুষ্ক লাগবে না। চোখের চারপাশে লাগিয়ে নিন হালকা আই ক্রিম। মেক-আপের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা মাথায় রাখতে হবে। মেক-আপ পরীক্ষা করার জন্য বার বার মুখে হাত দেবেন না। এতে জীবাণু অজান্তে মুখে চলে যায়। এ ছাড়া হাতে জমে থাকা ময়লা মুখের রোমকূপ বন্ধ করে দিতে পারে। কসমেটিক্স ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরিচিত ব্র্যান্ডই ব্যবহার করুন। বেশি দিন এক

কসমেটিক্স ব্যবহার করা উচিত নয়। কসমেটিক্স পুরনো হলেই বদলান। মেক-আপ ব্রাশও কিছুদিন পর পর বদলাবেন। প্রতিবার মেক-আপ ব্রাশ ব্যবহার করার পর অবশ্যই বেড়ে পরিষ্কার করে রাখুন। এবারের মত এখানেই শেষ করছি। সবার জন্য রইল আবারও শুভেচ্ছা।

রান্নাঘর

ভাপা ইলিশ

উপকরণ: ইলিশ মাছ-৪ টুকরো; সাদা সরষে-দেড় টেবিল চামচ; কালো সরষে-আধ টেবিল চামচ; দই-১ চা-চামচ; কাঁচা মরিচ-৪টা; সরষের তেল-২ টেবিল চামচ; হলুদগুঁড়ো-সিকি চা-চামচ; লবণ-স্বাদ মত।
প্রণালী: ইলিশ মাছে লবণ ও হলুদগুঁড়ো আধ ঘন্টা রাখুন। সাদা সরষে, কালো সরষে, কাঁচা মরিচ, হলুদগুঁড়ো ও লবণ দিয়ে একটি মিশ্রণ তৈরি করুন। এই মিশ্রণে দই এবং লবণ দিয়ে ভাল করে মাছের গায়ে মাখিয়ে নিন। মাছগুলোর উপরে সাবধানে সিলভার ফয়েল জড়িয়ে দিন। চ্যাপ্টা তলাযুক্ত পাত্রে মাছগুলো রেখে ১০-১৫ মিনিট স্টিম করুন। নামিয়ে গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

ইলিশ বিরিয়ানি

উপকরণ: বাসমতি চাল-৫০০ গ্রাম; ইলিশ মাছ-৭-৮ পিস; সরষের তেল-৪ টেবিল চামচ; পেঁয়াজ-৩টা (কুচানো); রসুনবাটা-১ টেবিল চামচ; আদাবাটা-১ টেবিল চামচ; কাঁচা মরিচ-৫-৬টা (ফালি করা); সরষেবাটা-১ টেবিল চামচ; শুকনো মরিচগুঁড়ো-১ টেবিল চামচ; হলুদগুঁড়ো-১ টেবিল চামচ; তেজপাতা-৩ টা; খোয়া ক্ষীর-৫০ গ্রাম; লবণ-স্বাদমত।

প্রণালী: বাসমতি চাল পানি দিয়ে আধ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখুন। ইলিশ মাছ মাখাসুদ্ধ লবণ ও হলুদ মাখিয়ে রাখুন। কড়াইতে সরষের তেল গরম করে পেঁয়াজকুচি ভাজুন। ভাজা পেঁয়াজ এবং তেল আলাদা সরিয়ে রাখুন। অন্য তেলে মাখাসহ ইলিশ মাছ হালকা ভেজে তুলুন। ইলিশ মাছ ভাজা হলে তার ভাগের তিন ভাগের সঙ্গে সরিয়ে রাখা তেল খানিকটা মিশিয়ে তার মধ্যে রসুন বাটা, কাঁচামরিচবাটা,

সরষেবাটা, হলুদগুঁড়ো, শুকনোমরিচগুঁড়ো দিয়ে ফুটতে দিন। এই মিশ্রণে মাছের মাথা ও ১ লিটার পানি দিয়ে কম আঁচে ফোটান যতক্ষণ না পানি তিনভাগের এক ভাগে এসে দাঁড়ায়। এবার ডেকচিতে পানি ফুটিয়ে তাতে তেজপাতা, লবণ এবং ভেজানো চাল ফোটান যতক্ষণ না প্রায় চার ভাগের তিনভাগ সিদ্ধ হয়। তামার তলাযুক্ত ডেকচিতে সিদ্ধ চালের অর্ধেকের সঙ্গে মাছের মাথা ফোটানো পানি, মাছ, সরষের তেলের অর্ধেক, ভাজা পেঁয়াজ, খোয়া ক্ষীর দিন। এর উপর বাকি সিদ্ধ চাল দিয়ে ঢেকে দিন। তার উপর বাকি উপকরণগুলো দিয়ে দিন। ডেকচির উপর ঢাকনা দিয়ে ধারগুলো আটামাখা দিয়ে সিল করে দিন। ওভেনের তাপমাত্রা ১৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে রেখে আধঘন্টা রান্না হতে দিন। নামিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

প্রন টোস্ট

উপকরণ: প্রন-১০০ গ্রাম (ছোট, খোসা ছাড়াবেন না); পাউরুটি-২ স্লাইস (৪ টুকরো করে রাখুন); ডিম-১টা; রসুন-৩ কোয়া (খেঁতো করলে ১ চা-চামচ হবে); কাঁচা মরিচ-১টা (কুচানো); ধনেপাতা-১ টেবিল চামচ (কুচানো); পেঁয়াজ-১টা (কুচানো); লবণ ও চিনি-স্বাদমত; তেল-৪ টেবিল চামচ।

প্রণালী: প্রন ছোট ছোট টুকরো করে রাখুন। ডিম, রসুনবাটা, ধনেপাতা, কাঁচামরিচ, পেঁয়াজ, লবণ ও চিনি মিশিয়ে তার মধ্যে প্রন ভরে দিয়ে ভাল করে নেড়েচেড়ে নিন। রুটির উপরের অংশে এই মিশ্রণ চামচ দিয়ে ছড়িয়ে দিন। এবার ননস্টিক ফ্রাইং প্যানের অর্ধেক তেল গরম করুন। আঁচ কমিয়ে রুটির টুকরোগুলো তেলের ওপর দিন। প্রনের মিশ্রণের অংশ ওপর দিকে থাকবে। রুটিগুলো ভাজা হয়ে বাদামি রং ধরলে আন্তে-আন্তে উল্টে দিন। খেয়াল রাখবেন তলায় যেন না লেগে যায়। দুর্গিষ্ট ভাজা হলে নামিয়ে নিন। এই প্রন টোস্ট বিকেলে চা বা কফির সঙ্গে পরিবেশন করতে পারেন।

আপনার

চিঠির জবাব



● আমার প্রেমের বিয়ে। ঘনিষ্ঠ বান্ধবীর দূর

সম্পর্কের এক ভাইয়ের সঙ্গে প্রায় তিন বছর আগে বিয়ে হয়। স্বামী ব্যবসায়ী। ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের সুবাদে তাকে প্রায়ই দেশের বাইরে যেতে হত। কখনও কখনও দেড়-দু'মাসও দেশের বাইরে থাকতে হত তাকে। তার অনুপস্থিতিতে নেহায়েতই সময় কাটানোর জন্য ফেসবুকে বন্ধুত্ব হয় একজনের সঙ্গে। বয়সে সে আমার চেয়ে এক বছরের বড়। সেই বন্ধুত্ব ফেসবুকের গাণ্ডি পেরিয়ে ব্যক্তিগত যোগাযোগের পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে। একাধিকবার আমরা দেখা-সাক্ষাৎ করেছি। সে সম্পর্কে অন্য দিকে নিয়ে যেতে চাইছে। কিন্তু একজন বিবাহিত মেয়ে হয়ে তাতে আমি সায় দিতে পারি না। কিন্তু সে বন্ধুত্বটাকে আরও অনেক দূর নিয়ে যেতে চায় যা অনৈতিকও বটে। আমি চাই সুন্দর একটা সম্পর্ক থাকুক, কিন্তু তাতে কোনো অনৈতিকতা থাকবে না।

বর্ষা

কমলাপুর, ঢাকা।

●● বোন বর্ষা, তিন বছর হয়ে গেছে তোমার বিবাহিত জীবন। এখন কারও সঙ্গে ফেসবুকে সম্পর্ক গড়ে তোলাটা খুব একটা যে শোভন নয় তা বারার অপেক্ষা রাখে না। তুমি এই বিপজ্জনক সম্পর্কটা চুকিয়ে দাও। কারণ পুরুষ-মহিলার মাঝে সম্পর্ক কখনওই কোনো সীমারেখা দিয়ে আটকে রাখা যায় না। এমন তো নয় যে, তোমার স্বামীর কোনো চারিত্রিক দোষ আছে! তাই ঘরে একজন বিখন্ত পুরুষ থাকা সত্ত্বেও অন্য পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা কোনো রুচিশীল মেয়ের জন্য শোভা পায় না। বর্ষা, তুমি এই বিপজ্জনক খেলা থেকে নিজেকে সরিয়ে নাও। নইলে তুমি না চাইলেও অন্য প্রান্ত থেকে কোনো অনৈতিক প্রস্তাব তোমার চরিত্রে কালিমালেপন করতে পারে। আশা করি তোমার শুভ বুদ্ধির উদয় হবে।

● চাচাতো ভাইয়ের বিয়েতে পরিচয় হয় তার সঙ্গে। এরপর ফেসবুকের মাধ্যমে সম্পর্কটা আরও গভীর হয়। গত বছরের জানুয়ারি মাসে পারিবারিক সম্মতিতেই বিয়ে হয় আমাদের। বিয়ের প্রথম ৫-৬ মাস খুব সুখেই দিন কেটেছিল আমাদের; কিন্তু বিপত্তি ঘটল গত বছরের মাঝামাঝি থেকে। অস্ট্রেলিয়ার ইমিগ্রেশনের জন্য সে আগে থেকেই প্রচেষ্টা

চালাচ্ছিল। হট করে ওই সময় তার ইমিগ্রেশনটা হয়ে গেল। সে বলল, আগে ওখানে গিয়ে সবকিছু ঠিকঠাক করে তারপর আমাকে নেওয়ার ব্যাপারে ব্যবস্থা নেবে। এর ক'দিন পর সে অস্ট্রেলিয়ায় চলে গেল। সেখানে একটা সফটওয়্যার কোম্পানিতে চাকরি পেল। প্রথম তিন মাস আমাদের মধ্যে প্রায় প্রতিদিনই যোগাযোগ হত। প্রতিবারই সে বলত, কয়েক মাসের মধ্যেই আমাকে ওই দেশে নেওয়ার ব্যবস্থা চূড়ান্ত করে ফেলবে। আমি যেন কোনোরকম দৃষ্টিভ্রান্ত না করি। কিন্তু অল্পদিন পরে দৃষ্টিভ্রান্ত সূত্রপাত হলো। আগে যেখানে সে সপ্তাহে ৪-৫ দিন ফোন করত, হঠাৎ করেই তার ফোন করা কমে গেল। জিজ্ঞেস করলে বলত, কাজের চাপে ফোন করা সম্ভব হয় না। গত বছরের নভেম্বর মাসের দিকে হঠাৎ ফোন আসা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। আমি তার নম্বরে ফোন করলে সবসময় ফোন বন্ধ পেতাম। শ্বশুরবাড়ির কাউকে জিজ্ঞেস করে কোনো সদুত্তর পেতাম না; মনে হত তারা যেন কিছু একটা লুকাচ্ছে। এরপর আমি অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী আমার মামাতো ভাইকে তার কোম্পানির ঠিকানা দিয়ে যোগাযোগ করতে বললাম। সে দু'দিন পর যে তথ্য আমাকে দিল তা শুনে আমার পায়ের নীচ থেকে মাটি সরে গেল যেন। সে নাকি ওখানকার প্রবাসী এক মেয়ের প্রেমে পড়েছে। মেয়েটি কয়েকটা বড় ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের মালিক। ওখানে তার দু'টো বাড়ি। আগে একবার বিয়ে হয়েছিল; বিয়েটা ভেঙে যায়। শেষ পর্যন্ত আমার স্বামীর কাঁধের উপর ভর করেছে! মামাতো ভাইয়ের কাছ থেকে তার নতুন মোবাইল নম্বরও পেলাম। আমি অন্য একটা ফোন থেকে তাকে ফোন করলাম। আমার ফোন পেয়ে সে কী বলবে, মনে হয় ভেবে পাচ্ছিল না। আমি তাকে বললাম, তার সাম্প্রতিক সময়ের কীর্তিকলাপ আমি সবই জেনেছি। এখন সিদ্ধান্তটা কী সেটাই জানার বিষয়। হয় আমি তার জীবনে থাকব, নয়তো সেই মহিলা। সে বলল, তাকে দু'দিন সময় দেওয়ার জন্য। দু'দিন পর সে-ই ফোন করল আমাকে। ইনিয়ে-বিনিয়ে যা বলল তার সার-সংক্ষেপ হলো ওই মেয়েকে ত্যাগ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়, আমি যেন তাকে মাফ করে দিই। বিষয়টি পারিবারিকভাবে সবার সঙ্গে

আলোচনা করেছি। সবাই বলছে ডিভোর্স দিয়ে দেওয়ার জন্য। আমি এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছি। আপা, আপনার সৃষ্টিভিত্তি মতামত জানতে চাই।

সাবরিনা এনাম

পশ্চিম রাজাবাজার, ঢাকা।

●● বোন সাবরিনা, আপনার দীর্ঘদিনের প্রেম ও বিয়ের পর সম্পর্কের এ ধরনের পরিণতি মেনে নেওয়াটা আসলেই খুব কষ্টের। তবে এটাও ঠিক যে, কোনো সম্পর্কই জোর করে টিকিয়ে রাখা যায় না। যে সম্পর্কে ভাঙন অবশ্যম্ভাবী তা টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়—কিন্তু এসব ক্ষেত্রে মন যুক্তি মানতে চায় না। তাই আমি বলি, তার সঙ্গে আরেকবার ফোনালাপ করেই সিদ্ধান্ত নিন। যদি ইতিবাচক সাড়া না পাওয়া যায় তখন ডিভোর্সের পথে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না। দেখাই যাক না কী হয়। আমি আপনার সার্বিক মঙ্গল কামনা করছি।

● পারিবারিক পছন্দে বেশ অল্প বয়সেই বিয়ে হয়েছিল আমার। আমার স্বামীর বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা ছিল। আমরা বেশ সুখেই দিন কাটাচ্ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ করে ঘটন অঘটন। এক মিথ্যে মামলার আসামী হতে হলো তাকে। এরপর কিছুদিন পর মামলাটা নিষ্পত্তি হয়ে যায়। সেই অপমানের ধাক্কাটা সামলে ওঠার আগেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায় সে—ঘটনাটা দু'বছর আগের। বর্তমানে স্বামীর ব্যবসা আমি দেখাশোনা করি। আমার মেয়ের বয়স ১৭ ও ছেলের ১৫। একজন 'এ' লেভেল, অন্যজন 'ও' লেভেলে পড়ছে। মূল কথায় আসি। কয়েক মাস হলো মা এবং অন্যান্য ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজনরা আবার বিয়ে করার কথা বলছে। এ ব্যাপারে আমার মতামত হলো, যদি আরেকবার বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হই তা হলে তা আমার ছেলে-মেয়ের মনে বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। বর্তমানে আমার ৩৬ বছর চলাছে।

রুমানা ইসলাম

জুরাইন, ঢাকা।

●● রুমানা, আপনি ছেলে-মেয়ের কথা ভেবে দ্বিতীয় বিয়ের ব্যাপারে এগোচ্ছেন না—এটা স্বাভাবিক; কারণ দ্বিতীয় বিয়ের ক্ষেত্রে আগের ঘরের ছেলে-মেয়ে—স্বামী-স্ত্রী যার দিক থেকেই হোক না কেন—একটা ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়ায়। আর তাই এ ধরনের বিয়ের ক্ষেত্রে সন্তান-সন্ততির দায়িত্ব গ্রহণের বিষয়টি আগে থেকেই খোলাসা করে নেওয়া উচিত। বোন, দ্বিতীয় বিয়ের ব্যাপারে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে বলতে হয়, জীবনের অনেকটা সময় এখনও পড়ে আছে। কারও কারও এরকম বয়সেই দাম্পত্য জীবনের সূচনা হয়ে থাকে। এ ছাড়া ছেলে-মেয়েরা আরও বড় হয়ে যখন নিজেদের সংসার রচনা করবে সে সময় নিজেদের বড় অসহায় মনে হতে পারে। আর সে জন্যই সময় থাকতে কাউকে সঙ্গী হিসেবে বেছে নেওয়া দোষের কিছু নয়। যদি এ ব্যাপারে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেন, সেক্ষেত্রে ছেলে-মেয়েদের বিষয়টি অন্য পক্ষের কাছে খোলাসা করে নিতে হবে। এমন কাউকে বেছে নিন যিনি আপনার সন্তানদের দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে আন্তরিক। আপনার ভবিষ্যতের দিনগুলো সুখের হোক—এ কামনাই করি।

যা কিছু সংগীত তাই নিয়ে সরগম

দেশের সংগীত বিষয়ক একমাত্র নিয়মিত পত্রিকা



সংগীত সম্পর্কে জানতে
সংগীত শিখতে নিজে পড়ুন
অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করুন

৩৪৫, সেতুন বাগিচা (৪র্থ তলা), ঢাকা-১০০০

ফোন : ৮৩২২৭০৬, ৮৩২২১৬৭

ই-মেইল : sargam93@yahoo.com

visionad@agni.com

পাতকিনী

মূল ■ শেট উইলিয়ামসন

রূপান্তর ■ তারক রায়

‘আমি
চাই
তুমি
আমার
বাড়িতে
টুকবে।
আমার
দামি
অলংকারগুলো
চুরি
করে
আনবে।’



‘তোমাকে খুঁজে পেতে আমার অনেক কষ্ট হয়েছে,’ মেয়েটা বলল, গ্লাস থেকে চলকে পড়া বিয়ারে ভেজা টেবিলের ওপাশ থেকে তাকিয়ে আছে। ওকে দেখে মনে হয় ঝগড়াটে স্বভাবের, টেবিলের এ প্রান্তে বসা লোকটা বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিয়ে ভাবল। মেয়েটার বয়স কম, কিন্তু ততটা কম না যতটা মেকাপ করেছে।

‘তুমি নিশ্চিত, আমাকেই খুঁজছ?’

‘তোমার নাম যদি জো হয়, তা হলে তোমাকেই খুঁজছি।’

লোকটা মাথা ঝাঁকাল। ‘হ্যাঁ, আমিই জো।’

‘আমার...একটা কাজ করে দেবে?’

‘কাজ?’

‘হ্যাঁ, একটা কাজ করতে হবে।’

‘আমার ব্যাপারে তোমাকে কে বলেছে?’

‘পরিচিত একজন। তার একটা ফারের গোড়াউন আছে।’

‘ইহঁ।’ অব্রাহাম, ভাবল জো। ছয় মাস আগে দালানটায় আগুন লাগিয়েছিল ও।

‘আসলে ও-ও দেয়নি। ওর বউয়ের কাছ থেকে তোমার ঠিকানা পেয়েছি।’

‘কী কাজ করতে হবে?’
 মেয়েটা চারপাশে নার্ভাস দৃষ্টিতে তাকাল।
 ‘এখানেই বলব?’
 ‘এখানে কোনও পুলিশ দেখেছ?’
 মেয়েটা উত্তর দেবার আগে বুঝতে পারল, জো ওর সঙ্গে মজা করেছে।
 ‘এত নার্ভাস হযো না,’ জো হেসে বলল।
 ‘তুমি, উহ...’ জো সামনে ঝুঁকে এল। ‘কাউকে মারতে হবে?’
 ‘না!’ মেয়েটার চোখ বড় বড় হয়ে গেল। ‘ওই রকম কিছু না।’
 ‘তা হলে কী?’
 ‘চুরি করতে হবে।’ মেয়েটা ফিসফিসিয়ে বলল। মনে হলো কথাগুলো ওর গলায় আটকে যেতে চাইছে। জো অর্ধেক খালি বিয়ারের গ্লাসের দিকে তাকিয়ে আছে। একটুপর মেয়েটার দিকে তাকাল। কিন্তু মেয়েটা মাথা ঝুকিয়ে বলল, ‘আমি চাই তুমি আমার বাড়িতে ঢুকবে। আমার দামি অলংকারগুলো চুরি করে আনবে।’
 ‘তোমার অলংকার চুরি করব! নিশ্চয়ই ওগুলো বীমা করা আছে?’
 ‘হ্যাঁ, আমার টাকার দরকার।’
 ‘ওগুলো পরে তোমাকে ফেরত দিয়ে দেব?’
 ‘অবশ্যই।’
 ‘আর তুমি আমাকে টাকা দেবে?’
 ‘হ্যাঁ।’
 ‘একাজের জন্য আমাকে এক হাজার ডলার দিতে হবে।’
 ‘এত...আমি যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে বেশি হচ্ছে।’
 ‘আমাকে ঝুঁকি নিতে হবে। বুঝতেই পারছ।’
 ‘তাই বলে এক হাজার!’
 ‘আরও বেশি চাইতে পারতাম। কিন্তু এই মুহূর্তে কাজ নেই তাই কম চাইলাম।’
 ‘টাকাটা তুমি কাশ নেবে?’
 জো হাসল। ‘অবশ্যই।’
 ‘ওহ্!’ মেয়েটা লাজুকভাবে হাসল, যেন নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে।
 ‘কাশই তো নেবে।’
 ‘তোমার ঠিকানা বলা,’ জো বলল।
 ‘ম্যারিয়ন কোর্ট। ১৬৩৬, ম্যারিয়ন কোর্ট।’
 ঠিকানাটা শুনে জো বিস্ময় খেল। ম্যারিয়ন কোর্ট হচ্ছে শহরের বাইরে এক উপশহর, যেখানে

ওধুমাত্র ধনী লোকদের বসবাস। ওখানকার সবগুলো বাড়িই প্রায় প্রাসাদের সমান। ‘তোমার সাথে আর কে কে ওখানে থাকে?’
 ‘ওধুমাত্র আমার স্বামী।’
 ‘এ ব্যাপারে ও কি জানে?’
 ‘ও...নাহ্। আমি চাই না এ ব্যাপারে ও জানুক।’
 ‘অলংকারগুলো চুরি হলে জানতে পারবে।’
 ‘আমি বলতে চাই, তোমার সাথে আমার মিটিং-এর কথা জানবে না।’
 ‘কেন?’
 ‘টাকাটা আমার এমন একটা ব্যাপারে দরকার, আমি চাই না সেটা সম্পর্কে ও জানুক।’
 ‘বুঝতে পেরেছি।’
 ‘আর কিছু বলার নেই আমার।’
 জো গ্লাসে আরও বিয়ার নিয়ে গভীর চুমুক দিল। ‘অলংকারগুলো আমি চুরি করার পর, কীভাবে ভাবলে পরে তোমাকে ফেরত দেব?’
 ‘তোমার ওপর আমার বিশ্বাস আছে।’
 ‘আমি একজন চোর।’
 ‘তুমি যদি ওগুলো মেরে দাও,’ মেয়েটা জুঁকুচে বলল, ‘তা হলে আমি তোমার সম্পর্কে পুলিশকে বলে দেব।’
 ‘তা হলে আমিও বলব, তুমি আমাকে ভাড়া করেছ।’
 ‘তুমি প্রমাণ করতে পারবে না।’
 ‘তা হলে আমি ওগুলো নিয়েছি জানবে কীভাবে?’
 মেয়েটার চেহারা কালো হয়ে গেল। ওকে দেখে মনে হচ্ছে, সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না, এখন চলে যাবে কিনা।
 ‘চিন্তা কোরো না,’ জো বলল। ‘ওগুলো তুমি ফেরত পাবে। কাস্টমারদের সাথে দুই নাখারি করি না আমি। এতে আমার ব্যবসার সুনাম নষ্ট হবে। একটা কথা জেনে রাখো, তুমি যদি কোনও সমস্যার সৃষ্টি কর; তা হলে ওগুলোর সাথে তোমাকেও উঠিয়ে আনব। বুঝতে পেরেছ?’
 ‘আমি সমস্যা করব না।’
 ‘ভাল। কাজটা কবে করবে?’
 ‘কাল রাতে করতে পারবে?’
 ‘খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?’ মেয়েটা কোনও জবাব দিল না। ‘ঠিক আছে। কখন?’ যোগ

করল জো।

‘রাত দুটোয়? তুমি রান্নাঘরের দরজা দিয়ে ঢুকবে।’ আর চলে যাওয়ার সময় রান্নাঘরের দরজার কাঁচ ভেঙে রেখে যাবে।’

‘কেন?’

মেয়েটা এমনভাবে তাকাল যেন নিজের প্ল্যান নিয়ে যথেষ্ট গর্ব ওর। ‘যাতে কেউ বুঝতে না পারে আগে থেকে গুটা খোলা ছিল।’

‘চমৎকার! তোমার স্বামী কি কাঁচ ভাঙার শব্দ শুনবে না?’

‘ও ঘুমালে আর সহজে জাগে না। তা ছাড়া আমাদের বেডরুমটা দোতলায়, বাড়ির অপর প্রান্তে।’

‘ওর কি পিস্তল আছে?’

‘পিস্তল? হ্যাঁ। কেন?’

‘ওর জেগে যাবার একটা সম্ভাবনা আছে। তা হলে আমার পিস্তল নিতে হবে।’

‘না! ওটার প্রয়োজন হবে না। ও তোমার আসার শব্দ শুনবে না। আর যদি জেগেও যায়, আমি ওকে বেডরুমে আটকে রাখব।’

‘আমি দুঃখিত, কিন্তু...’

‘প্লিজ, তোমাকে প্রমিজ করছি। তোমার পিস্তল আনতে হবে না। আমি... আমি ওরটার গুলি খুলে লকিয়ে রাখব।’

‘পিস্তল আনলেই যে ওটা আমি ব্যবহার করব এমনটা তো নয়।’

‘আমি...’

‘নিজের নিরাপত্তার জন্য, আর কিছুই না।’

মেয়েটা কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে বসে চিন্তা করল। ‘ঠিক আছে। কিন্তু কোনও গুলি করবে না।’

‘না, গুলি করব না। তোমার কোনও পোষা কুকুর আছে?’

‘না। পরে তোমার সাথে যোগাযোগ করব কীভাবে?’

টেবিলে দেয়া টিস্যুর ওপরে একটা নাম্বার লিখে মেয়েটাকে দিল জো। ‘এই নাম্বারে ফোন করবে। আমি যদি না ধরি, তা হলে যে ধরবে সে তোমাকে বলে দেবে কীভাবে আমার সাথে যোগাযোগ করতে হবে। নাম্বারটা মুখস্থ করে টিস্যুটা ছিড়ে ফেলো।’

মেয়েটা মাথা ঝাঁকিয়ে টিস্যুটা পার্সের ভিতরে

রাখল। ‘১৬৩৬, ম্যারিয়ন কোর্ট। রাত দুটোয়। ভুলে যাবে না তো?’

‘ভুলব না।’

পরদিন রাত।

১৬৩৬ ম্যারিয়ন কোর্ট।

বাড়িটা থেকে প্রায় চার ব্লক দূরে কালচে নীল একটা মার্সিডিজ সেডান পার্ক করল জো। বাড়িটার দিকে হেঁটে এগোল। রকের প্রতিটা বাড়ির মাঝখানের দূরত্ব প্রায় পঞ্চাশ গজ দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। ড্রাইভওয়ে পেরিয়ে রান্নাঘরের দরজা পর্যন্ত আসার পথে কোনও কুকুর চিৎকার করে উঠল না শুনেও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। হাতে গ্রান্ডস পরে দরজার নব মোচড়াল। ওটা খোলা, মেয়েটা যেমন বলেছিল। দরজাটা ধীরে-ধীরে নীরবে খুলে গেল। জো কান পেতে রইল। কিন্তু বাড়িটার ভিতরে কবরের নীরবতা বিরাজ করছে। পিছনে দরজা বন্ধ করে পকেট থেকে পেন লাইট বের করে জ্বালল। রান্নাঘরের চারপাশে আলো ফেলল। কিছুক্ষণ পরে ডেন-এ যাবার দরজাটা দেখতে পেল। দরজা খুলে দেখল, টেবিলের ওপর বাদামী চামড়ার একটা বাস্ক পড়ে আছে। বাস্কের ঢাকনা খুলে হাসল। পেন লাইটের আলোতে ভিতরের অলংকারগুলো ঝলমল করে উঠেছে। ব্যাপারটা খুবই উদ্ভেজনাকর, কিন্তু এতে ও কখনও প্ররুদ্ধ হয়নি। যে কারও জন্য অবশ্য নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন।

এসব চিন্তায় জো বিভোর ছিল, হঠাৎ একটা শব্দ শুনে সতর্ক হয়ে উঠল। মৃদু একটা শব্দ। কেউ যেন ফ্লোর বোর্ডের উপর হাঁটছে। সঙ্গে সঙ্গে পেন লাইট নিভিয়ে পকেট থেকে .৩৮ স্পেশাল বের করল।

‘হ্যালো?’ কাছাকাছি থেকে ফিসফিসিয়ে কেউ বলল। ‘জো, তুমি এসেছ?’

জো পাশ ফিরে পেন লাইট জ্বালল। দরজার কাছে খালি হাতে মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে। পরনে লাল রঙের রোব। চোখে আলো পড়াতে চোখ মিটমিট করল।

‘জেসাস,’ জো বলল। ‘এখানে কী করছ?’

‘আমার ভয় লাগছে। ঘুমাতে পারছি না। তাই তুমি ঠিক মত কাজ সারতে পেরেছ কী না দেখতে এলাম।’

‘কাজ হয়ে গেছে। ভেবেছিলাম, স্বামীর সাথে আছ।’

০১/০৬/১৪ তারিখে প্রকাশিত হচ্ছে
হরর কাহিনি
দুটি বই একত্রে

সেই ভয়ংকর রাত/অনীশ দাস অপু:
এ বইতে আপনি গা ছমছমে ভৌতিক
কিছু গল্পের সঙ্গে পাচ্ছেন সম্পূর্ণ একটি
পিশাচ-উপন্যাস। সেই সাথে চমকে ওঠার
মত দু'টি হরর সায়েন্স-ফিকশন এবং
একটি রোমাঞ্চ-গল্পও থাকছে। হরর-প্রিয়
পাঠকদের শিহরিত করে তোলার কোনও
অনুষঙ্গই বাদ পড়েনি বইটিতে।

জ্যাস্ত মমি/তারক রায়:

কল্পনা করুন, একগুচ্ছ ভয়ংকর গল্প
যেগুলো সদ্য খোঁড়া কবরের মতই
রহস্যময়। এত ভয়ানক যে মধ্যরাতে
বাতাসে ঝরে পড়া পাতার মত ছড়িয়ে
দেয় স্বপ্নকে। এতই আতংকের যে
রক্তকে বরফের মত জমিয়ে দেয়।
এতটাই রোমহর্ষক যে নিজেই ভয় পায়
স্বয়ং শয়তান। কল্পনা করুন। এবার
বইটি খুলে পড়তে বসুন দেখি!

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
mail: alochonabibhag@gmail.com

শো-রুম

৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০



'চিন্তা কোরো না, ঘুমিয়ে আছে ও।' মেয়েটা
বাক্সের দিকে ইঙ্গিত করল। 'ওগুলোই?'
'হ্যাঁ।'

'আরেকটা আছে যেটা আজ পরেছিলাম, কিন্তু
বাক্সে রাখতে ভুলে গেছি...' রোবের পকেটে হাত
ঢুকিয়ে ছোট একটা পিস্তল বের করল। দু'বার গুলি
করল। দুটো গুলিই জো-র বুকে ঢুকল। ওর শরীরটা
পিছনের বুক কেসে আছড়ে পড়ল। ওর দেহটা বুক
কেসে ঠেস দিয়ে পড়ল, দুই পা প্রসারিত। হাতে
এখনও .৩৮ স্পেশালটা ধরা। জো-র দেহের
দু'পাশে বৃষ্টির ফোঁটার মত তাক থেকে খসে পড়ল
বই।

মেয়েটি যত দ্রুত রোবের পকেট থেকে
পিস্তলটা বের করেছিল, তত দ্রুত নিজের পিস্তল
পকেটে পুরে দরজার কাছ থেকে আহত জো-র
সামনে এল। বুকো জো-র হাত থেকে .৩৮
স্পেশালটা নিতে চাইল। জো ওটা দিতে চাইল না।
কিন্তু শুধুমাত্র ওর আঙুল নড়ল, তাও ধীরে-ধীরে।

'কেন?' জো জিজ্ঞেস করল, মুখ দিয়ে রক্ত
বেরিয়ে এল।

'দেখলেই বুঝবে।' মেয়েটা দরজার কাছে
গিয়ে সুইচ টিপে রুমের বাতি জ্বালল। চিৎকার করে
ডাকল, 'টম!' নীরবতা। 'টম!' পিস্তল ধরা হাতে
রুমাল পেঁচাল।

বাড়ির ভিতর থেকে জড়ানো কণ্ঠে কে যেন
কথা বলল।

'জলদি এসো। আমি ডেনে আছি!'

'কী হয়েছে? রাত দুটো বাজে...'

'জলদি এখানে এসো! ঝামেলা হয়েছে...' জো
যেখানে দাঁড়িয়ে থেকে গুলি খেয়েছে, সেখানে
মেয়েটা এসে দাঁড়াল। জোকে বলল, 'এবার
দেখবে।'

কয়েক সেকেন্ড পর টম দরজার কাছে এসে
দাঁড়াল। মেয়েটা টমের কপালে .৩৮ স্পেশাল দিয়ে
গুলি করল। তারপর পকেট থেকে নিজের পিস্তলটা
বের করে মুছে টমের হাতে রেখে দিল।
'তোমারটা এক মিনিটের মধ্যেই ফেরত পাবে,'
জো-র উদ্দেশ্যে বলল। 'আরও কিছু কাজ বাকি
আছে।'

রান্না ঘরের ফোন থেকে পুলিশকে কল করতে
শুনল জো। ভাবল মেয়েটা কী শয়তান আর ভয়ঙ্কর!
শেষ শব্দ শুনল, রান্না ঘরের দরজার কাঁচ ভাঙার।
অবশ্যই বাইরে থেকে।

টিপিং পয়েন্ট

সামাজিক মহামারীর বিস্ফোরণ

আনোয়ার সাদাত শিমুল

সিফিলিস আক্রান্ত এবং শারীরিকভাবে সক্ষম কেউ যদি নিজের এলাকা ছেড়ে সিফিলিসমুক্ত অঞ্চলে যায়, তবে বিপুল সম্ভাবনা থাকে ওই এলাকায় সিফিলিস খুব দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়বে।

চার

১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের বাল্টিমোর শহরে সিফিলিস মহামারী আকার ধারণ করে। ১৯৯৫ থেকে ১৯৯৬, মাত্র ওই এক বছরের ব্যবধানে সিফিলিসে আক্রান্ত নবজাতকের সংখ্যা প্রায় ৫ গুণ বেড়ে গিয়েছিল। আপনি যদি বাল্টিমোরের সিফিলিস রোগীর সংখ্যাকে একটি গ্রাফে আঁকেন, তবে দেখবেন ১৯৯৫ সালে এসে এতদিন চলতে থাকা একটি সরল রেখা প্রায় নব্বই ডিগ্রি কোণ হয়ে উপরে উঠে গেছে।

কী কারণে বাল্টিমোরে সিফিলিস আক্রান্তের সংখ্যা এমন হুট করে বেড়ে গেল?

বাল্টিমোরের সরকারী রোগ নিয়ন্ত্রণ সংস্থা বলছিল, মাদক ব্যবসার প্রসারের কথা। মাদকের সাথে ঝুঁকিপূর্ণ যৌন আচরণ, এইডস, সিফিলিস হয় মূলত দরিদ্র ও অনুন্নত এলাকায়। অনেক দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ এসব এলাকায় মাদক নিতে এসে বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। তারা নিজেরা সিফিলিসে আক্রান্ত হয়। এরপর যখন তারা নিজেদের জীবানু নিয়ে ফেরে প্রিয়জন-পরিজনদের কাছে। তারাও আক্রান্ত হয়।

জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের জন জেনিলম্যান, যিনি একজন যৌনবাহিত রোগ বিশেষজ্ঞ, ব্যাপারটিকে ব্যাখ্যা করেন অন্যভাবে। সিফিলিসের এমন মহামারীর জন্য বাল্টিমোর শহরের দরিদ্রতম এলাকাগুলোয় স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থার অবনতিতে দায়ী করেন তিনি। জেনিলম্যান উল্লেখ করেন, ১৯৯০-৯১ সালে বাল্টিমোরে যৌনরোগের চিকিৎসা সেবা দানকারী ক্লিনিকগুলোয় বছরে প্রায় ৩৬ হাজার



ম্যালকম গ্যাডওয়েল

রোগী আসত। কিন্তু ১৯৯১ সালে ব্যায় সংকোচনের নামে এসব ক্লিনিকের সহকারী ডাক্তারের সংখ্যা ১৭ থেকে কমিয়ে ১০-এ আনা হয়। প্রধান ডাক্তার থাকত না বললেই চলে! পাশাপাশি মাঠকর্মীদের সংখ্যাও কমে গেল। আমলাতান্ত্রিক জটিলতা আর রাজনীতির বেড়াজালে অবস্থা এমন শোচনীয় হয়ে গেল যে ক্লিনিকে পর্যাপ্ত পরিমাণে ওষুধও ছিল না। ১৯৯২ সালে রোগীর সংখ্যা কমে দাঁড়াল ২১ হাজার।

জেনিলম্যান মনে করেন, যতদিন পর্যন্ত ক্লিনিকে রোগীর সংখ্যা ৩৬ হাজার ছিল, ততদিন বাল্টিমোরে সিফিলিস আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা একটা স্থিতিবস্থায় ছিল। কিন্তু যখন রোগী আসা কমে গেল, বিশেষ করে ১৯৯২

সালে যখন রোগীর সংখ্যা ২১ হাজার হয়ে গেল, অর্থাৎ একটা বিশাল সংখ্যার রোগী সিফিলিসের চিকিৎসা সেবা পেল না কিংবা নিল না, তখন সিফিলিস মহামারী আকার ধারণ করল। আক্রান্ত লোকজনের সংখ্যা শহরের মধ্যস্থল, সড়ক-মহাসড়ক ছাড়িয়ে অন্য এলাকায়ও বিস্তৃত হলো। মোট কথা, এ সময় সিফিলিস তার টিপিং পয়েন্ট অতিক্রম করে দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল।

আমরা এতক্ষণ জানলাম, বাস্টিমোর শহরে সিফিলিসের মহামারী নিয়ে যে দুটি ব্যাখ্যা তা। কিন্তু কোনোটিই তেমন নাটকীয় নয়, যেমনটা টিপিং পয়েন্ট ধারণার বিশ্লেষণে আমরা আগে দেখেছি। রোগ নিয়ন্ত্রণ সংস্থা দায়ী করেছে মাদক ব্যবসাকে। কিন্তু বাস্টিমোরে মাদক ব্যবসা তো ১৯৯৫ সালের আগেও ছিল। তা হলে প্রশ্ন জাগে, সে বছর কী এমন মাদক দ্রব্য এল যার প্রভাবে সিফিলিস মহামারী আকার নিল?

জেনিলাম্যান বলেছেন, ক্লিনিকের সুযোগ-সুবিধা কমানোর কারণে সিফিলিস মহামারী আকার ধারণ করেছে। এখানেও যে খুঁতটি থেকে যায়, তা হলো: সিফিলিসের চিকিৎসা সেবা তো পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়নি। তা হলে কেবল সহকারী ডাক্তারের সংখ্যা সতেরো থেকে কমিয়ে দশে আনা এবং ওষুধের অপ্রতুলতা কি সিফিলিসের এমন মহামারী সৃষ্টি করতে পারে?

বাস্টিমোরে সিফিলিস প্রকোপের তৃতীয় ব্যাখ্যাটি প্রকাশ করেন প্রসিদ্ধ মহামারী বিশেষজ্ঞ জন পোটারট। তিনি বলেন, বাস্টিমোর শহরের অবকাঠামোগত পরিবর্তনই সিফিলিস মহামারীর প্রধান কারণ। পোটারট জানান, পূর্ব ও পশ্চিম বাস্টিমোরের বেশিরভাগ মানুষ ছিল চরম হতাশাগ্রস্ত, আর এ দুটি এলাকাই ছিল সিফিলিসের কেন্দ্রবিন্দু। নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়ে সংস্কারের নামে পূর্ব ও পশ্চিম বাস্টিমোরের বেশি কিছু পুরনো বহুতল ভবন ভেঙে ফেলে তখনকার সরকার। এসব ভবনে মূলত দরিদ্র শ্রেণীর নাগরিক থাকত, যাদের বেশিরভাগ আবার সিফিলিসে আক্রান্ত। তারা যখন দেখল যে

তাদের দীর্ঘদিনের আবাসস্থল ভেঙে ফেলা হচ্ছে, তখন তারা শহরের অন্যদিকে যে যার সুযোগ-সুবিধামত ছড়িয়ে গেল। এভাবেই সিফিলিস ছড়িয়ে পড়ল সমগ্র বাস্টিমোর শহরে।

পোটারটের বিশ্লেষণটি অবশ্য কৌতূহল উদ্দীপক। মাদকাসক্ত, সিফিলিস আক্রান্ত এবং শারীরিকভাবে সক্ষম কেউ যদি নিজের এলাকা ছেড়ে সিফিলিসমুক্ত অঞ্চলে যায়, তবে বিপুল সম্ভাবনা থাকে ওই এলাকায় সিফিলিস খুব দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়বে।

বাস্টিমোরের সিফিলিস মহামারীর প্রচলিত কার্যকারণগুলোকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে জন পোটারটের ব্যাখ্যাকে যুক্তিযুক্ত মনে করেন ম্যালকম গ্র্যাডওয়েল। দ্য টিপিং পয়েন্ট বইতে তিনি লেখেন, সব মহামারী একটি নির্দিষ্ট ধাঁচে ঘটে না। মহামারীর কারণ বের করতে হলে দেখতে হবে মহামারীর সংক্রামক কী বহন করছে। সংক্রামকটি কেমন এবং সর্বোপরি কোন পরিবেশে মহামারী ঘটছে। ম্যালকম এ ক্ষেত্রে তিনটি নীতি নির্দিষ্ট করেন:

১। টিপিং পয়েন্ট শুরু হয় খুব অল্প কিছু মানুষের হাত ধরে।

২। টিপিং পয়েন্ট হতে হলে বিষয়টি মানুষের মাথায় গেঁথে যেতে হবে।

৩। কোন পরিবেশ পরিস্থিতিতে বিষয়টি ঘটছে তার ওপর টিপিং পয়েন্ট নির্ভর করে।

হাশ পাপিসের ক্ষেত্রে খবর এসেছিল কিছু কিশোর বয়েসী ছেলে হাশ পাপিস পরে ঘুরছে। এখানে লক্ষ্যণীয়-শুক্র সংখ্যাটা কিন্তু খুব অল্প কিছু। বাস্টিমোরে সিফিলিস ছড়িয়ে পড়েছিল পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের খুব অল্প কিছু মানুষের মাধ্যমেই।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য: অর্থনীতিবিদরা প্রায়ই ৮০/২০ নীতির (Eighty-twenty principle) কথা বলেন। এ নীতির সারকথা হলো: মোটামুটি ভাবে একটি অফিসের শতকরা ৮০ ভাগ কাজ মাত্র শতকরা ২০ ভাগ কর্মচারী সম্পাদন করে। আরও বলা যায়, সমাজে যত অপরাধ হয় তার ৮০ ভাগ সম্পাদিত হয় মোট অপরাধীর ২০ ভাগ কর্তৃক। কিংবা ২০% মোটরচালকই ৮০%

দুর্ঘটনা ঘটায় অথবা ২০% মানুষ দেশের ৮০% সম্পত্তির মালিকানা ভোগ করে।

মোদাকথা, একটি ছোট অংশের মানুষ বিশাল অবদানের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

মহামারীর প্রসঙ্গে এ সম্পৃক্ততা আরও প্রগাঢ় হয়ে ওঠে।

খুব ক্ষুদ্র একটি অংশ বিশাল ঘটনা ঘটিয়ে দেয়। আগেই যেমন বলা হয়েছে, খুব ছোট একটি ঘটনা অনেক বড় মাপের পরিবর্তন ঘটাতে পারে।

মহামারী বিশেষজ্ঞ জন পোটেরাট গনোরিয়া মহামারীর ওপর এক গবেষণায় দেখেন, কলোরাডো অঙ্গরাজ্যের হাসপাতালে হয় মাস সময়ে যত গনোরিয়া আক্রান্ত রোগী এসেছে, তাদের অর্ধেক সংখ্যক রোগী এসেছে চারটি নির্দিষ্ট এলাকা থেকে। আয়তনের দিক থেকে এ চারটি এলাকা কলোরাডোর মোট আয়তনের মাত্র ৬ শতাংশ। প্রায় লক্ষাধিক অধিবাসীর কলোরাডোতে যতজন গনোরিয়া আক্রান্ত রোগী আছে, তাদের সবাই একে অন্যকে সংক্রামিত করেনি। পোটেরাটের গবেষণা ফলাফলের গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক হলো: শুধু ১৬৮জন রোগীই কলোরাডোতে গনোরিয়া ছড়িয়েছে। অর্থাৎ সমগ্র রাজ্যে গনোরিয়া বিস্তারের মূলে রয়েছে ১৬৮জন মানুষ। আরও মজার ব্যাপার হলো, এই ১৬৮জন মানুষ ছয়টি নির্দিষ্ট মন্দের দোকানে নিত্য যাতায়াত করত।

প্রশ্ন হচ্ছে, কারা এই ১৬৮জন?

এরা আশপাশের আর আট-দশজন মানুষের মত নয়। এরা প্রায় প্রতি রাতেই বাইরে যায়। রীতি-প্রথার বাইরে এদের অনেক বেশি যৌন সঙ্গী ছিল। এদের জীবনধারা এবং সামগ্রিক আচরণ অন্য সবার চেয়ে ব্যতিক্রম।

এখানে উদাহরণ হিসেবে ড্যারনেল ম্যাকজির কথা স্মরণ করা যেতে পারে। বিশালদেহী ড্যারনেল ছিল ছয় ফুটেরও বেশি লম্বা। তার ব্যক্তিত্ব ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয়, চলনে-বলনে মেধার ছাপ ছিল এবং সে খুব সহজেই মেয়েদের বশ করতে পারত। তার বিশেষ আগ্রহ ছিল তেরো-চোদ্দ বছর বয়েসী মেয়েদের দিকে, যাদেরকে সে দামী অলঙ্কার

কিনে দিত। নামী গাড়িতে চড়াতে, নেশাপানে মাতাল করতে এবং যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতে। ১৯৯৫ থেকে ১৯৯৭ সালের মধ্যে ড্যারনেল কমপক্ষে ১০০ নারীর শয্যাসঙ্গী হয়েছিল। পরে প্রকাশ পায় এদের মধ্যে অন্তত ৩০জনের শরীরে সে এইডসের জীবাণু ছড়িয়েছিল। ড্যারনেলের মৃত্যু হয়েছিল অজ্ঞাত আততায়ীর গুলিতে, সেটা এখানে অবশ্য ভিন্ন প্রসঙ্গ।

একই সময়ে নিউ ইয়র্ক শহরে নুশ্যান উইলিয়ামস নামে ছিল একজন, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে যে অনেকটা ড্যারনেল ম্যাকজিরই প্রতিচ্ছবি। বিভিন্ন নাম নিয়ে শহরের তিন-চারটি অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করে সে কয়েক ডজন বান্ধবীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখত। উইলিয়ামের পরিণতি ছিল জেলজীবন। তার আগেই ধরা পড়ে, কমপক্ষে ষোলোজন বান্ধবীর শরীরে এইডসের জীবাণু ছড়িয়েছে সে।

তবে ড্যারনেল এবং উইলিয়ামকে ছাড়িয়ে গেছে গ্যেটান ডোগাস নামের এক ফ্রেঞ্চ-ক্যানাডিয়ান তরুণ, যিনি পেশায় প্লেনের ফ্লাইট অ্যাটেন্ড্যান্ট। তিনি স্বীকার করেন, উত্তর আমেরিকাতেই তার আড়াই হাজার যৌনসঙ্গী ছিল। ক্যালিফোর্নিয়া এবং নিউ ইয়র্কে প্রথম দিকে চিহ্নিত হওয়া অন্তত ৪০জন এইডস রোগীর সঙ্গে গ্যেটান ডোগাসের যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়।

ড্যারন্যাল, উইলিয়াম এবং গ্যেটানের মত লোকেরাই অসুখ-বিসুখের মাত্রাকে মহামারীর পর্যায়ে নিয়ে যায়।

সামাজিক মহামারীও ঠিক এভাবেই কাজ করে। হাতে গোনা কিছু ব্যতিক্রমী লোক মহামারীকে এক ধাক্কায় অন্য মাত্রায় নিয়ে যায়। এক্ষেত্রে যৌন কাতরতা নয়, বরং লোকগুলো কতটা সামাজিক, প্রাণচঞ্চল, জ্ঞানী এবং অন্যের ওপর কতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে-সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। হাশ পাপিস জুতা কীভাবে একটি ছোট্ট গ্রাম থেকে সারা দেশে জনপ্রিয় হয়ে উঠল, সে রহস্যের উত্তর পাওয়া যায় টিপিং পয়েন্টের প্রথম নীতিতে: টিপিং পয়েন্ট শুরু হয় খুব অল্প কিছু মানুষের হাত ধরে। খুব অল্প কিছু কিশোর ছেলে তাদের সামাজিক যোগাযোগ, ব্যক্তিত্ব, অন্যকে

প্রভাবিত করার ক্ষমতা দিয়ে হাশ পাপিসের জনপ্রিয়তার বিস্তারিত ঘটিয়েছিল। সামাজিক যোগাযোগ এবং প্রভাব বিস্তারে এ কিশোরদের সঙ্গে ডারন্যাল, উইলিয়াম এবং গ্যাটানের মিল পাওয়া যায়।

পাঁচ

টিপিং পয়েন্টের দ্বিতীয় নীতি: টিপিং পয়েন্ট হতে হলে বিষয়টি মানুষের মাথায় গেঁথে যেতে হবে। সামাজিক মহামারীর ক্ষেত্রে এ নীতির গুরুত্ব অপরিসীম। যারা বিজ্ঞাপন তৈরি করেন, কোনও পণ্য বা ধারণার প্রচার প্রসারে, তাঁরা প্রায়ই ভাবেন-বিজ্ঞাপনের কথাগুলোকে কীভাবে যথাসম্ভব সর্বোচ্চ মানুষের কাছে পৌঁছানো যায়। কীভাবে বক্তব্যটিকে আকর্ষণীয় করা যায়, যাতে করে কথাগুলো মানুষের এক কান দিয়ে ঢুকে অন্য কান দিয়ে বের হয়ে যাবে না। কোনও বিষয় মানুষের মাথায় গেঁথে যাওয়ার মানে হলো, বিষয়টি একটি প্রভাব তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। অর্থাৎ কথাগুলো মাথার ওপর দিয়ে বা বোধের বাইরে দিয়ে যায়নি, বরং মনে এবং মাথায় গেঁথে গেছে।

১৯৫৪ সালে আমেরিকার বাজারে প্রথম যখন উইনস্টন সিগারেট বিক্রি শুরু হলো, এর স্লোগান ছিল: “একটি সিগারেটের স্বাদ যেমন হওয়ার কথা, তেমনই স্বাদের উইনস্টন” (Winston tastes good like a cigarette should)। প্রথমত: এ ইংরেজি বাক্যে ব্যাকরণের ভুল ছিল। উইনস্টন যেহেতু একটি সিগারেটেরই ব্র্যান্ড এবং উইনস্টন নামটিকে সিগারেটের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে, সেহেতু এখানে like না লিখে as লেখাই ছিল সঠিক।

কিন্তু দেখা গেল, এই ভুল ইংরেজি এবং কিছুটা বিন্দুগুণে স্লোগানের জন্য বিজ্ঞাপনটি মানুষের চায়ের কাপে ঝড় তুলল। রেডিও

টেলিভিশনে একই স্লোগান নিয়ে করা সুরালো বিজ্ঞাপন তুমুল জনপ্রিয়তা পেল। উইনস্টন কয়েক মাসের মধ্যেই সিগারেটের বাজারে অনেক বাধা বাধা কোম্পানিকে হারিয়ে দ্বিতীয় স্থানে চলে এল। আর কয়েক বছরের মধ্যেই আমেরিকার সেরা সিগারেটের ব্র্যান্ডের মর্যাদা পেল উইনস্টন।

ভুল ব্যাকরণের উদ্ভট বিজ্ঞাপনী স্লোগানটিই উইনস্টন সিগারেটের সাফল্যের মূল কারণ। এতবছর পরেও বেশিরভাগ আমেরিকানকে স্লোগানটির প্রথম তিনটি শব্দ বলা হলে, তারা বাকি অংশ সঠিকভাবে বলতে পারে। এ স্লোগানের এমন কার্যকারিতার একটিই কারণ, তা হলো: এর মনোগ্রাহী শক্তি মানুষের মাথায় এবং মনে গেঁথে উইনস্টন ব্র্যান্ডকে টিপিং পয়েন্ট নামের সেই যাদুকরী বিন্দু অতিক্রম করিয়ে দিয়েছে। এভাবেই উইনস্টন ব্র্যান্ডের সিগারেটের প্যাকেট স্থান করে নিয়েছে আমেরিকায় অধিকাংশ ধূমপায়ীর প্যাকেটে।

টিপিং পয়েন্টের দ্বিতীয় নীতির মতে: কোনও বক্তব্যের কাঠামো এবং উপস্থাপনা চাইলেই এমন মনোগ্রাহী এবং আকর্ষণীয় করা যায়, যা মানুষের মনে সংক্রামক এবং স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এ প্রসঙ্গে পল রেভারির মধ্যরাতের ঘোড়াযাত্রা এবং সিসিম, স্ট্রিট অনুষ্ঠানের সাফল্যের কাহিনি জানব একটু পরে।

এবার নজর দিই টিপিং পয়েন্টের তৃতীয় নীতির দিকে-কোন পরিবেশ পরিস্থিতিতে বিষয়টি ঘটছে তার ওপর টিপিং পয়েন্ট নির্ভর করে। বাস্তিমোরের পাবলিক ক্রিনিকে যখনই কোনও সফিলিস বা গনোরিয়া আক্রান্ত রোগী আসত, মহামারী বিশেষজ্ঞ জন জেনিলম্যান কম্পিউটারে ওই রোগীর ঠিকানা সংরক্ষণ করতেন। এরপর যেসব এলাকা থেকে রোগী এল, একটি ম্যাপে ওই এলাকাটি একটি কালো

Date: Thu, 6 Mar 2014 18:15:10 +0500

All headers:

From: Malcolm Gladwell <gladwell@gmail.com>

Reply-to: malcolm@gladwell.com

To: "Md.Anwar Sadat Shamil" <shamil@northsouth.edu>

Subject: Re: Permission for translation (The Tipping Point)

All attachments:

yes, by all means, go ahead, i'm very pleased you are doing this. m.

পিনে চিহ্নিত করে রাখতেন। পুলিশ যেভাবে মাথোঁ অপরাধপ্রবণ অঞ্চলগুলো চিহ্নিত করে রাখে, সেরকম। খুব স্বাভাবিকভাবে দেখা গেল, পূর্ব এবং পশ্চিম বাস্টিমোরের অংশ কালো পিনে ভরে গেছে, আর মধ্যাঞ্চলে পিন কম। আরও মজার ব্যাপার হলো, শীতকালের তুলনায় গ্রীষ্মকালে কালো পিন পূর্ব-পশ্চিম বাস্টিমোর ছাড়িয়ে মধ্যাঞ্চলের দিকে বেশি ছড়িয়ে পড়ে। অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে তুলনামূলকভাবে সিফিলিস-গনোরিয়া ছড়ায় বেশি, শীতকালে কম।

জেনিলম্যান তাঁর ম্যাপের ওপর ভিত্তি করে ব্যাখ্যা করেন যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা, পরিবেশ, পরিস্থিতির ওপর মহামারীর নির্ভর করে। অসুখের মহামারীর ক্ষেত্রে ঋতুর প্রভাব সেটাই প্রমাণ করে। পরিবেশ পরিস্থিতির এ প্রভাব সামাজিক মহামারীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

এ প্রসঙ্গে নিউ ইয়র্ক শহরের ইতিহাসে ঘটে যাওয়া একটি ন্যাক্সারজনক ঘটনা স্মরণ করা যেতে পারে। ১৯৬৪ সালে কিটি জেনোভিস নামের এক তরুণীকে আধ ঘণ্টার ব্যবধানে তিনবার তাড়া করা শেষে কুপিয়ে হত্যা করে এক দুর্বৃত্ত। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, জেনোভিসকে যখন আক্রমণ করা হচ্ছিল, তখন তার ৩৮জন প্রতিবেশী জানালার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে এ দৃশ্য দেখছিল। অথচ একজন মানুষও সাহায্যে এগিয়ে আসেনি! অ্যাবে রোজেনথ্যাল, যিনি পরবর্তীতে নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকার সম্পাদক হয়েছিলেন, এ ঘটনা নিয়ে একটি বইতে লেখেন—যারা জানালার ফাঁক দিয়ে জেনোভিসের আক্রান্ত হওয়ার দৃশ্য দেখছিল, তারা কেউই ঠিকমত বলতে পারেনি কেন তারা জেনোভিসকে সাহায্য করতে এগিয়ে যায়নি। এমনকী পুলিশকে ফোনও করেনি। সে ব্যাপারেও তারা নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করতে পারেনি। রোজেনথ্যাল বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেন এভাবে—মানুষ যখন আশপাশে অনেক মানুষ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে, তখন সে অন্যের বিপদে সাহায্য করতে এগিয়ে যায় না। মানুষের মনে শুধু একটি ভাবনাই ঘুরপাক খায় যে অন্য কেউ সাহায্য করবে। কিংবা আশপাশে

এত লোক থাকতে আমি কেন এগিয়ে যাব?

মানুষের জীবনের ব্যস্ততা, সামাজিক সম্পর্কের শৈথিল্য এবং পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতার কারণে মানবিক মূল্যবোধের পতন ঘটেছে। এ জন্যই বলা হয়, একটা সময়ে ছিল নির্জনতার ভয়, আর এখন চারপাশে এত কোলাহল, এত ভিড়, এত মানুষ—নির্জনতার ভয় আর নেই, আছে জনতার ভয়।

জেনোভিসের ওপর হামলায় প্রতিবেশীদের নির্বিকার আচরণের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন মনোবিজ্ঞানী 'পাশের ব্যক্তির সমস্যা' (bystander problem) শীর্ষক পরীক্ষা চালান। ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে তারা কিছু সাজানো নাটক সৃষ্টি করেন এবং দেখেন আশপাশের মানুষের প্রতিক্রিয়া কেমন।

এক্ষেত্রে কাউকে মূর্খা যাওয়া মৃগী রোগী, কাউকে লিফটে আটকে যাওয়া মানুষ বা কোনও বাড়িতে আশুন লাগানোর নাটক সাজানো হয়। দেখা গেছে, এসব পরিস্থিতিতে বিপদাক্রান্ত মানুষের আশপাশে যখন দলবদ্ধ মানুষ থাকে, তখন খুব কম (৩১ শতাংশ) মানুষই সাহায্যে এগিয়ে আসে। কিন্তু একই পরিস্থিতিতে বিপদগ্রস্থ মানুষটি যদি একা থাকেন, তবে তাকে সাহায্যে করতে এগিয়ে আসার হার অনেক বেড়ে যায় (প্রায় ৭৫ শতাংশ)।

কিটি জেনোভিসের হত্যা ঘটনা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সামাজিক মনোবিজ্ঞানীরা বলেন: ৩৮জন প্রতিবেশীর সবাই জেনোভিসের ওপর হামলার দৃশ্য দেখেছে। এটাই মুশকিল হয়ে গেছে। এ ঘটনার প্রত্যদর্শী যদি মাত্র একজন হত, তবে জেনোভিস হয়তো বেঁচে যেত।

ওপরের ঘটনাগুলো পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণে ম্যালকম গ্র্যাডওয়েল টপিং পয়েন্টের তিনটি মূলনীতির সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেন। তবে সামাজিক মহামারীর স্বরূপ ব্যাখ্যা আরও কিছু চমকপ্রদ এবং ভিন্দুখ্যী ঘটনার অবতারণা করেন তিনি। ■

(ক্রমশঃ...)

চারটি মৃত্যু

আল আমিন

কিছু
দাদার
পাঠানো
লোক দুটি
আর
কোনদিন
ফিরে
আসেনি।



পুরো জগৎটা রহস্যের চাদরে ঢাকা। দেখার মত চোখ থাকলে অনেক কিছুই দেখা যায়, বোঝার মত বুদ্ধি থাকলে অনেক কিছুই বোঝা যায়। একটি তিমি মাছ প্রতিদিন পঁচিশ টন খাবার সংগ্রহ করে এবং তা খেয়ে বেঁচে থাকে। তিমি মাছ না খেয়ে মরে গেছে এমন খবর শোনা যায়নি। পক্ষান্তরে একটি মানুষের প্রতিদিন প্রয়োজন কয়েক শ' গ্রাম খাদ্য। অথচ পৃথিবীর বহু মানুষ সেই খাবার পাই না। না খেয়ে মরছে কত শত মানুষ। এটাও একটা রহস্য। যাই হোক মূল কথায় আসি। ফিলসফি আর কপচাবো না।

১৯৭১ সাল। মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহ। আমার আকা তখন ১৯-২০ বছরের টগবগে তরুণ। অজপাড়াগায়ে থাকায় হয়তো দেশের উত্তেজনা তখন বুঝতে পারেননি। তাই মার্চের ২২-২৩ তারিখের দিকে তিনি খুলনায় তাঁর বড় বোন অর্থাৎ আমার বড় ফুপুকে দেখতে রওনা হন। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই শুরু হয় স্বাধীনতা যুদ্ধ। বোনের বাড়িতে আমার বাবা ছটফট করতে থাকেন। ২৬ শে মার্চের পরেই তিনি বোনের বাধা সত্ত্বেও বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হন। যশোরে এসে পাকিস্তানী সেনাদের হাতে ধরা পড়েন। প্রায় মাসখানেক তিনি নিখোঁজ থাকেন। এর মাঝে আমার দাদা ফুপুদের সাথে যোগাযোগ করতে না পেরে ছেলের খোঁজে দু'জনকে খুলনায় পাঠান। তাদের একজন আমাদের বাড়িতে জায়গির থাকত। অপরজন আমাদের অনুগত বর্গদার। আমার দাদা-দাদী তাদের চাপ দিয়ে পাঠিয়েছিলেন কিনা জানি না, তবে দেশের এমন ভয়াবহ পরিস্থিতিতেও

তারা বেরিয়ে পড়েছিল আমার আঁকার খোঁজে।

তারা যাবার কিছুদিনের মধ্যে আমার আঁকা ফিরে আসেন। সে অনেক কাহিনি। কিন্তু দাদার পাঠানো লোক দুটি আর কোনদিন ফিরে আসেনি। দেশ স্বাধীন হয়েছে। আমরা অনেক খোজাখুঁজি করেছি। কিন্তু তাদের কোন হদিসই পাইনি। তাদের মৃতদেহও উদ্ধার করতে পারিনি।

১৯৯৭ সালের ১৯ জুন আমার আঁকাকে সস্ত্রাসীরা নির্মমভাবে হত্যা করে। তাঁর এমন মৃত্যুতে আমরা হতবিস্ত্রল হয়ে পড়ি। আমাদের সামাজিক অবস্থান এমন না যে সস্ত্রাসীরা আমাদের উপর এমনভাবে হামলা করবে। সমাজের আর দশটা অসহায় পরিবারের মত বুকে কষ্ট রেখে আমাদের তা মেনে নিতে হয়। যে কারণে আঁকাকে হত্যা করা হয় তা পরবর্তীতে মিথ্যা প্রমাণিত হয়। যারা আমার আঁকাকে হত্যা করে তারা পরে অনুশোচনায় দগ্ধ হতে থাকে। শুনেছি তারা বিভিন্ন জায়গায় বলেছে—আমরা এমন ভাল মানুষকে ভুল করে হত্যা করেছি!

তারা এলাকার সস্ত্রাসী হওয়ায় আমরা আর তাদের সাথে কোনও বাক-বিতণ্ডায় বা আচার-বিচারে যাইনি।

২০০১ সালের ৬ অক্টোবর ভোরবেলায় আমার বড় ফুপু খুলনার সোনাডাঙ্গা আবাসিক এলাকায় মর্নিংওয়াচ করতে গিয়ে একটি প্রাইভেট কারের ধাক্কায় মৃত্যুবরণ করেন।

স্বভাবতই এ দুটি মৃত্যু আমাদেরকে প্রচণ্ড কষ্ট দেয়। আমরা শোক কাটিয়ে উঠি ঠিকই, কিন্তু যুক্তির নিরিখে, নিরেট বাস্তবতায় হিসেব মেলাতে পারি না। আমি যখন একা বসে থাকি তখন মৃত্যু দুটি নিয়ে খুব ভাবি। আমার কেন জানি মনে হয়, '৭১ সালের ওই মৃত্যু দুটির সাথে এই মৃত্যু দুটির সম্পর্ক আছে। কোনোভাবে প্রথম মৃত্যু দুটির দায়ভার হয়তো আমাদের উপর এসে পড়েছিল। তাই তাদের মৃত্যুর এতবছর পরেও আমাদের পরিবারে এমন দুটি মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটেছে। কী জানি, এমন হয়তো না-ও হতে পারে। আবার হতেও পারে। রহস্যভরা এই জগতের রহস্য বোঝা বড় দায়।



অচিরেই আসছে

রহস্য উপন্যাস

তিনটি বই একত্রে

কাজী আনোয়ার হোসেন

বিশ্বাসঘাতক: দৈবের যোগসাজশে হঠাৎ

করেই দেখা হয়ে গেল ইয়াহিয়ার দালাল আবু চোহানীর সাথে জেলখাটা এক বিহারী তরুণী শাহীন বেগমের। শুরু হলো নাটক। ওদের সাথে এসে জুটল ভয়ঙ্কর এক

সাইকোপ্যাথ-আলম। ভালই তো, ভিলেন ছাড়া নাটক জমে? কিন্তু নিয়তির অদৃশ্য অমোঘ টানে কী ভয়াবহ পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে ওরা কেউ কি জানে?

হলো না, রত্না!: ছোট্ট একটা অন্যায় করলেই হাতে এসে যায় অনেক টাকা। বড়লোক হয়ে যাবে মারুফ। একবারই তো-তারপর থেকে সাধু হয়ে যাবে সে। কেউ কি জানে,

ভাগ্যদেবী কোথায় নিয়ে গিয়ে

ফেলবে কাকে?

রহস্যময়ী: আমার কি দোষ, বলুন? আমি কি জানতাম? চলে যাচ্ছিলাম চট্টগ্রাম

ছেড়ে-পরাজিত, কপর্দকহীন। এমনি সময়ে অযাচিত আবির্ভাব ঘটল অসম্ভব মোটা এক লোকের। সামান্য একটা কাজের জন্যে প্রচুর টাকা দিতে চায়। নিলাম কাজটা। এবং জড়িয়ে গেলাম আশ্চর্য এক রহস্যময়ীর জটিল মায়াজালে। জানতাম না, তাই নিশ্চিন্তে পা

বাড়িলাম সর্বনাশের পথে।

দাম ■ একশ' বাইশ টাকা

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

mail: alochonabibhag@gmail.com

শৌ-রুম

৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

৩৮/২৮ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

জানা-অজানা

কোন প্রাণীর তিনটি হৃৎপিণ্ড আছে?

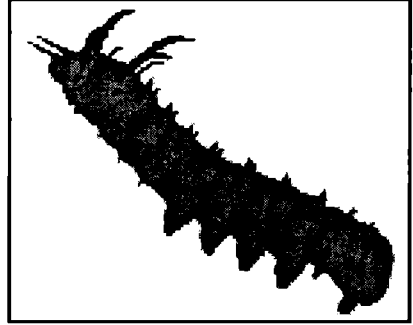
‘কার্টল ফিস’ বলে এক ধরনের অদ্ভুত প্রাণী আছে, যাদের তিনটি আলাদা আলাদা হৃৎপিণ্ড আছে। এর দুটি থাকে ওদের ফুলকার গোড়ায়। এই হৃৎপিণ্ড দুটির কাজ হলো সমস্ত দূষিত রক্তকে পাম্প করে ফুলকায় নিয়ে যাওয়া। ফুলকায় পৌঁছে ওই দূষিত রক্ত অক্সিজেন শোষণ করে। তারপর সেই রক্ত তৃতীয় হৃৎপিণ্ডে চলে যায়। তৃতীয় বা কেন্দ্রীয় হৃৎপিণ্ডটি সেখান থেকে রক্ত প্রাণীটির শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে সঞ্চালিত করে। মজার ব্যাপার হলো, এরা আসলে মাছ নয়। এদেরকে বলে মোলাস্ক বা শামুক জাতীয় প্রাণী।

কোন প্রাণীর তিনটি চোখ আছে?

টুয়াটারা একটি টিকটিকি-গিরগিটি জাতীয় প্রাণী, যার তিনটি চোখ আছে। যদিও এটি দেখতে গিরগিটির মত কিন্তু এটির অভ্যন্তরীণ গঠন টিকটিকি হতে সম্পূর্ণ আলাদা। একমাত্র নিউজিল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জে টুয়াটারা সরীসৃপ দেখতে পাওয়া যায়, যা এখন লুপ্ত প্রায়। পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ টুয়াটারার ওজন ১ কিলোগ্রাম পর্যন্ত হয়। কিন্তু একই বয়সের স্ত্রী টুয়াটারার ওজন মাত্র তার অর্ধেক। মোচার মত আকৃতি বিশিষ্ট তৃতীয় চোখকে বলা হয় পাইন গাছের মত মোচাকার চোখ। মস্তিষ্কের মাঝামাঝি একটি গর্তের মধ্যে এই চোখের অবস্থান। তৃতীয় চোখের উপর একটি চোখের পাতা আছে যা দিগন্তরালের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে বন্ধ হয়। এই প্রাণীটি তার তৃতীয় চোখ কীভাবে ব্যবহার করে তা কেউ বুঝতে পারে না।

কোন উদ্ভিদ কীট-পতঙ্গ খায়?

কিছু কিছু উদ্ভিদ বা লতা-গুল্ম আছে যারা কীট-পতঙ্গ খায়। এই উদ্ভিদকে কীট-পতঙ্গ-ভুক উদ্ভিদ বলে। এরা নিজেরা এদের প্রয়োজনীয় প্রোটিন উৎপাদন করতে পারে না। তাই পোকা-মাকড় ও কীট-পতঙ্গ খেয়ে তারা সে অভাব পূরণ করে। পতঙ্গ-ভুক উদ্ভিদের সবাই কীট-পতঙ্গ ধরতে গিয়ে তাদের নিজ-নিজ কৌশল ব্যবহার করে। কীট-পতঙ্গ-ভুক



উদ্ভিদের মধ্যে Pitcher Plant, Sundew Plant, Venus-Fly-Trap, Utricularia এবং Indian Pipe অন্যতম।

সব গ্রহের কি উপগ্রহ আছে?

এ যাবৎ যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, তার থেকে জানা গেছে যে সব গ্রহের উপগ্রহ নেই। উদাহরণ হিসেবে বুধ ও শুক্র কোন উপগ্রহ নেই। চাঁদ পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ। মঙ্গলের দুটি, বৃহস্পতির ১৪ টি, শনির ১৭ টি, ইউরেনাসের ৫ টি, আর নেপচুনের ২টি উপগ্রহ আছে।

স্টেথোস্কোপ কখন আবিষ্কৃত হয়েছিল?

১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে ‘রেনে থিয়োফাইল হার্যাসিহু ল্যানেক’ নামে একজন ফরাসী ডাক্তার স্টেথোস্কোপ আবিষ্কার করেন। ওই স্টেথোস্কোপটি ছিল এক ফুট লম্বা ও ফুটো যুক্ত একটি কাঠের সিলিণ্ডার। তিনি সিলিণ্ডারের এক প্রান্তরোগীর বুকে রাখেন আর অন্য প্রান্তে কান লাগিয়ে হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের শব্দ শোনেন। তারপর থেকে এর আকার-আকৃতির অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়েছে। আধুনিক স্টেথোস্কোপে ‘চেস্ট পিস’ বলে একটি সংস্পর্শ অংশ থাকে। প্রাস্টিক টিউবের সাহায্যে কানে ইয়ারপিস লাগিয়ে ডাক্তার হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের শব্দ শোনেন।

সংগ্রহে: শাহরীন সোনিয়া

প্রজেক্ট: লেখালেখি

মিলন গাঙ্গুলী

লিখতে গেলে আপনার নিজস্ব স্টাইল থাকতেই হবে। সে কারণেই পাঠকের আগ্রহ তৈরি হবে আপনাকে ঘিরে।

১৯৪৪ সালের শীতের চমৎকার এক বিকেলে হাজির হয়েছিলাম সেবা প্রকাশনীতে। উদ্দেশ্য, দেখে আসব আমার স্বপ্নের দালানবাড়িটা। যেখান থেকে প্রতি সপ্তাহে বের হয় প্রজাপতির ছাপ মারা প্রজাপতির মতই বিচিত্র কিছু বই। টেনে নিয়ে যায় স্বপ্নের এক জগতে। যে জগতে ডুবে আছি সেই হাফপ্যান্ট পরা শৈশব থেকে।

আর যদি ভাগ্য ভাল হয়, দেখে আসব তাদের। শেখ আবদুল হাকিম, রকিব হাসান, কাজী আনোয়ার হোসেন, প্রব এম, আসাদুজ্জামান, নিয়াজ মোরশেদ ইত্যাদি ইত্যাদি।

পড়বি তোঁ পড় মালির ঘাড়ের মতই প্রথম দিনই পরিচয় হয়ে গেল পেপারব্যাক জগতের সম্রাট কাজী আনোয়ার হোসেন ওরফে কাজীদার সাথে।

অটোগ্রাফ সংগ্রহের পরে প্রথম প্রশ্ন ছিল, 'কীভাবে লেখক হওয়া যায়, কাজীদা?'

মৃদু হেসে চটজলদি উত্তর দিলেন তিনি, 'প্রচুর পড়তে হবে। এবং প্রচুর লিখতে হবে। বাস। এই-ই।'

ঘটনার পর অনেক দিন চলে গেছে। অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে নামকরা এক কলেজে নতুন লেখকদের জন্য একটা ক্লাস চলছিল। কীভাবে যেন ভুল করে ঢুকে পড়েছিলাম সেখানে। সৌম্যকান্তি এক বুদ্ধ ক্লাস নিচ্ছিলেন। কীভাবে একজন সাধারণ কেরানী ইচ্ছে করলেই বেস্ট সেলার লেখক হতে পারে, এই বিষয়ে নানান তথ্য এবং উদাহরণ দিচ্ছিলেন তিনি। টানা বিশ মিনিট বক্তৃতার পর যা বললেন তা হচ্ছে—প্রচুর পড়তে হবে এবং



প্রচুর লিখতে হবে।

চমৎকৃত হলাম।

ঝুঁজে-ঝুঁজে লাইব্রেরি থেকে কয়েকটা বইও সংগ্রহ করলাম। How To be a good writer এই কিসিমের বই আর কী! তো, আসলে কী? ইচ্ছে করলেই কি যে কেউই সফল একজন লেখক হতে পারে?

তা হলে মাত্র হাতে গোনা কয়েকজন লেখকের বই বাজারে চলে কেন? প্রতি বছর তো বইমেলায় প্রায় হাজার দুয়েক নতুন লেখক বেরোয়। বাকি লেখক হারিয়ে যায় কেন? ওইখানেও কি ডারউইনের 'সারভাইভেল অফ

দ্য ফিটেস্ট' নিয়ম ঝাটে? যোগ্যতম লেখক জনপ্রিয় হয়। বিক্রি হয় ত্রিশ হাজার থেকে এক লক্ষ কপি পর্যন্ত। অন্য লেখকের বই সাড়ে তিনশো চলতে চায় না। বস্তা বন্দি হয়ে পড়ে থাকে গুদামে। আমার পরিচিত কয়েকজন লেখক আছেন। যাঁরা দশ বা পনেরো বছর ধরে লেখালেখি করছেন। কিন্তু তারপরও সফল হতে পারছেন না। নতুন অনেকেই লিখতে চান। তাঁরাও জানতে চান আসলেই কি সফল লেখক হবার জন্য কোনও চাবিকাঠি আছে, যা অনুসরণ করলে একজন নতুন লেখকও হয়ে উঠতে পারেন বেস্ট সেলার লেখক? বা জনপ্রিয় লেখক?

হ্যাঁ, আছে।

বেশকিছু বিদেশি সফল লেখক লিখেছেন এই নিয়ে। পথ নির্দেশনা করেছেন নতুনদের জন্য।

আমার ধারণা এঁদের উপদেশ অনুসরণ করলে আপনিও একজন জনপ্রিয় এবং সফল লেখক হতে পারবেন। এঁদের উপদেশই ধাপে ধাপে সহজ ভাবে জানিয়ে দিলাম:

১। প্রথমেই জানতে হবে কী লিখবেন। প্রেমের উপন্যাস? কবিতা? থ্রিলার, সায়েন্স ফিকশন, প্রবন্ধ, ভ্রমণ, হালকা উপন্যাস, জীবনী, গবেষণামূলক প্রবন্ধ, রান্না-বান্না সংক্রান্ত লেখা, ভৌতিক গল্প, শিশু সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রবন্ধ, সংকলন, খেলাধুলার রিপোর্ট, রাজনৈতিক কলাম। নাকি শুধু বিদেশি সাহিত্যের অনুবাদ। জানতে হবে কী লিখতে চান আপনি। আমি বলছি না একজন কবি সায়েন্স ফিকশন লিখতে পারবেন না। বা একজন রাজনৈতিক কলাম লেখক শিশুতোষ গল্প লিখতে পারবেন না। ব্যাপারটা তা নয়। তবে শুরুতেই জানা দরকার ঠিক কী নিয়ে লিখতে চান আপনি। লক্ষ্য স্থির করুন। এবং লিখতে থাকুন। দেখবেন চমৎকার সব লেখা বেরুচ্ছে আপনার হাত দিয়ে।

২। একটা আইডিয়া খাতা থাকতে হবে। ছোট ডায়েরি হতে পারে। হতে পারে টুকরো কয়েকটা পাতা। বাঁধানো খাতা হতে পারে। সাথে একটা কলম বা কাঠ পেন্সিল। নতুন প্লট

বা আইডিয়া ধরা দেয় হঠাৎ করেই। কখন আর কোথায় যে ধরা পড়বে জানা নেই। চটজলদি লিখে ফেলাতে হবে। ভুলে গেলেন তো হয়তো হারিয়ে ফেললেন আপনার সবচেয়ে সেরা লেখাটা। হুমায়ুন আহমেদ 'জোসনার ফুল' নাটকের গুটিং করছিলেন। কাহিনির প্রয়োজনে বানাতে হয়েছিল কৃত্রিম একটি রেলস্টেশন। রাতে ওখানেই হাটাইটি করতে গিয়েই পেয়েছিলেন 'ইন্সটিশন' উপন্যাসের প্লট। ব্রাম স্টোকারের 'ড্রাকুলা'র নাম কে না জানে। শোনা যায় ছুটিতে গিয়ে কারও মুখে তিনি লোকজ কিছু গল্প শোনে। সেই উপাদান দিয়েই লিখে ফেলেন বিশ্বের সবচেয়ে বিক্রিত ভয়াল কাহিনিটি। উদাহরণ অনেক দেয়া যায়। সেবা'র জনপ্রিয় রোমাণ্টিক লেখক খন্দকার মজহারুল করিমও তাঁর আইডিয়া টুকে রাখতেন পিচ্চি এক খাতায়। দেশের অনেক জনপ্রিয় কবিও এই কাজ করেন। আমি নিজে এক ভৌতিক গল্পের প্লট পেয়েছিলাম সিডনিতে পুরনো এক বাড়ি ভাড়া নিতে গিয়ে। আইডিয়া খাতা সঙ্গে রাখুন। কাজে দেবে।

৩। রুটিন করে লিখতে হবে। ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা দরকার। অনেকেই ধারণা শুধুমাত্র পেশাদার লেখকরাই রুটিন অনুযায়ী তিনবেলা লেখেন। কারণ লিখেই তাঁদের পেট চালাতে হয়। নতুন লেখকদের রুটিন অনুযায়ী লেখার দরকার নেই। তাঁরা লিখবেন মুড অনুযায়ী। ব্যাপারটা সত্যি নয়। নতুন লেখকদের প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী কাগজ কলম নিয়ে বসা দরকার। এক-দু' কলম লিখতে লিখতেই এক সময় পাঠকপ্রিয় লেখা বেরুতে থাকবে। বিশ্বাস করুন।

৪। লেখার পরিবেশ চাই। ব্যাপারটা অনেকের কাছে আপত্তিকর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে কোনও পরিবেশে লিখতে পারতেন। নজরুল তো বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিতে দিতে পান চিবুতে-চিবুতে লিখতে পারতেন। হ্যারি পটারের লেখিকা J.K Rowling কফি শপে বসে লিখতেন। লগুনে আমি নিজে এক ভদ্রলোককে পার্কে বসে লাল আঙুরের মদ খেতে খেতে লিখতে দেখেছি। তবে? হ্যাঁ, তারপরও কথা

থেকে যায়। দেখা গেছে পরিবেশটা একটু শান্তিময় হলে লেখক যদি নিজে স্বস্তি পান তবে লেখাটাও তরতর করে এগিয়ে যায়।

চাঁদের আলো, দক্ষিণা বাতাস, দ্বীপের গন্ধ এসব হাবিজাবি কথা বলছি না। নিদেনপক্ষে যেখানে বসে লিখছেন সেখানে স্বস্তি পেতে হবে। চেয়ার-টেবিল হলে তাতে আরামদায়ক বসা হতে হবে। কফি, চা বা পানি থাকতে পারে। মশা তাড়ানোর ব্যবস্থা থাকতে হবে। ফ্যানের বাতাসে যাতে কাগজপত্র 'হাওয়ামে উড়তা যায়' না হয় সে ব্যবস্থা থাকতে হবে। সিলিং ফ্যানের ফ্লু ক্যাচ-ক্যাচ করে শব্দ করছে বা বারান্দায় দাঁড়িয়ে কেউ মুখ ভর্তি পানি নিয়ে 'অব অব' করে কুলকুচি করছে—এ অবস্থাতে হয়তো তত বেশি মনোসংযোগ আপনি করতে পারবেন না। চেষ্টা করুন লেখালেখির জন্য অস্ত্রত টেবিলটা সুন্দরভাবে গুছিয়ে নিতে।

৫। কাহিনির কাঠামোটা আগে তৈরি করে নিন। অনেকের ধারণা: যা মনে আসে সুন্দর গুছিয়ে লিখতে থাকি। কাহিনির কুমড়োটা অটোমেটিক গড়াগড়ি করতে-করতে এগিয়ে যাবে। ব্যাপারটা তা নয়। পুরো কাহিনির ছায়া অবলম্বনটা আগে তৈরি করে নিন। লিখতে বসলে অনেক নতুন চরিত্র আসবে-যাবে বা শেষ পরিণতি হয়তো অন্যরকম হবে। কিন্তু তবুও আপনার জানা থাকা দরকার কী লিখছেন।

৬। নতুনত্ব চাই। হ্যাঁ, ঠিক তাই। নতুন লেখকেরা যখনই লেখেন, তখনই দেখা যায় তাঁরা প্রতিষ্ঠিত কোনও লেখকের অনুকরণে লেখেন। কিছুটা ইচ্ছাকৃত। বেশিরভাগই মনের ভুলে বা দুর্বল মানসিকতার জন্য। যারা ইচ্ছাকৃত এ কাজটি করেন, তাঁরা ভাবেন এ ভাবেই হয়তো দ্রুত সেই প্রতিষ্ঠিত লেখকের মত তাঁরাও জনপ্রিয় হয়ে উঠবেন। আর যারা অনিচ্ছাকৃত করেন তাঁরা বোচরাম। তাঁরা ভাবেন এটাই বুদ্ধি লেখার স্টাইল। লিখতে গেলে আপনার নিজস্ব একটা স্টাইল থাকতেই হবে। সে কারণেই পাঠকের আর্থ্র তৈরি হবে আপনাকে ঘিরে। তাঁরা অপেক্ষা করবেন

আপনার নতুন লেখার জন্য। চেষ্টা করুন আলাদা বাক্য রীতি ব্যবহার করতে। আলাদা শব্দ ব্যবহার করতে। আলাদা ভঙ্গিতে লিখতে। একটা পৃষ্ঠার দু-এক লাইন পড়ার পরই যেন পাঠক বুঝতে পারে এটা আপনার লেখা। আলী ইমাম, হুমায়ুন আহমেদ, কাজী আনোয়ার হোসেন—তিনজনের তিনটে বই নিয়ে দেখুন একই কথা তিনজন তিনভাবে লিখেছেন।

৭। আবার পড়ুন। মানে, যা লিখেছেন তা শেষ হবার পর আবারও পড়ুন। অনেক নতুন লেখক এই কাজটা করতে চান না। তাঁরা ভাবেন আমি তো জানিই আমি কী লিখেছি। তো, আবার নিজের লেখা নিজে পড়ার মত বিরক্তিকর কাজ করতে যাব কেন? এসব লেখক লেখা শেষ করা মাত্র কয়েক দিন্তা কাগজ নিয়ে ছুটে যায় প্রকাশকের কাছে। আর প্রকাশক বেচারার গিলতে হয় অখাদ্যগুলো। আমি একবার নতুন এক লেখকের পাণ্ডুলিপি পড়েছিলাম। সেটা ছিল ঢাকাই ছবির এক চিত্রনাট্য। চমৎকার সাসপেন্স আর থ্রিলার সমৃদ্ধ লেখা। আমি মুগ্ধ। তবে অবাক হয়েছিলাম কাহিনির চরিত্রগুলোর নাম পড়ে। কেমন যেন বিদঘুটে। যাই হোক, কয়েকদিন পর লেখকের সাথে দেখা হতেই ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভাই, শেক্সপিয়ারের নাটকের অনুবাদটা কেমন লাগল!'

মাবুদে এলাহী।

শেক্সপিয়ার এ রকম কোন নাটক লিখেছিলেন এই প্রথম জানলাম। তো, আবার বলছি। লেখা শেষ হবার পর আবার পড়ুন। সবচেয়ে ভাল হয় টাটকা লেখাটা নিয়ে কয়েকদিন ড্রয়ারে বন্দি করে রেখে দিন। তারপর মাসখানেক পর আবারও পড়ুন। নিধের ভুলের মাত্রা দেখে নিজেই অবাক হবেন। নিজের অজান্তেই যে কত শব্দ, বাক্যগঠন, সংলাপ ভুল হয়েছে দেখে নিজেই হেসে ফেলবেন।

৮। আবার লিখুন। সেটা আবার কী? আপনার কি ধারণা, সেরা লেখকদের যে লেখাগুলো আমরা পড়ি সেগুলো একবারেই লেখা হয়েছে? জী-না। দীর্ঘ কাটাকাটি, খসড়া, বারবার লেখার

পর হাজার খানেক পৃষ্ঠা নষ্ট হবার পর বের হয়ে এসেছে একশ' ষোলো পাতার একটা উপন্যাস। ডারউইন বলেছিলেন, 'আমার প্রথম লেখা অর্থহীন, অসংলগ্ন কিছু বাক্য ছাড়া কিছু হত না। পরেরবার যখন লিখতাম, তখন কিছুটা অর্থ প্রকাশ পেত।'।

আমেরিকার এক প্রকাশকের কথা শুনেছিলাম। সত্যি কি মিথ্যে জানি না। নতুন লেখক পাণ্ডুলিপি নিয়ে তাঁর কাছে এলেই সেটা টেনে ছিড়ে ফেলতেন। তারপর মুচকি হেসে বলতেন: 'আবার এই লেখাটাই লেখো। প্রথম লেখাতে আবেগ আর উচ্ছ্বাস বেশি থাকে। কাজেই লেখাটা ফালতু হবার সম্ভবনাও বেশি থাকে।'।

কাজেই ক্ষেত্রবিশেষে পুনর্লিখন অনেক কাজে দেয়। অনেক ঝরঝরে, অনেক প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে সংশোধিত লেখা। আমার পরিচিত এক লেখক আছেন যিনি তাঁর লেখা বই পুনর্মুদ্রণের সময় পর্যন্ত সুযোগ পেলে সংশোধন করেন।

৯। লেখার শুরু এবং শেষটা সুন্দর করুন। শতকরা ৯০ জন পাঠকই যে কোনও লেখা প্রথম এক-দুই পৃষ্ঠা পড়ার পর যদি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে তবে আর পড়তে চায় না। আবার একই ভাবে লেখা শেষটা যদি তাকে সম্বৃত্ত করতে না পারে, তবেও লেখকের পরবর্তী লেখার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

কাহিনির পটভূমি তৈরি হতে যদি অনেকগুলো পৃষ্ঠা যেতে হয়, তবে তা হবে বিরজিকর। বিশেষ করে থ্রিলার, ফিকশন বা পেপারব্যাক বইয়ের ক্ষেত্রে। আবার হঠাৎ কাহিনি শেষ হলেও মনে হয় লেখক তাল সামলাতে পারেননি, বা শেষের দিকে থৈ হারিয়ে ফেলেছেন, তা হলে তাঁর পরিশ্রমই ব্যর্থ হবে।

প্রশ্ন করতে পারেন বড় মাপের অর্থাৎ টাউস সাইজের উপন্যাস কি এই পদ্ধতিতে লেখা সম্ভব? সেখানে তো পটভূমি তৈরি করতে বেশ কিছুদূর লিখে যেতে হয়। তারপর না কাহিনির গতি আসে। ঠিক আছে, তা হলে উইলবার স্মিথ, জেমস হেডলি চেজ বা অ্যালিস্টেয়ার ম্যাকলিনের যে কোনও টাউস পেপারব্যাক বেছে নিন। কী দেখছেন? দুই-তিন পাতার পরই বা প্রথম পাতাতেই ঘটনা

শুরু হয়ে গেছে না? বাংলাতে কপালকুণ্ডলা, সংশপ্তক, পথের পাঁচালী-কী মনে হয় আপনার? কাজেই শুরুটা আকর্ষণীয় করুন। আর বাড়তি মনোযোগ দিন শেষটাতে। সব ভাল যার শেষ ভাল।

১০। দীর্ঘ প্যারাগ্রাফ, লম্বা বাক্য এড়িয়ে চলুন। লেখক শেরিভাগ বেকার তাঁর এক লেখায় বলেছেন, 'লম্বা শব্দ ব্যবহার করবেন না। ছোট ছোট বাক্য অনেক আকর্ষণীয়। টানা একঘেয়ে লম্বা বাক্য অতটা ভাল লাগে না। একই ভাবে আধ বা এক পৃষ্ঠা জুড়ে প্যারাগ্রাফও অধিকাংশ পাঠক পছন্দ করে না। দীর্ঘ বাক্যের গাথুনিও তত ভাল হয় না। দুর্বল হয়।

১১। নিজেকে তৈরি করে নিন। নিজের শব্দ ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করুন। লিখতে গিয়ে যেন বারবার অভিধান খুঁজতে না হয়। গুরুগম্ভীর শব্দ ব্যবহার করে পাঠককে মুগ্ধ করার আগে নিজে জানুন শব্দটার সঠিক মানে কী।

অবসর সময়ে অভিধানটা উল্টে-পাল্টে দেখুন। নতুন-নতুন শব্দ সংগ্রহ করুন। নির্ভুল বানানে ভাল কাগজে লিখে সুন্দরভাবে প্রকাশকের সামনে উপস্থাপন করুন। পাণ্ডুলিপি দেখে প্রকাশকের যেন মনে না হয় এটা চর্যাপদের দ্বিতীয় খণ্ড। সায়েন্স ফিকশন লিখলে এত বেশি ফিকশন দেবেন না যেন গাজাখুরি মনে হয়। থ্রিলার লেখার সময় ভুল ও বিব্রতকর তথ্য যেমন, লাস ভেগাস কোথায়, কানাডাতে নাকি আমেরিকাতে, সঠিকভাবে জেনে লিখুন। সাধারণ পাঠকের ভিড়েই থাকে বুদ্ধিমান পাঠক। এদের কাছে একবার ঠুনকো হয়ে গেলেন তো গেল সব।

টাউস উপন্যাস লেখার আগে আপনার হবু প্রকাশককে জিজ্ঞেস করুন এই ধরনের বইয়ের কাটতি কী রকম।

নিজের উপর আত্মবিশ্বাস রাখুন। এবং বিসমিল্লাহ বলে আজই নতুন লেখায় হাত দিয়ে ফেলুন। আগেই বলেছি একজন ভাল পাঠকই একজন ভাল লেখক হতে পারে। কাজেই প্রচুর পড়ুন এবং সেই সাথে সমান তালে লিখে যান।

এমন দিন খুব দূরে নয়, যে দিন আমি আপনার অটোগ্রাফ নিতে লম্বা লাইনে দাঁড়াব। ■

বিচিত্র খবর

এস.এম. নাজমুল হক ইমন

ইংল্যান্ডের কেরি শহরের বাসিন্দাদের
ধারণা দাদি মারা গেলে তার আত্মাটা
খরগোশ হয়ে যায়। এজন্য তারা কখনও
খরগোশের মাংস খায় না।

খরগোশ নিয়ে আলাপ

খরগোশ নেহাতই এক গোবেচারা টাইপের
প্রাণী। দেখতেও বেশ সুন্দর। সহজেই পোষ
মানে। তাই তো গরু-ছাগল কিংবা হাঁস-মুরগির
মত অনেকে শখ করে বাড়িতে খরগোশ
পোষেন। নিরীহ আর পুতুল পুতুল চেহারার
এই প্রাণী নিয়েও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে
কুসংস্কারের অভাব নেই। খরগোশ কারও কাছে
সৌভাগ্যের প্রতীক, আবার কারও কাছে
দুর্ভাগ্যের। খরগোশ দেখা ভাল, কারণ এটা
দেখলে ভাগ্য ফিরে আসে! জাপান, কোরিয়া
এবং চীনের অনেক এলাকার লোকেরা অন্তত
এমনই বিশ্বাস করে। চীনাদের ধারণা, কোনও
মাসের শেষ দিনে যদি ঘুমাতে যাওয়ার আগে
তিনবার বুনো খরগোশের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়
এবং পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠেও
একই অবস্থা হয়, তা হলে নতুন মাসটা খুব
ভাল যায়। শেষ দিনে নয়, কোরীয়দের বিশ্বাস
মাসের প্রথমদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই যদি
কেউ সাদা খরগোশ দেখে এবং ঘুমাতে যাবার
সময় কোনও কালো খরগোশ দেখে, তা হলে
মাসটা তার বেশ ভাল যাবে। ব্যাপারটা যদি
প্রতিমাসেই ঘটতে থাকে তা হলে বুঝতে হবে
পরের বছর তার জন্য খুবই সৌভাগ্যের হবে।

এবার দুর্ভাগ্যের কথা বলা যাক।
ইংল্যান্ডের কেরি শহরের বাসিন্দাদের ধারণা
দাদি মারা গেলে তার আত্মাটা খরগোশ হয়ে
যায়। এজন্য তারা কখনও খরগোশের মাংস
খায় না। যদি দাদির আত্মাটা নিজেদের মধ্যেও
চুকে যায়! এই শহরের কোনও কোনও
বাসিন্দার ধারণা আবার অন্যরকম, তাদের
কোনও খরগোশ যদি গ্রামের প্রধান সড়ক দিয়ে
দৌড়ে পালায়, তো বুঝতে হবে একটু পরেই

কারও বাড়িতে আগুন লাগবে!

আয়ারল্যান্ডবাসীদের ধারণা, কোনও কিছু
খেতে থাকা একটা খরগোশকে তাড়া দিলে সে
যদি না শুনে খেতেই থাকে, তো বুঝতে হবে
একটু পরেই তার অনেক ক্ষতি হবে।

হাত-পায়ের নখ

পশুপাখির না হয় আত্মরক্ষা কিংবা খাবার
খোঁজার জন্য বড় বড় নখের প্রয়োজন। কিন্তু
মানুষের? প্রয়োজন না থাকলেও অনেকে বড়
বড় নখ রাখে। কেউ শখ করে, আবার কেউ
কেউ এমনি এমনিই রাখে। অবশ্য বিশেষ
ধারণার উপর বিশ্বাস করেও কেউ কেউ নখ
রাখে। অস্ট্রেলিয়ার অধিবাসীদের অনেকেই
হাতে-পায়ে নখ রাখে অনেক বড় বড়। ওদের
বিশ্বাস হাতে-পায়ে নখ না থাকলে পাহাড়ি
দেবতার আশীর্বাদ পাওয়া যায় না।

আফ্রিকার কোনও জঙ্গলে বসবাস করা
মানে মাঝেমধ্যেই ভয়ঙ্কর সব প্রাণীদের
মুখোমুখি হওয়া। ওদের হাত থেকে বাঁচতে
হলে প্রচণ্ড সাহসী ও হিংস্র হতে হয়। হাত বা
পায়ের নখ লম্বা হয়ে বেকে গেলে নিজেদের
মধ্যে সাহস আর হিংস্রতা দুটোই বেড়ে যায়।
এমনকী আফ্রিকান আদিবাসীদের ধারণা
বাকানো নখের কারণেই চিতা ভীষণ দৌড়াতে
পারে। ঝড়ের বেগে শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে
পড়তে পারে ঈগল। এমন ধারণা কোনও
বিজ্ঞানীদের নয়, কোনও কোনও দৌড়বিদের।
এজন্য ঈগলের মত ক্ষিপ্ততা আর চিতার মত
গতি পাওয়ার জন্য অনেক অ্যাথলেটই
প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়ার বেশ আগেই হাতে
নখ রাখতে শুরু করেন।

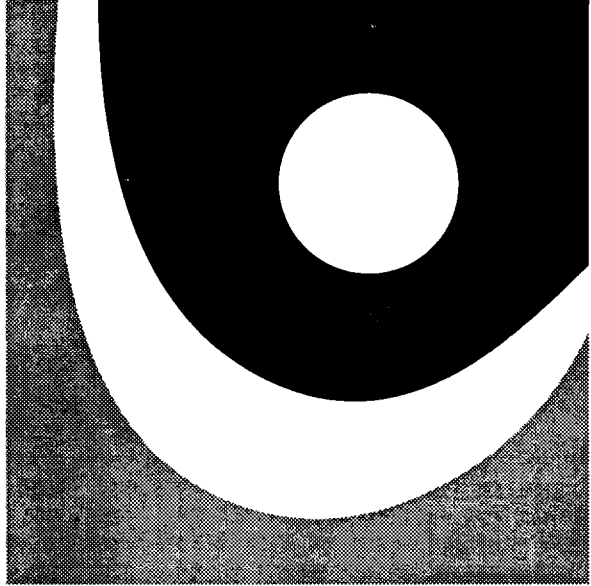
নখ রাখা বাদ দিয়ে এবার নখ কাটা নিয়ে
কিছু কথা জানি। শনিবার বা মঙ্গলবার হাত-
পায়ের নখ কাটতে নেই, অমঙ্গল হয়।
বাংলাদেশের অনেক এলাকার মুরকিরা এটা
বিশ্বাস করলেও কানাডা, আমেরিকা কিংবা
আয়ারল্যান্ডের কোনও কোনও এলাকার
মুরকিদের ধারণা অন্যরকম। শনি, রবি কিংবা
মঙ্গল নয়, শুক্রবারে নখ কাটলে মঙ্গল হয়।
আর যদি কেউ সোমবার নখ কাটেন তা হলে?
বলা যায় না হঠাৎ করেই বিশাল ধন-সম্পদের
মালিক বনে যেতে পারেন। নখ কাটা নিয়ে
এমন বিশ্বাস মেক্সিকানদের। ■

সূত্র : ইন্টারনেট

পরশ্রয়ী

চন্দ্রিকা দাস

পরশ্রয়ী ও
পরনির্ভরশীল
বলে
আমায়
অনেকে
ধিকার
দেয়,
আমার
অস্তিত্বকে
ছোট
করে
দেখে।



কপালের এমনই বিধান যে আমি অন্যান্যদের তুলনায় আকার ও আকৃতিতে নিতান্তই ছোট ও তুচ্ছ। জন্মলগ্ন থেকেই আমি কিছুটা উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলাম। লোকে বলে আমি নাকি দেখতে অনেকটা চাঁদের মত আর আমার নামের সঙ্গেও চন্দ্রের একটা যোগসূত্র রয়েছে। আকৃতিতে ছোট হলেও চাঁদকে ছোঁয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রতিনিয়ত আমার মধ্যে দোলা দিত। অনেকটা বামন হয়ে চাঁদ ধরার মতই। অবশ্য চাঁদ একদিন আমাকে ঠাই করে দিয়েছিল তার নামের মাঝে।

পরশ্রয়ী ও পরনির্ভরশীল বলে আমায় অনেকে ধিকার দেয়, আমার অস্তিত্বকে ছোট করে দেখে। কিন্তু তারা একবারও ভেবে দেখে না যে, আমি ছাড়া আমার আশ্রয়দাতার পূর্ণতা সম্ভব নয়। নিজস্ব অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য প্রতিটি জীবই অন্যের উপর নির্ভরশীল। আমিই বা এর ব্যতিক্রম হই কী করে? এটাই তো প্রকৃতির নিয়ম। ক্ষুদ্রকায় আর পরনির্ভরশীলতার সব অপমান মাথায় নিয়ে অন্যের পূর্ণতা দানের সারথি হলেও আমার স্থান চিরকালই ওদের সকলের পরেই রয়ে গেল। কেননা, আমি যে চন্দ্রবিন্দু .∞. বর্ণমালার সর্বশেষ স্থানটিই যে আমার জন্য নির্ধারিত। ■

নাম নিয়ে বিড়ম্বনা

সালাম সরকার

নাম
বিত্রাস্তির
কারণে
গুধু
অফিসেই
বিড়ম্বনায়
পড়েছি,
তা
নয়।
সর্বক্ষেত্রে
আমার
বিপদ।



নাম নিয়ে বিড়ম্বনার শেষ নেই।

আমার নাম জামাল সরদার। অফিসে এম.ডি-র নাম জামাল হোসেন। এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু অফিসে ফোন করল, রিসেপশন থেকে ভুলক্রমে ফোন দিল এম.ডিকে।

বন্ধুটি বলল, 'কীরে, কেমন আছিস?'

এম.ডি. স্যর বললেন, 'কে, কাকে চান?'

এভাবে কিছুক্ষণ আলাপের পর বন্ধু বুঝল রিসেপশন থেকে ভুল করে আমাকে না দিয়ে এম.ডি. স্যরকে দিয়েছে। ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চাইল।

এই ঘটনার পর তৎক্ষণাৎ স্যর আমাকে ডেকে বললেন, 'আপনার নাম আর আমার নামে প্রায়ই ভুল হয়, এটা কি আপনি জানেন?'

'জী, স্যর।'

'তাই অফিসে আপনার নাম সরদার ব্যবহার করবেন।'

স্যরকে আশ্বস্ত করে এ যাত্রা রক্ষা পেলাম।

কিছুদিন পর আবারও সমস্যায় পড়লাম।

এক ব্যাংকার বন্ধু রিসেপশনে এসে বলল, 'জামাল সাহেব কোথায় বসেন?'

তার পরিপাটি পোশাক দেখে রিসেপশনিস্ট বিধি ভাবল, সম্ভবত এম.ডি. স্যরের কাছে

এসেছেন ইনি। পাশ্চাৎ প্রশ্ন করল, 'কোথা থেকে এসেছেন?'

'বলুন উত্তরা ব্যাংকের সিলেট ব্রাঞ্চ থেকে ম্যানেজার এসেছেন।'

বিধি নিশ্চিত হয়ে গেল: এম.ডি. স্যরের কাছে প্রায়ই ব্যাংকার আসেন। সে স্যরের চেম্বার দেখিয়ে দিল।

বন্ধুটি নিশ্চিত, তবে চেম্বারের কাছাকাছি এসে আশ্চর্য হলো। ভাবছে, দোস্ত আমার মস্ত বড় অফিসার। মাত্র চারবছর চাকরি জীবনে আশাতীত উন্নতি করেছে। এলাকার সবাইকে বলতে হবে। মনে কিছুটা সংশয় নিয়ে চেম্বারের দরজা খুলল, দেখল মধ্য বয়স্ক এক লোক বসে সিগারেট টানছেন। অনাকাঙ্ক্ষিত লোক দেখে হতভম্ব হয়ে পড়ল বন্ধু।

স্যর ভিতরে ডাকলেন।

বন্ধু সব বলার পর, স্যর দ্বিতীয়বারের মত ডাকলেন আমাকে।

নাম বিজ্ঞপ্তির কারণে শুধু অফিসেই বিড়ম্বনায় পড়েছি, তা নয়। সর্বক্ষেত্রে আমার বিপদ। আমার অনুপস্থিতিতে বাসায় ব্যাংক থেকে দু'জন অফিসার আসেন। তাঁরা আম্মা এবং বড়বোনকে বলল, আমার নামে ব্যাংকে বড় একটা অ্যামাউন্টের লোন আছে। কয়েক মাস যাবৎ কিস্তি দিচ্ছি না। মোবাইলে ফোন করলে রিসিভ করি না। যথাসময়ে টাকা পরিশোধ না করলে ব্যাংক নাকি আদালতে কেস করবে।

শুনে ভয় পেয়ে গেলেন আম্মা ও বড়বোন। আমাদের বংশে কেউ কোনওদিন কোর্ট-কাচারী করেননি। অথচ ছেলের জন্য আদালতে যেতে হবে, জেল খাটতে হবে। ভয়ে ভয়ে আম্মা বললেন, 'আমার ছেলে যে লোন নিয়েছে, তা আমরা জানি না। ঠিক আছে, এখন তো সব শুনলাম, ও বাড়িতে আসুক, আপনাদের লোনের টাকা ফেরত দেয়ার ব্যবস্থা করব।' ভয়ে তাঁদের জামাই আদর করলেন তিনি। তাঁরাও ভালমন্দ খেয়ে বিদায় নিলেন।

রাতে বাসায় ফিরে দেখি সবার মুখ কালো। কেউ আমার সঙ্গে কথা বলছে না। কিছুই বুঝতে পারছি না, কিছুক্ষণ পর মা বললেন, 'তুই এত খারাপ আমি ভাবতেও

পারছি না। আমার ছেলে হয়ে এমন কাজ করতে পারলি?'

'কী হয়েছে, তোমরা সবাই অমাবস্যার মত মুখ করে রেখেছ কেন?'

'টাকা দিয়ে কী করেছিস? একবারও আমাদের জানানোর কথা ভাবলি না?'

'কী হয়েছে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। খুলে বলো।'

বড়বোনের মুখে সব শুনে আমি তো বোকা বনে গেলাম। আমার নামে ব্যাংকে লোন থাকবে, অথচ আমি জানব না, এ কী করে সম্ভব?

ব্যাংকের কাগজ দেখলাম। যে ব্যাংকের কাগজ দিয়ে গেছে, সেই ব্যাংকে আমার কোনও অ্যাকাউন্ট নেই। নামের দিকে নজর পড়ল, আমার নাম জামাল সরদার, লোন গ্রহীতার নাম জামাল শিকদার। বাড়ির ঠিকানা একই। এবার বুঝলাম। এই বাড়িতে পাঁচটি পরিবার ভাড়া থাকে, অন্য ফ্ল্যাটের লোনের চিঠি পৌঁছে দিয়ে সে-যাত্রা রক্ষা পেলাম।

নামের বিড়ম্বনা শুধু আমার ক্ষেত্রেই নয়, ইদানীং বন্ধু মহলেও দেখা দিয়েছে। এক বন্ধু রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, পিছন থেকে অপরিচিত লোক ডাকছে: তাকিয়ে দেখে ওকে না, লোকটি তার ড্রাইভারকে ডাকছে। বেচারী লজ্জা পেল; মনে মনে ভাবল, বাবা-মা এমন নাম রাখল রাস্তা-ঘাটে সবার সাথে মিলে যায়। একটা আধুনিক নাম রাখতে হবে।

আরেক বন্ধু হোটেলে বসে চা পান করছে, হোটেল মালিক তাঁকে ডাকছে। চা রেখে দেখল, পিছনে থেকে একটি ছেলে মালিকের দিকে ছুটছে। ছেলেটি হোটেলের বয়। ও বুঝল, ওর নাম আর বয়ের নাম একই। সাথে সাথে সিদ্ধান্ত নিল, এ নাম পরিবর্তন করে আলট্রা মডার্ন নাম রাখবে, যে নাম সাধারণত কেউ রাখে না।

অবশেষে সব বন্ধু একদিন সভায় বসল নাম বিড়ম্বনায় আর যাতে না পড়তে হয়, সেজন্য।

কীভাবে এই সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়?

সর্বসম্মতিক্রমে নাম পরিবর্তন তালিকার

বিল পাশ হলো।

যে-যেমন স্বভাবের, তার উপর নির্ভর করে নাম হবে। যাতে আচার-আচরণে মিলে যায়।

এভাবে শুরু হলো নাম পরিবর্তনের পালা।

বন্ধুদের সিদ্ধান্তে এখন থেকে জাকির হোসেনকে মেহেদী নামে ডাকা হবে, কারণ তার মধ্যে নায়ক ভাব আছে। কামাল হলো আকাশ, কারণ কবি কবি ভাব। শহীদ হলো: সিন-হা-নূর শহীদ, কারণ তার দাড়ি আছে, সবসময় অভিনেতা আসাদুজ্জামান নূরের ভাব নিয়ে চলে। বিদ্বান হোসেন হলো বেলাল পাশা, কারণ রাজনীতি থেকে শুরু করে সব বিষয়ে ভাল বোঝে, যাকে বলে সবজ্ঞাত। কুদ্দুস হলো কাকন মাহমুদ, কারণ গো বেচারার টাইপের ছেলে। নামের পরিবর্তন অনুষ্ঠানে আকিকার ব্যবস্থা করা হলো। নাম পরিবর্তন হলো যাদের, তারা আকিকার ব্যবস্থা করল।

এরপরেও সমস্যার সমাধান হলো না। এক বন্ধু সবাইকে হোটেল খাওয়ার সময় বলল, ওকে যেন টেলি বলে না ডাকে। এই বন্ধুটিকে দেখতে কৌতুক অভিনেতা টেলি সামাদের মত দেখায়, তাই সবাই টেলি বলে ডাকে। খাওয়া দাওয়া শেষে এক বন্ধু বলল, 'টেলি, বিলটা দিয়ে দে।'

বেচারার মুখটা কালো করে বলল, 'এজন্য তাদের খাওয়ানো?'

মহল্লায়ও নামের সমস্যা দেখা দিয়েছে। বাবু নামের পাঁচজন একই মহল্লায় বাস করে। একজনের কথা বললে অন্যজনের কথা ভাবে সবাই। তাই তাদের চেনার জন্য প্রত্যেকের নামের পাশে নতুন নতুন টাইটেল ব্যবহার করা হচ্ছে। যে দেখতে সুন্দর, তার নাম লাল বাবু, দুবাই থেকে ফেরত আসায় নাম হলো দুবাই বাবু, কোরিয়ায় ধরা পড়ে বাংলাদেশে ফেরত আসায় আরেকজনের নাম কোরিয়ান বাবু, এলাকায় মাস্তানী করে বলে নাম হলো একজনের ক্ষুর বাবু। ইত্যাদি ইত্যাদি।

এতসব সমাধানের পরও নামের বিভ্রমনা কখনও শেষ হবে না। চলছে, চলবে, যতদিন পৃথিবী থাকবে ততদিন। ■

প্রকাশিত হয়েছে
ওয়েস্টার্ন

সুবর্ণ সমাধি

ডিউক জন



'সেনিয়োর...'

'বলো,' হাঁটবার ওপরেই বলল মেকসিকান।
'তুমি কি বলতে পারবে, এখানে সোনা এল কেমন করে?'

হোঁচট খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল যেন আলভারো।
মহিলার দিকে তাকাল। হতভম্ব দেখাচ্ছে বুড়োকে। 'তুমি জানো না?'

বিভ্রান্তির দোলনায় দুলতে লাগল মেরি। 'কী জানি না, সেনিয়োর?'

'সোনা তো এখানে আসেনি, সেনিয়োর। বরাবর ছিল।'

'জানি তো।' ঠোট মুড়ে হাসল রোজমেরি।
'সোনার খনি। আমি আসলে জানতে চাইছি, কী করে তৈরি হয় সোনা। জানো তুমি?'

ঠাস করে কপাল চাপড়াল মেক্স। হতাশায় মাথা নাড়ছে। 'খনি নয়, সেনিয়োর...খনি নয়!'

আয়-হায়, কোথায় আছ তুমি!'

দাম ■ উনসত্তর টাকা

সেবা প্রকাশনী

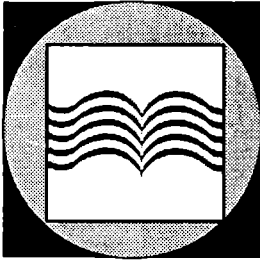
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

mail: alochonabibhag@gmail.com

শো-রুম

৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

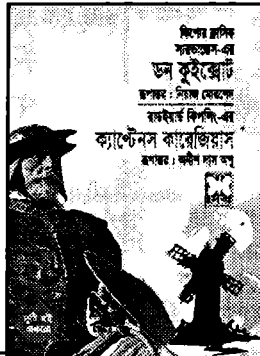


বই-পরিচিতি মীর কাশেম আলী

ডন কুইক্সোট ও ক্যান্টেনস
কারেজিয়াস-সারভাডেস ও
রাডইয়ার্ড কিপলিং। রূপান্তর:
নিয়াজ মোরশেদ ও অনীশ
দাস অপু। পৃষ্ঠা-২৮০
(নিউজপ্রিন্ট)। দাম-বিরানবই
টাকা।

দুটো কিশোর ক্লাসিক একত্রিত
করে প্রকাশিত হলো। বীর
নাইট ডন কুইক্সোট অভ লা
মানচা। হাড় জিরজিরে শরীর,
সরু কাঠির মত হাত-পা। প্রায়
তঁরই মত দেখতে তঁার
ঘোড়া-রোজিন্যান্ট। খুঁড়িয়ে-
খুঁড়িয়ে হাটে। এই ঘোড়ার
পিঠে চেপে দিখিজয়ে
বেরোলেন তিনি, সঙ্গে নিলেন
তঁার সহচর সাংকো
পানযাকে। একের পর
এক রোমহর্ষক ঘটনায় জড়িয়ে
গেলেন তারা... ডন কুইক্সোটের
কাহিনি এভাবেই এগিয়ে যায়।
বইটির অপর কাহিনি
'ক্যান্টেনস কারেজিয়াস' থেকে
এখানে সামান্য অংশ তুলে
দিচ্ছি: বোস্টন স্টেশনে ট্রেন
চুকতেই স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই
ব্যাকুল হয়ে উঠলেন নামার
জন্য। প্রথমে মি. চেনি
নামলেন, তারপর হাত ধরে
নামতে সাহায্য করলেন
স্ত্রীকে। মুখ তুলে চাইতেই
দেখলেন তাঁদের সাত রাজার

ধন হাভে হেঁটে আসছে তাঁদের
দিকে। হাঁটার গতি ক্রমশ
বাড়ছে হাভের। একসময়
দৌড়াতে শুরু করল সে বাবা-
মা'কে লক্ষ করে। হারিয়ে
যাওয়া ছেলের সঙ্গে তার
বাবা-মা'র মিলন পর্বটা
সংঘটিত হলো তীব্র আবেগ ও
সুখানুভূতি নিয়ে। মিসেস
চেনির মনে হলো খুশিতে তিনি
মুর্ছা যাবেন। হাভেও বাবা-
মা'কে দেখে প্রচণ্ড খুশি। তবে
সে 'উই আর হিয়ার' এ
কাটানো তার অ্যাডভেঞ্চারে
ভরা জীবন নিয়ে বেশি কথা
বলতে আগ্রহী দেখা গেল। মি.
চেনি বারবার অবাক হয়ে
দেখলেন তঁার হারানো
পুত্রধনকে। অহঙ্কারী এবং
উদ্ধত হাভেকে যেন কিছুতেই
মেলাতে পারছিলেন না তাঁর
সামনে দাঁড়ানো নীল জার্সি
আর রাবার বুট পরা, অনবরত
বকবক করতে থাকা ছেলোটর
সঙ্গে। একদম বদলে গেছে
হাভে। রক্ষ, কঠিন এবং
বলিষ্ঠ চেহারার এই ছেলোটকে
দেখে বোঝার উপায় নেই,
এক সময় সে ছিল রোগা
ডিগডিগে... ডন কুইক্সোট ও
ক্যান্টেনস কারেজিয়াস-এই
দুটো কাহিনি শ্রেষ্ঠাপট বিচারে
সম্পূর্ণ ভিন্ন। কিন্তু দুটোই
ক্লাসিক সাহিত্যের তালিকায়



জায়গা করে নিয়েছে বহু
আগেই। যারা ক্লাসিক
সাহিত্যের ভক্ত তাদের কাছে
বইটি অবশ্য পাঠ্য হিসেবে
বিবেচিত হবে।

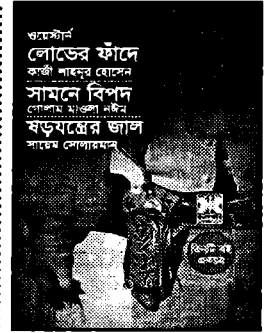
রক্তাক্ত স্বর্ণ-ডিউক জন।
প্রকাশক: জাগতি প্রকাশনী,
৩৩, আজিজ সুপার মার্কেট,
নীচতলা, শাহবাগ, ঢাকা-
১০০০। পৃষ্ঠা-৮০
(হোয়াইটপ্রিন্ট)। দাম-একশ'
পঞ্চাশ টাকা।

ডিউক জন-রহস্য ও রোমাঞ্চ
কাহিনির জগতে এখন এই
নামটি বেশ পরিচিত।
রহস্যপত্রিকায় লেখা তাঁর
কাহিনিগুলো পাঠক আগ্রহ
নিয়ে পড়ে; এ তথ্য অনেকের
কাছ থেকে জানতে পেরেছি।
ডিউক জনেরই লেখা 'রক্তাক্ত
স্বর্ণ' একটি রহস্য-কাহিনি
সঙ্কলন। সঙ্কলনে মোট দশটি
কাহিনি স্থান পেয়েছে। ছোট-
বড় এই কাহিনিগুলোর
প্রত্যেকটিতে লেখক তাঁর
স্বকীয়তা বজায় রাখতে সক্ষম
হয়েছেন। এখানে 'নিয়তি'
নামের কাহিনি থেকে সামান্য
অংশ তুলে দিচ্ছি: কান্ডার
হবিটা একটু অদ্ভুত। মানুষ
ডাকটিকেট জমায়। কয়েন
জমায়। বাগান করে। কান্ডা
জমায় পেপার কাটিং। যে
কোনো খবর নয়, কেবল
মৃত্যুর খবর। তা-ও স্বাভাবিক
মৃত্যু নয়। অদ্ভুত, অস্বাভাবিক
মৃত্যুই তার আকর্ষণের
কেন্দ্রবিন্দু। ব্যাপারটা শুরু
হয়েছিল দু'বছর আগে, যখন
'গাড়ির বাম্পারে পা আটকে
যুবকের মৃত্যু' শিরোনামে
একটা খবর পত্রিকায়
আলোড়ন তুলেছিল। সে-ই
শুরু। দু'বছরে খাতাটা প্রায়
ভরে এসেছে। এই মুহূর্তে সে
দাঁড়িয়ে আছে রাস্তা পার



হওয়ার অপেক্ষায়। ভারটিগো আছে ওর। সেজন্য ওভারব্রিজ থাকা সত্ত্বেও বিপজ্জনক এই পয়েন্টটা দিয়ে প্রতিদিন ঝুঁকি নিয়ে রাস্তা পার হয়। হঠাৎ বিকট শব্দে কেঁপে উঠল এলাকা। লোকজন চমকে উঠল। বোমা নাকি? কিছু না বুঝেই ঝেড়ে দৌড় দিল দু'জন। কাতাও। এক ছুটে পেরিয়ে গেল রাস্তা। তাড়াহুড়োয় তারে বেথে গেল ওড়না। আরে, রক্ত কীসের!...প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রিকশায় করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে পথেই মৃত্যু হয় কাতার...বইটির অন্যান্য কাহিনিগুলোও সমানভাবে পাঠককে আকর্ষণ করে। বইটির প্রচ্ছদও করেছে ডিউক জন, যা বইটিতে ভিন্ন মাত্রা যুক্ত করেছে। 'রক্তাক্ত স্বর্গ' শীর্ষি পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করবে।

লোভের ফাঁদে, সামনে বিপদ, ষড়যন্ত্রের জাল-লেখক যথাক্রমে কাজী শাহনুর হোসেন, গোলাম মাওলা নঈম, সায়েম সোলায়মান। প্রকাশক: সেবা প্রকাশনী। পৃষ্ঠা-৪৭২ (নিউজপ্রিন্ট)। দাম-একশ' চুয়াল্লিশ টাকা। ওয়েস্টার্ন কাহিনির সঙ্কলন এটি। তিনটি বইকে একত্রিত করে ভলিউম আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। 'লোভের ফাঁদে'র লেখক কাজী শাহনুর হোসেন। ট্রেনে ডাকাতের হামলায় মারা গেল হেজেন ক্যারী আর ট্রেন থেকে লুট হয়ে গেল সোনা। কোম্পানি ওই সোনা ফিরে পাওয়ার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করল। এর ফলে শহরে এসে ভিড় জমাল খান্দাবাজ কিছু লোকজন। শেষ পর্যন্ত সোনা উদ্ধার হয় কি না এখন সেটাই দেখার বিষয়...গোলাম মাওলা নঈমের লেখা 'সামনে বিপদ' অ্যাকশনে ভরপুর একটি ওয়েস্টার্ন কাহিনি। ফিরে যাওয়া হলো না শাটনের। একদল আউট-লর মাঝখানে অসহায় অ্যাঞ্জেলা জ্যাকসনকে কীভাবে ফেলে যায়? জেনে-গুনেই বিপদ মাথায় নিল... বইটির অপর কাহিনি 'ষড়যন্ত্রের জাল'। এবার ওই কাহিনির সামান্য অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি: ঘুটঘুটে অন্ধকার। শেষবার গুলি করার পর পিগ্গল হোলস্টার ডরেই ডেরিকের হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মারল



স্টিভ। টুল ছেড়ে উড়ে এসে মেঝেতে দাঁড়িয়ে গেল বড়ো। ওকে দাঁড়িয়ে থাকার সুযোগ দিল না স্টিভ। ব্যাট উইং দরজাটা কোথায় অনুমান করে নিয়ে হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল সেদিকে। ততক্ষণে বিমূঢ় ভাবটা কাটিয়ে উঠেছে মোটা লোকটা। হোলস্টার থেকে পিগ্গল বের করেছে। ডেরিক যে টুলে বসেছিল সেই টুল লক্ষ্য করে অন্ধকারেই আন্দাজে গুলি করছে একের পর এক। সেলুনের আরেকধারে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখা গেল কয়েক বার। এবার অন্য কেউ গুলি করছে। বারের কাছ থেকে ঝন ঝন শব্দ শোনা গেল। ভেঙে টুকরো টুকরো হয়েছে বিশাল আয়নাটা...যারা ওয়েস্টার্ন কাহিনির ভক্ত তাদের কাছে তিনটি কাহিনির এই ভলিউমটি আদৃত হবে। কাহিনির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বইটির প্রচ্ছদ করেছেন ভিক্টর নীল।

বইয়ের জগতে আপনাকে স্বাগতম

সেবা ও প্রজাপতি প্রকাশন-এর গল্প, উপন্যাস, ওয়েস্টার্ন, ক্লাসিক, অনুবাদ, তিন গোয়েন্দা, কিশোর হরর, মাসুদ রানা ও যাবতীয় রিপ্রিন্ট বই বিক্রেতা

নিউজ হোম

৭ গোল্ডেন প্লাজা, সোনাদীঘির মোড়, রাজশাহী।



বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকেই সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোনও কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানি-অর্ডার যোগে ১০০.০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। কোন সিরিজের গ্রাহক হতে চান দয়া করে মানি-অর্ডার ফর্মেই তা উল্লেখ করুন। ইচ্ছে করলে সকল সিরিজ বা যে-কোনও এক বা একাধিক সিরিজের গ্রাহক হতে পারবেন। যতদিন টাকা শেষ না হয়, ততদিন নতুন বই প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পৌছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। টাকা শেষ হয়ে এলে অবশিষ্ট টাকা ফেরত নিতে পারবেন, অথবা আরও টাকা পাঠাবেন। বিস্তারিত নিয়মাবলী ও ২৪ পৃষ্ঠার মূল্য তালিকার জন্য প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানায় ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন।

ভি. পি. পি. যোগে কোনও বই পেতে চাইলে কমপক্ষে ৫০.০০ টাকা অগ্রিম পাঠাবেন। চাইলে বিকাশ-এ টাকা পাঠাতে পারেন, বিকাশ নং ০১৭৮৪৮৪০২২৮। কেবলমাত্র টাকা পেলেই ভি. পি. পি. যোগে বই পাঠানো যাবে।

দয়া করে খামে ভরে টাকা পাঠাবেন না।

গ্রাহক টাঁদা

রহস্যপত্রিকা

ষান্মাসিক সডাক ২১০.০০ টাকা, বার্ষিক সডাক ৪২০.০০ টাকা

সেবার আগামী কয়েকটি বই

০১/০৬/১৪ সেই ভয়ঙ্কর রাত+জ্যোন্ত মমি (হরর ভলিউম) অনীশ দাস অপু/তারক রায়
০৮/০৬/১৪ দ্য গুড আর্থ+মাস্টার জ্যাকারিয়াস+স্বর্ণকীট (অনুবাদ ভলিউম)

রূপান্তর: কাজী শাহমুর হোসেন/কাজী মায়মুর হোসেন/অনীশ দাস অপু সম্পাদিত

১৬/০৬/১৪ পার্শিয়ান ট্রেজার-২	(রানা-৪৩২)	কাজী আনোয়ার হোসেন
২২/০৬/১৪ আত্মউন্ময়ন	(প্রজা D/D)	বিদ্যুৎ মিত্র
২৬/০৬/১৪ রহস্যপত্রিকা	(৩০ বর্ষ ৯ সংখ্যা)	জুলাই, ২০১৪